

রাহুল সাংকৃত্যায়ন বৌদ্ধ দর্শন



বৌদ্ধ দর্শন

রাহুল সাংকৃত্যায়ন

ভূমিকা ও সম্পাদনা

যতীন সরকার



রফিকু শাহ্ ট্রিয়েটিভ পাবলিশার্স

৪৫ বাংলাবাজার কম্পিউটার কমপ্লেক্স (৩য় তলা) ঢাকা

দ্বিতীয় ভাগ

কম্পিউটার ক্রিয়েটিভ

ISBN : 978-984-8928-07-3

প্রকাশকাল : প্রথম প্রকাশ : জুন ২০১০

দ্বিতীয় প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০১১

মূল্য : ১৮০.০০ টাকা

প্রকাশক : মোঃ আমজাদ হোসেন খান (জামাল), রংকু শাহ্ ক্রিয়েটিভ পাবলিশার্স

৪৫ বাংলাবাজার কম্পিউটার কমপ্লেক্স (তৃতীয় তলা), ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ

মোবাইল : ০১৭১১-৭৩৮১৯২ কম্পিউটার কম্পোজ : রংকু শাহ্ কম্পিউটার

৪৫ বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০, মোবাইল : ০১৯৩৪-৫৫২৯৫৬

প্রাপ্তিস্থান : বই বাজার নীলক্ষেত, ঢাকা

প্রচ্ছদ : মোঃ নাজির উদ্দীন খান (নাজমুল)

সম্পাদকের কথা

রাহুল সাংকৃত্যায়ন নামে আজ যিনি সর্বজন-পরিচিত, তাঁর পরিবার-প্রদত্ত নাম ছিল কেশারনাথ পাণ্ডে। পিতা গোবর্ধন পাণ্ডে ও মাতা কুলবন্তী দেবী।

১৮৯৩ সালের ৯ এপ্রিল উত্তর প্রদেশের পন্দাহা জেলায় আজমগড় গ্রামে মাতামহের বাড়িতে তাঁর জন্ম। মায়ের সঙ্গে মাতামহ রামশরণ পাণ্ডের অভিভাবকত্বেই অতিবাহিত হয়েছে কেশারনাথ পাণ্ডের বাল্যজীবন। বাল্যেই মাতামহের কাছে তিনি উর্দুভাষা শেখেন, এবং উর্দুতেই কেশারনাথের প্রথম রচনা প্রকাশিত হয়। শুধু উর্দুভাষা শিক্ষা নয়, মাতামহের কাছ থেকেই তিনি নানা দেশ ভ্রমণের প্রেরণা লাভ করেন। তাঁর মাতামহ এক সময়ে সৈন্যদলে কাজ করতেন। মাতামহের সৈনিকজীবনের নানা রোমাঞ্চকর গল্প ও বিভিন্ন দেশ দর্শনের অভিজ্ঞতার কথা শুনতে শুনতে একান্ত বাল্য বয়সেই কেশারনাথ রীতিমত অ্যাডভেঞ্চার-প্রিয় হয়ে ওঠেন। দশ বছর বয়সেই (১৯০৭ সালে) বাড়ি থেকে পালিয়ে কাশীতে চলে আসেন, এবং কিছুদিনের মধ্যে ফিরেও যান। আবার সেই বছরেই কলকাতায় এসে রেলে কিছুদিন মার্কামানের কাজ করার পর এক দোকানে খাতা লেখার কাজ নেন। সেই সঙ্গেই তিনি ইংরেজিভাষা শিখতে থাকেন। শুধু ইংরেজি নয়, জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন রকমের প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেই তিনি অনেক অনেক ভাষা শিখে ফেলেন ও সে-সব ভাষার ভাণ্ডার থেকে জ্ঞানের মণিরত্ন আহরণ করে আনেন স্বশিক্ষায় সুশিক্ষিত এই মানুষটি।

মাত্র এগারো বছর বয়সে সন্তোষী নামী এক মেয়ের সঙ্গে তাঁর বিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু এই বিয়ে তিনি মেনে নিতে পারেননি, সারা জীবন সন্তোষীর সঙ্গে কোনোই সম্পর্ক রাখেননি। এর পর রাশিয়ায় গিয়ে তিনি লোলা নামী এক বিদুষী মহিলাকে বিবাহ করেন, এবং এক পুত্রসন্তানের জনক হন। কিন্তু রাহুল রাশিয়া ছেড়ে ভারতে চলে এলে লোলা রাহুলের সাথে আসতে রাজি হননি। এরও অনেক পরে— ১৯৫০ সালে— তিনি কৃত্রিম বিবাহ করেন নেপালি মহিলা কমলা পেরিয়ারকে।

দুই

লোলা ও প্রথম যৌবনে রাহুল ছিলেন ঈশ্বর-বিশ্বাসী ও ধর্মচর্চায় মনোযোগী। তবে ঈশ্বর-বিশ্বাস ও ধর্মচর্চা কখনো অন্ধতাকে তিনি প্রশ্রয় দেন নি। যুক্তিশীলতা ছিল তাঁর একান্ত মানস-বৈশিষ্ট্য। সেই মানস-বৈশিষ্ট্যের দরুনই বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসকে যুক্তির কঠিনাখরে যাচাই করে নিতে নিতে এক সময় ঈশ্বর ও ধর্মের নির্মৌক পরিত্যাগ করে হয়ে ওঠেন দ্ব্যন্দ্বিক বস্তুবাদী।

বিশ বছর বয়সে—১৯১৩ সালে—ছাপরা জেলার পরসা মঠের মহান্তের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তখন তাঁর নাম হয় বাবাজি রামোদার দাস। মহান্তের মৃত্যুর পর তাঁর গদির উত্তরাধিকারী রূপে লক্ষ লক্ষ টাকা ভোগের সুযোগ লাভ করেছিলেন তিনি। কিন্তু ভোগসুখের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রাখা ছিল তাঁর স্বভাব-বিরুদ্ধ। তাই অনায়াসে তিনি মহান্তের গদি ছেড়ে দেন। এ-সময় তিনি দয়ানন্দ সরস্বতী প্রতিষ্ঠিত আর্যসমাজের সঙ্গে পরিচিত হন, এবং বেদ-অনুসারী আর্যসমাজের ভাবধারাকে সত্য বলে মেনে কিছুদিনের জন্য আর্যসমাজী হয়ে যান। আর্যসমাজে অবস্থান করেই গভীরভাবে বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করে তিনি উপলব্ধি করেন যে বেদ-বিরোধী বৌদ্ধ মতবাদই হচ্ছে প্রকৃত সত্যের ধারক। এই উপলব্ধি থেকেই তিনি বৌদ্ধ ভিক্ষু হয়ে রাহুল সাংকৃত্যায়ন নাম ধারণ করেন। আজীবন এই নামটি তিনি পরিত্যাগ করেন নি, এবং এ-নামেই হন স্বনামধন্য ও বিশ্বনন্দিত।

বৌদ্ধ দর্শনে ব্যুৎপত্তি লাভ করার পরই তিনি একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে মার্কসীয় দর্শন অধ্যয়ন করেন এবং মার্কসবাদকেই গ্রহণ করেন তাঁর জীবনদর্শন রূপে। আমৃত্যু সেই দর্শনের তিনি অনুসারী ছিলেন, মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েই জীবন ও জগতের সকল কিছুর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে চলছিলেন। তাঁর নিজের ভাষায়,—

“আমি কোনো এক সময় বৈরাগী ছিলাম, পরে আর্যসমাজী হয়েছিলাম, বৌদ্ধ ভিক্ষুও হই, আবার বুদ্ধের ওপর অপার শ্রদ্ধা রেখেও মার্কসের শিষ্য হয়েছি।”

মার্কসের শিষ্য ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় সদস্য হয়েও বুদ্ধের শিষ্যত্ব তিনি পরিত্যাগ করেন নি কেন তার ব্যাখ্যা তিনি নিজেই দিয়েছেন। কয়েকবার তিব্বত অভিযান করে তিনি যে-সব হারিয়ে যাওয়া বৌদ্ধগ্রন্থের উদ্ধার সাধন করেন, সে-সবের মধ্যেই ছিল বৌদ্ধদর্শনের অন্যতম ভাষ্যকার ধর্মকীর্তির ‘প্রমাণ বার্তিক’ গ্রন্থটি। সেই গ্রন্থে বুদ্ধের মতবাদ সম্পর্কে স্পষ্টভাবে লেখা হয়েছে—

“বেদকে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করা, কাউকে (ঈশ্বর) কর্তা বলে মানা, গঙ্গাদিতে স্নান করে পুণ্যসঞ্চয় করা, উচ্চনীচ জাতির অভিমান করা, পাপ বিনষ্ট করার জন্য সতাপ—এই পাঁচটি বুদ্ধিহীন মৃত্যুর লক্ষণ।”

ধর্মকীর্তির গ্রন্থে প্রাপ্ত বুদ্ধের এই মতবাদ রাহুলের চৈতন্যকে ভীষণভাবে আলোড়িত করে। আবার বৌদ্ধদর্শন পাঠ করেই উপলব্ধি করেন যে বুদ্ধ তাঁর সকল মতবাদকে চূড়ান্ত বা চিরকালীন বলে নিজেও গ্রহণ করেননি এবং অন্যকেও তেমন করার উপদেশ দেন নি। তিনি সকলকে ‘আত্মদীপ’ হওয়ার—অর্থাৎ নিজের পথ নিজেই খুঁজে নেওয়ার—পরামর্শ দিয়েছেন। বুদ্ধের এই বক্তব্যও রাহুলকে বিশেষভাবে উজ্জীবিত করে, এবং এক সময় মার্কসীয় দর্শনের মধ্যে তিনি খুঁজে পান বৌদ্ধের দর্শনের ধারাবাহিকতায় পরিচয়। ‘বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ’ গ্রন্থে রাহুল বলেন,—

“বুদ্ধ ছিলেন কালবাদী—দেশ, কাল, ব্যক্তি দেখে তিনি তাঁর সম্পদ দান করতেন, বাতাসে তলোয়ার চালনা পছন্দ করতেন না তিনি। বুদ্ধের এই নগণ্য শিষ্য রাহুলেরও নীতি তাই। বুদ্ধের শিষ্যত্বের যে অধিকার সেটা আমি ছেড়ে দিইনি। বুদ্ধ বলেছিলেন, ‘আমার উপদেশিত ধর্ম নৌকার মতো, পারে পৌছানোর জন্যে, ঘাড়ে

করে বয়ে চলার জন্য নয়' (মজ্বিম নিকায়)। তাঁর উপদেশ অনুসরণ করেই আমি ক্ষণিক (দ্বন্দ্বমূলক) অনাত্মবাদ থেকে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদে এসে পৌঁছেছি।"

ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্রীরা যেমন আত্মার অবিনাশিতায় বিশ্বাস করেন, বুদ্ধ তেমনটি করতেন না। তাই তাঁর মতবাদের অভিধা 'ক্ষণিক অনাত্মবাদ'। কোনো কিছুই নিত্য বা অপরিবর্তনীয় নয়, সব কিছুই ক্ষণে ক্ষণে বদল ঘটে। এই বদল ঘটান দর্শনই প্রতীত্যসমুৎপাদ। বুদ্ধ তাঁর ধর্মপদে এই ক্ষণিক অনাত্মবাদ তথা প্রতীত্য-সমুৎপাদের দর্শনকে বর্ণনা করেছেন এ-ভাবে,—

"ভিক্ষুগণ, সবকিছু যা জীবিত থাকে তা মারা যায় বলে জানবে। প্রত্যেক কিছুর একটি কারণ আছে। যে বস্তু স্থায়ীভাবে আত্মপ্রকাশ করে বাস্তবে এটা অস্থায়ী। তারা অবশ্যই দূরীভূত হয়ে যাবে। গৌরবের সর্বোচ্চ বিন্দুতে থাকলেও তার শেষ আছে। একা থাকলে বিচ্ছেদও আছে। যেখানে জীবন আছে সেখানে মৃত্যুও আছে।"

'কার্যকারণের নিয়মকে বিশ্ববিকাশের মূল হিসেবে চিহ্নিত করার ভারতীয় ধারার বড় ধরনের বিকাশ'ই ঘটেছিল বৌদ্ধ প্রতীত্যসমুৎপাদে। রাহুল এ-দর্শনটির প্রতি প্রবলভাবে আকৃষ্ট হয়েও এর সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছিলেন। সেই সীমাবদ্ধতাই তিনি নিরাকৃত হতে দেখলেন মার্কসীয় দ্বন্দ্বিক বস্তুবাদে। বুদ্ধের প্রতীত্যসমুৎপাদ দর্শনের নৌকা বা ভেলায় চড়ে তিনি মার্কসীয় দ্বন্দ্বিক বস্তুবাদে উপনীত হতে পেরেছিলেন বলেই নিজেকে যুগপৎ বুদ্ধ ও মার্কসের শিষ্য বলে পরিচিত করেছেন।

বৌদ্ধশাস্ত্রে অসাধারণ জ্ঞান অর্জনে রাহুল বিশেষ সহায়তা পেয়েছেন শ্রীলঙ্কার বৌদ্ধ শাস্ত্রপীঠ 'বিদ্যালংকার পরিবেশ' থেকে। ১৯২৭ সালের ১৬মে থেকে ১৯২৮ সালের ১ ডিসেম্বর বিদ্যালংকার পরিবেশে অবস্থান করে সংস্কৃতের অধ্যাপনা করেন ও মূল পালিভাষায় ত্রিপিটক শাস্ত্র ও অট্ঠকথা অধ্যয়ন করেন। বিদ্যালংকার পরিবেশ থেকে তিনি 'ত্রিপিটকাচার্য' উপাধি পান, এবং কাশীর পাণ্ডিতসমাজ কর্তৃক ভূষিত হন 'মহাপণ্ডিত' উপাধিতে।

১৯৩৪, ১৯৩৬ ও ১৯৩৮— এই তিনবার তিনি তিব্বতে যান, সেখান থেকে তিনি ৩৬৩টি সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করেন। বিশিষ্ট মার্কসবাদী লেখক ও বিপ্লবী সত্যেন্দ্র নাথায়ণ মজুমদার লিখেছেন,—

"রাহুলের বৌদ্ধ ভিক্ষু জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি ভারতে লুপ্ত বৌদ্ধ সাহিত্য, ধর্ম ও দর্শনের অমূল্য সম্পদগুলিকে তিব্বত থেকে পুনরুদ্ধার এবং বিহ্বল সমাজের সামনে তুলে ধরা। এই কীর্তি তাঁকে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় ক্ষেত্রে স্বীকৃতি দান করে।...নাগার্জুন, অশ্বমেধ, বসুবন্ধু, জ্ঞানশ্রী, প্রজ্ঞাকর গুপ্ত, রত্নকীর্তি প্রমুখ বহু বৌদ্ধ পণ্ডিতের লুপ্ত মূলগ্রন্থ তিনি আবিষ্কার করেন। বৌদ্ধ দর্শনের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি ধর্মকীর্তির 'প্রমাণবার্তিক' গ্রন্থের মূল সংস্কৃত আকারে পুনরাবিষ্কারের কৃতিত্ব তাঁরই। রাহুলের তিব্বত অভিযান ছিল যেমন বিপদসঙ্কুল তেমনি রোমাঞ্চকর।...সংগৃহীত পুঁথিগুলি বহনের জন্য ২২টি ঘোড়া ও ঝকরের প্রয়োজন হয়। সেই বিশাল সংগ্রহের বেশির ভাগই এখন পর্যন্ত অপ্রকাশিত। সেগুলি পাটনা যাদুঘরে বিহার রিসার্চ সোসাইটির ও বিদ্যালঙ্কার মঠের গ্রন্থাগারে পড়ে আছে।"

প্রখ্যাত বৌদ্ধদর্শন-বিশারদ শ্চেরবাট্কেইর আমন্ত্রণে ১৯৩৭ সালে রাহুল রাশিয়ায় যান, এবং ১৯৩৮ সালে দেশে ফিরে আসেন। আবার দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ১৯৪৫ সালে রাশিয়ায় গিয়ে লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। রাহুল ও শ্চেরবাট্কেই— এই দুই জ্ঞানব্রতী বৌদ্ধ দর্শন সম্পর্কে পারস্পরিক মতবিনিময়ের মধ্য দিয়ে উভয়েই যথেষ্ট সমৃদ্ধ হন, এবং উভয়ের প্রযত্নে বৌদ্ধ দর্শনের অনেক অজ্ঞাত তথ্য ও তত্ত্বের উন্মোচন ঘটে।

রাহুল শুধু পৃথিবী পরিব্রাজকই ছিলেন না, বিশ্বের জ্ঞানরাজ্যে পরিব্রাজনাতেও ছিলেন একান্ত নিষ্ঠাবান ও নিরলস।

তিন

রাহুল তাঁর অধীত জ্ঞান ও উপলব্ধিকে লোকসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে না-দিয়ে তৃপ্ত থাকতে পারতেন না। এর জন্যই তিনি প্রতিনিয়ত লিখে চলেছেন। প্রায় দেড়শত গ্রন্থের তিনি রচয়িতা। তাঁর গ্রন্থ রচনার প্রকৃতি ছিল একান্তই ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্যের ধারক। এ-ব্যাপারে গোপাল হালদার জানিয়েছেন,—

তিনি একসঙ্গে চার পাঁচটা বই লিখেছেন। চার পাঁচজন লোককে বসিয়ে দিতেন তাঁর চারদিকে। খাবার জিনিসপত্র থাকতো, মাঝে মাঝে খেয়ে নিতেন, ছাঁসাত ঘন্টা তিনি একজনের পর আর একজনকে বলে বলে যেতেন। চারজন লোককে চার বিষয়ে একের পর এক বলে যাওয়া, খেই না হারিয়ে এবং ভাষা ঠিক রেখে, সামঞ্জস্য রেখে— এ অদ্ভুত প্রতিভাধারী মানুষের পক্ষেই সম্ভব।”

শুধু তাই নয়। অন্যকে দিয়ে এভাবে লেখানো ছাড়াও, পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজ হাতেও তিনি অনবরত লিখে যেতেন। এ-ব্যাপারে রাহুলের বন্ধু ধর্মাদার মহাহুবির একটি অভিনব তথ্য আমাদের জানিয়েছেন,—

“একবার বেনারসে একসঙ্গে খেতে বসেছি, আমরা কয়েকজন খাচ্ছি ডালভাত, তিনি রুটি। কেন ভাত তরকারি খান না জিজ্ঞেস করায় তিনি বললেন : ‘রুটি মুখে দিয়ে চিবোতে চিবোতে লিখতে পারি। হাত পরিষ্কার থাকে।’ এর থেকে প্রমাণ হয় সময়ের অপচয় তিনি করতেন না। সেই জন্য সংস্কৃতি, রাজনীতির এত কাজ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল।”

এভাবে নিজের হাতে লিখে ও অন্যকে দিয়ে লিখিয়ে রাহুল যে-সব বই প্রকাশ করেছেন, সে-সব বই প্রকৃতিতে ও বিষয়বস্তুতে যেমন বিচিত্রবিধ, প্রকাশরীতিতেও তেমনই অভিনবত্ব ও বিশিষ্টতার ধারক। বিভিন্ন ধরনের পাঠকের কথা বিবেচনায় রেখে একই বিষয়বস্তু নিয়ে একাধিক বই একাধিক ভঙ্গিতে তিনি রচনা করেছেন। কোনোটি হাল্কাচালের, কোনোটি গম্ভীর। কোনো বইয়ে গল্পের মাধ্যমে সমাজসত্য সম্পর্কে সাধারণ পাঠককে আকৃষ্ট ও শিক্ষিত করে তোলার প্রয়াস, কোনো বইয়ে অপেক্ষাকৃত অগ্রসর পাঠকের জন্য তথ্যানুসন্ধান ও তত্ত্বকথন।

উদাহরণস্বরূপ ‘ভোল্গা থেকে গঙ্গা’ ও ‘মানব সমাজ’ বই দুটোর কথা বলা যেতে পারে। বিশটি গল্পের আধারে গণমনতোষিণী ভাষা ও রীতিতে ‘ভোল্গা থেকে গঙ্গা’য়

বিশ শতকের বিশের দশক পর্যন্ত মানবসমাজের ইতিহাসটিকে তিনি তুলে আনেন। এর পরই লিখেন দুই খণ্ডের ‘মানব সমাজ’ গ্রন্থটি। এ-গ্রন্থে সমাজবিজ্ঞানের পদ্ধতি অবলম্বন করে অপেক্ষাকৃত অগ্রসর পাঠকদের জন্য মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে মানবসমাজের ইতিহাস বিবৃত করেন— বিষয়বস্তু এক হওয়া সত্ত্বেও হালকা চালের ‘ভোল্গা থেকে গঙ্গা’ থেকে আঙ্গিকে ও প্রকাশ রীতিতে ‘মানব সমাজ’ একান্তভাবেই স্বতন্ত্র।

পীযুষেন্দু গুপ্ত নামক একজন আলোচক রাহুল-রচিত সাহিত্যকে চার ভাগে বিভক্ত করে দেখিয়েছেন। প্রথম ভাগে পড়ে ‘অতি উচ্চস্তরীয় গবেষণামূলক গ্রন্থসমূহ।’ যেমন,— ‘মধ্য এশিয়ার ইতিহাস’। দ্বিতীয়ভাগে আছে ‘মানব সমাজ’, ‘বিশ্বের রূপরেখা’, ‘বৈজ্ঞানিক ভৌতিক বাদ’, ‘দর্শন-দিগদর্শন’ ইত্যাদি গ্রন্থ। এই গ্রন্থগুলো মূলত রচিত হয়েছিল শিক্ষিত পাঠকদের কাছে ভারতীয় পটভূমিকায় মার্কসবাদকে পরিচিত করানোর উদ্দেশ্যে। রাহুল-সাহিত্যের তৃতীয় ভাগে আছে ঐতিহাসিক কাহিনী এবং উপন্যাস। যেমন— ‘সিংহ সেনাপতি’, ‘জয় যৌধেয়’, ‘ভোল্গা থেকে গঙ্গা’ ‘রেখা ভগৎ’, ‘মঙ্গল সিংহ’, ‘সফদর’, ‘সোমের’ ইত্যাদি। এগুলোতে প্রাচীন কাহিনীর মধ্য দিয়ে তিনি বিগত কালের রাজনৈতিক বিষয়গুলোকে গণমনের উপযোগী রূপে পরিষ্কৃত করে তুলতে প্রয়াসী হয়েছেন। সর্ব শেষভাগে আছে তাঁর এমন কতকগুলো গ্রন্থ যেগুলো তিনি রচনা করেছেন একান্তই স্বল্পশিক্ষিত লোক সাধারণ ও শ্রমনিষ্ঠ প্রাকৃত জনের জন্য। যেমন— ‘বাইসবী সদী’ (বাইশতম শতাব্দী), ‘সাম্যবাদ হি কেওঁ’ (সাম্যবাদই কেন), ‘তুমহারী ক্ষয়’ (তোমার ক্ষয়) ‘ভাগো নেহী, দুনিয়া কো বদলো’ (পালিও না, দুনিয়াকে বদলাও) ইত্যাদি। এগুলোর বাইরেও আছে তাঁর পাঁচখণ্ডের বিশাল গ্রন্থ ‘মেরী জীবনযাত্রা’ শীর্ষক আত্মজীবনী।

সংক্ষেপে তাঁর গ্রন্থাবলির পরিচয় তুলে ধরা কোনো মতেই সম্ভব নয়। তবে তাঁর প্রখ্যাত গ্রন্থ ‘দর্শন-দিগদর্শন’ সম্পর্কে কিছু কথা না-বললেই নয়। ‘দর্শন-দিগদর্শন’কে বলা যায় প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শনের ইতিহাস গ্রন্থ। কিন্তু, না। এটুকু বলাই যথেষ্ট নয়। বড় বড় বিদ্বান ব্যক্তির দর্শনের যে-সব ইতিহাস লিখেছেন সেগুলো অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও তত্ত্বে অবশ্যই বিশেষ সমৃদ্ধ। কিন্তু রাহুলের বইয়ে দর্শনের সব তত্ত্ব ও তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে মার্কসীয় দ্বন্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদী দৃষ্টিতে। এতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ও বিভিন্ন যুগের দর্শনের মূলমর্ম যেভাবে উদ্ঘাটিত হয়েছে, তেমনটি আর কোথাও হয়নি। বিশেষ করে ভারতীয় দর্শন ও ইসলাম দর্শন রাহুলের হাতে নতুন আলোতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। ইসলামের প্রগতিশীল ও বৈপ্লবিক ভূমিকার প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে রাহুল লিখেছেন,—

“ইসলাম বোঝাপড়া করতে চেয়েছিল, সামন্ত-পুরোহিতদের শাসন ব্যবস্থার সঙ্গেই যার অর্থনৈতিক বুনিয়াদ ছিল সামন্তবাদী শোষণ ও দাসপ্রথা। একথা ঠিক যে ইসলাম এই মূল ভিত্তিকে পরিবর্তিত করার উদ্দেশ্য কখনও ঘোষণা করেনি, কিন্তু এই কাজে আরবের উপজাতীয় গোষ্ঠীগুলির (কবীলগুলির) মধ্যে প্রচলিত সাম্য ও সৌভ্রাত্যের নীতিকে অবশ্যই ব্যবহার করেছিল, যাতে তারা মুষ্টিমেয় শাসকগোষ্ঠীর পায়ের নীচে পড়ে থাকা সাধারণ জনতার এক বিরাট অংশকে আকৃষ্ট ও শোষণমুক্ত

করতে সমর্থ হয়েছিল। যদিও ইসলাম ঐ নীতিকে কবীলগুলির সামাজিক কাঠামো থেকেই গ্রহণ করেছিল তবুও পরিণামে এটি একটি প্রগতিশীল শক্তির কাজ করেছিল।”

শুধু ‘দর্শন-দিগদর্শন’-এ নয়। ইসলামের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা থেকে এক সময় তিনি সংস্কৃত ভাষায় কোরান শরিফের অনুবাদেও প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। তাঁর ‘ইসলামের রূপরেখা’ একটি অনবদ্য গ্রন্থ। বর্তমানে কিছু ধর্মাত্ম মুসলমান মৌলবাদী ভাষ্যের মাধ্যমে ইসলামের একটি বিকৃত রূপের প্রকাশ ঘটানো হচ্ছে, তখন সেই বিকৃতিটাকেই অনেকে প্রকৃত ইসলাম বলে সাব্যস্ত করে বসেছে। বিশেষ করে পাশ্চাত্যে এখন ইসলামকে একান্তই মৌলবাদী বলে চিত্রিত করা হচ্ছে এবং জঙ্গিবাদের সঙ্গে ইসলামকে একীভূত করে ফেলে সারা বিশ্বে ইসলাম-বিদ্বেষ ছড়ানো হচ্ছে। একান্তই অসঙ্গত এই বিদ্বেষ। এই বিরূপ সময়ে রাহুল সাংকৃত্যায়নের ইসলামচর্চা থেকে আমরা প্রকৃত সত্যের সন্ধান পেতে পারি,— মহান ইসলাম সম্পর্কে আমাদের সকল ভুল ধারণার অপনোদন ঘটতে পারে।

চার

মহাপণ্ডিত রাহুল তাঁর পাণ্ডিত্যের ভাগ যেমন বিভিন্ন ধরনের বই রচনা করে সকল শ্রেণীর পাঠকের জন্য পরিবেশন করেছেন, তেমনই সক্রিয় রাজনীতিতে যুক্ত হয়ে তাঁর তত্ত্বজ্ঞানকে কর্মে পরিণত করে তুলেছেন। একই সঙ্গে চলেছে তাঁর বিশ্বপরিভ্রমণ, জ্ঞানান্বেষণ ও রাজনীতিচর্চা।

বিশ শতকের বিশের দশকের গোড়াতেই তিনি কংগ্রেসী রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে অহিংস-অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয় অবদান রাখেন। এই আন্দোলনের জন্য দু’বার তাঁকে কারাবাসে যেতে হয়।

তিরিশের দশকের প্রায় শুরু থেকেই তাঁর চৈতন্যে আমূল পরিবর্তনের সূচনা ঘটে। এ-সময়েই তিনি মার্কসবাদকে তাঁর জীবনদর্শন রূপে গ্রহণ করেন, এবং তারই পরিণতিতে যোগ দেন কমিউনিস্ট পার্টিতে।

১৯৩৯ সালে বিহারের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা সদস্যপদ লাভ করেন তিনি। কিছুদিন পরেই বিহারে কৃষক-সত্যগ্রহে অংশ নিয়ে গ্রেফতার হন। এ-সময়ে মুক্তি পেলেও ১৯৩৯ সালের ১৫ মার্চ ভারতরক্ষা আইনে আবার তাঁকে গ্রেফতার করা হয় এবং হাজারিবাগে তাঁকে ২৯ মাস কারাভোগ করতে হয়।

১৯৪৭ সালে ভাষা প্রশ্ন নিয়ে (হিন্দি-উর্দু বিতর্ক) কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে তাঁর মতানৈক্যের সৃষ্টি হয়। এর ফলে তিনি পার্টির সদস্যপদ ত্যাগ করেন। কিন্তু কমিউনিজমের দর্শন পরিত্যাগ করা তাঁর পক্ষে ছিল অসম্ভব। তাই ১৯৫৫ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি রাহুল কমরেড অজয় ঘোষের সঙ্গে দেখা করে আবার পার্টির সদস্য হন। রাহুল নিজেই লিখেছেন,—

“এটা নকলেই জানতেন যে আমি পার্টি সদস্য না-থাকলেও প্রকৃতপক্ষে ছিলাম পার্টিরই লোক। আর কলমের সাহায্যে সে-কাজই তো করতাম। এখনও কলম

দিয়েই সে-কাজ করে যেতে পারি। এ-কথা তাঁকে (কমরেড অজয় ঘোষকে) বলছি।”

আসলে ভাষা-প্রশ্নে মতানৈক্য সত্ত্বেও রাহুল পার্টি থেকে বহিস্কৃত হননি। তিনি নিজের ইচ্ছাতেই পার্টি থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন। তবু সব সময় নিজেকে তিনি পার্টির লোক বলেই ভেবেছেন, এবং পার্টির বাইরে থাকা-যে সঠিক বা সঙ্গত নয় এক সময় এ-বোধে উপনীত হয়েই আবার পার্টির সদস্যপদ গ্রহণ করেছেন।

রাহুল দীর্ঘকাল ডায়বেটিসে ভুগছিলেন। ১৯৬১ সালের ডিসেম্বরে তাঁর মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হয় এবং শ্রুতিভ্রষ্ট হয়ে যান। কিছুদিন কলকাতার হাসপাতালে চিকিৎসা চলার পর তাঁকে মক্কোতে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে সাতমাস ধরে তাঁর চিকিৎসা চলে। কিন্তু তাঁর শ্রুতির আর পুনরুদ্ধার ঘটে না। ১৯৬৩ সালের ২৩ মার্চ তাঁকে দেশে ফিরিয়ে আনা হয় এবং ১৪ এপ্রিল ৭০ বছর বয়সে তাঁর মহাপ্রয়াণ ঘটে।

পাঁচ

বাংলা ও বাঙালির সঙ্গে রাহুলের ছিল ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। রাহুলের যেমন বাঙালিদের জন্য ছিল গভীর ভালোবাসা, বাঙালিদেরও তেমনই রাহুলের প্রতি রয়েছে অন্তহীন প্রীতি ও শ্রদ্ধা। পশ্চিমবঙ্গে তো রাহুলকে নিয়ে অনেক লেখালেখি হয়েছে, এখনও হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় বাংলাদেশ রাহুলচর্চায় অনেক পিছিয়ে থাকলেও সাম্প্রতিক কালে এ-ব্যাপারে এখানেও বেশ সচেতনতা দেখা দিয়েছে। বাংলাদেশে রাহুলচর্চায় অগ্রচারীর ভূমিকায় আছেন চট্টগ্রামের বৌদ্ধসমাজের সুধীবৃন্দ। অতি সম্প্রতি (মে ২০০৯) প্রকাশিত হয়েছে ঐ সমাজেরই তরুণ লেখক জগন্নাথ বড়ুয়ার ‘মহাপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন জীবন ও সাহিত্যকর্ম’ গ্রন্থটি।

বহু ভাষাবিদ রাহুলের বইপত্র মূলত হিন্দি ভাষাতেই লিখিত। তবে সংস্কৃত, পালি, তিব্বতি, ভোজপুরী প্রভৃতি ভাষাতেও বেশ কিছু বই তিনি লিখেছেন। বাংলা ভাষায় এ-পর্যন্ত রাহুলের অন্তত বিশ/পঁচিশটি গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এ-গুলোর মধ্যে আছে : দর্শন-দিগদর্শন (২ খণ্ড), বৌদ্ধ দর্শন, মানবসমাজ, ভোল্গা থেকে গঙ্গা, সিংহ সেনাপতি, বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ, তিব্বতে সওয়া বছর, কিন্নর দেশে, মাও সে-তুঙ, বিশুদ্ধতাবাদী, ইরাণ, জয় যৌধেয়, শ্রুতির অন্তরালে, বহুরূপী মধুপুরী, ভারতে বৌদ্ধধর্মের উত্থান-পতন, সপ্তসিদ্ধি, ইসলাম ধর্মের রূপরেখা, অগ্নিস্বাক্ষর, উত্তরাংশ, মধুর স্বপ্ন, পুরনো সেই দিনের কথা (সতমী কে বচ্ছে), কনৈলা কী কথা, রামরাজ্য ও মার্কসবাদ, নতুন মানব সমাজ, আমার লাদাখ যাত্রা, এবং পাঁচখণ্ডে লিখিত আত্মজীবনী ‘আমার জীবন যাত্রা’ প্রভৃতি।

বাংলায় অনুবাদিত এই বইগুলো বর্তমানে খুব সহজপ্রাপ্য নয়। অথচ রাহুলের বইগুলোর সঙ্গে বর্তমানের তরুণ বাঙালি পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন খুবই তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে বিগত শতকের নব্বইয়ের দশকে সমাজতাত্ত্বিক বিশ্বের বিপর্যয়ের পর বিশ্বায়নের নামে সাম্রাজ্যবাদের পৃষ্ঠপোষকতা-ধন্য জাতিকবন্দ যখন ‘ইতিহাসের সমাপ্তির তত্ত্ব’ প্রচার করেন কিংবা মার্কসীয় শ্রেণীসংগ্রামের

তত্বকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার লক্ষ্যে বিভ্রান্তির জাল বিস্তার করেন, তখন সে-জাল থেকে বেরিয়ে এসে প্রকৃত সত্যের সন্ধান পাবার জন্য রাহুলের গ্রন্থপাঠ একান্তই জরুরি। রাহুলের সব বক্তব্যই-যে পুরোপুরি যুক্তিসিদ্ধ নয়, এবং অনেক ক্ষেত্রেই-যে তিনি সরলীকরণের প্রশয় দিয়েছেন,—এ-কথা ঠিক। তবু, মানতেই হবে যে : প্রাচীন কাল থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত আমাদের এই উপমহাদেশের ভাবনা-ধারণা ও কর্মকাণ্ডকে মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে রাহুল যেভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন তেমনটি আর কারো দ্বারাই সম্ভব হয়নি। তাই, একালেও, রাহুলের বক্তব্যের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার আবশ্যিকতা আমাদের জন্য একান্তই অপরিহার্য।

এই অপরিহার্যতার বোধে উদ্বুদ্ধ হয়েই ‘রুক্মিণী শাহ্ ক্রিয়েটিভ পাবলিশার্স’-এর মোঃ আমজাদ হোসেন খান (জামাল), বঙ্গানুবাদিত রাহুল-পুস্তকাবলির প্রকাশ ও প্রচারে উদ্যোগী হয়েছেন। তাঁর এই উদ্যোগ সাফল্যমণ্ডিত হোক।

— হাজী নূরুজ্জামান

এতু প্রসঙ্গে

'বৌদ্ধ দর্শন' পণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়নের বৌদ্ধ দর্শন সম্পর্কে এক বিস্তারিত আলোচনা গ্রন্থ। রাহুলজি তাঁর 'দর্শন-দিগ্‌দর্শন' গ্রন্থে আয়োজনীয় (খ্রিস্ট দর্শন), ইসলামি দর্শন, প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য দর্শন এবং বৌদ্ধ দর্শন নিয়ে আলোচনা করেছেন, কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁর মনে হয় বৌদ্ধ দর্শন সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ আছে। রাহুলজির এক বৈশিষ্ট্য ছিল কোনো গ্রন্থের পরিমার্জনা বা সম্পাদনার প্রয়োজন থাকলে তিনি তা না করে প্রয়োজনবোধে নতুন একটি বই লিখতেন। 'বৌদ্ধ দর্শন' তেমনই একটি সৃষ্টি এবং রাহুলজির 'দর্শন-দিগ্‌দর্শন' গ্রন্থের একটি পরিপূরক গ্রন্থ।

মলয় চট্টোপাধ্যায়

আমাদের প্রকাশিত রাহুল সাংক্ৰত্যায়ন-এর অন্যান্য বই

- | | |
|--|----------------------------------|
| ১। ভোলগা থেকে গঙ্গা (দুইপর্ব এক সঙ্গে) | ২১। বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ |
| ২। সিংহ সেনাপতি | ২২। বহুরদী মধুপুরী |
| ৩। দর্শন-দিগ্‌দর্শন (প্রথম খণ্ড) | ২৩। রামরাজ্য ও মার্কসবাদ |
| ৪। দর্শন-দিগ্‌দর্শন (দ্বিতীয় খণ্ড) | ২৪। তোমার ক্ষয় |
| ৫। ইসলাম ধর্মের রূপরেখা | ২৫। ভাগো নহী দুনিয়াকো বদলো |
| ৬। ভবঘুরে শাস্ত্র | ২৬। ঘুমঝড় শাস্ত্র |
| ৭। ইরান | ২৭। আজম গড় কা পুরাকথা |
| ৮। তিব্বতে সওয়া বছর | ২৮। অতীত সে বর্তমান |
| ৯। চেতনার দাসত্ব | ২৯। সতমী কে বঁচে |
| ১০। আজকের সমস্যাবলী | ৩০। কনৈলা কী কথা |
| ১১। জয় যৌধেয় | ৩১। জিন কী লিয়ে |
| ১২। কমিউনিজম ও ভাবীকাল | ৩২। মানুষের কাহিনী |
| ১৩। এশিয়ার দুর্গম ভূখণ্ডে | ৩৩। মধ্য এশিয়া |
| ১৪। আমার লাদাখ যাত্রা | ৩৪। স্মৃতির অন্তরালে |
| ১৫। মাও সে-তুঙ | ৩৫। ভারতে বৌদ্ধধর্মের উত্থান-পতন |
| ১৬। বিস্মৃত যাত্রী | ৩৬। সপ্তসিদ্ধি |
| ১৭। আকবর | ৩৭। অগ্নিস্বাক্ষর |
| ১৮। বৌদ্ধ-দর্শন | ৩৮। উত্তরাংশ |
| ১৯। মহামানব বুদ্ধ | ৩৯। মধুর স্বপ্ন |
| ২০। কিন্নর দেশে | ৪০। নতুন মানব সমাজ |

সূচিপত্র

গৌতম বুদ্ধের মূল সিদ্ধান্ত	১৯
গৌতম বুদ্ধ (৫৬৩-৪৮৩ খ্রিঃ পূঃ)	৩১
নাগসেন (১৫০ খ্রিঃ পূঃ)	৫৯
বৌদ্ধ সম্প্রদায়	৬৯
বৌদ্ধ দর্শনের চরম বিকাশ (৬৯৯ খ্রিঃ)	৭৯
দিঙনাগ (৪২৫ খ্রিঃ)	১০২
ধর্মকীর্তি (৬০৯ খ্রিঃ)	১০৪
অন্য দার্শনিকদের মতামত খণ্ডন	১২৮

গৌতম বুদ্ধের মূল সিদ্ধান্ত

বুদ্ধের উপদেশাবলিকে বুঝতে সুবিধে হবে, যদি পাঠক বুদ্ধের মূল চার সিদ্ধান্ত—তিনটি অস্বীকারাত্মক এবং একটি স্বীকারাত্মক—পূর্বাহ্নে জেনে নেন। এই চারটি হল—(১) ঈশ্বরকে অস্বীকার করা; অন্যথায় ‘মানুষ স্বয়ং নিজের প্রভু’—এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করা হয়; (২) আত্মাকে নিত্য স্বীকার না করা, অন্যথায় নিত্য একরস মানলে তার পরিশুদ্ধি এবং মুক্তির কোনো প্রশ্নই ওঠে না; (৩) কোনো গ্রন্থকে স্বতঃ প্রমাণ হিসাবে স্বীকার না করা, অন্যথায় বুদ্ধিবৃত্তি এবং অভিজ্ঞতা মূল্যহীন হয়ে পড়ে; (৪) জীবনপ্রবাহকে এই শরীরের মধ্যেই সীমিত মনে করা, অন্যথায় জীবন এবং তার নানা বৈচিত্র্য কার্য-কারণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উৎপন্ন না হয়ে, স্রেফ এক আকস্মিক ঘটনা রূপে প্রতিভাত হবে।

ঈশ্বরকে অস্বীকার করা

ঈশ্বরবাদীরা বলে থাকেন—যেহেতু প্রতিটি কর্মের পেছনে একটি কারণ থাকে অতএব এই বিশ্ব-সংসারের সৃষ্টিরও কোনো কারণ নিশ্চয়ই আছে এবং সেই কারণই ঈশ্বর। কিন্তু প্রশ্ন উঠতেই পারে যে ঈশ্বরের প্রকার কী? সেটি কী উপাদান প্রকার, যেমন মাটির ঘড়ার উপাদান মাটি, কিংবা সুবর্ণ কুণ্ডলের উপাদান সোনা? যদি ঈশ্বর জগতের উপাদান কারণ হয় তাহলে জগৎ ঈশ্বরের রূপান্তর। তাহলে সংসারে ভালোমন্দ, সুখ-দুঃখ, দয়া-ক্রুরতা যা সচরাচর আমরা দেখে থাকি, সবই ঈশ্বর থেকে প্রাপ্ত এবং ঈশ্বরে বর্তমান। যদি তাই হয়, তাহলে ঈশ্বর সুখময় নয়, বরং অনেক বেশি দুঃখময়, কারণ পৃথিবীতে দুঃখের পাল্লাই ভারী। ঈশ্বর যত না দয়ালু তদপেক্ষা অনেক বেশি ক্রুর। কারণ পৃথিবীর চতুর্দিকে ক্রুরতারই আচ্ছাদন। যদি গাছপালা ইত্যাদিকে সজীব নাও মনে করি; তাহলেও সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণে কীটাণু থেকে আরম্ভ করে কীট-পতঙ্গ, খেচর পক্ষীকুল, জলচর মৎস্য, সর্প ইত্যাদি সরীসৃপ, শৃগাল, নেকড়ে, বাঘ, সিংহ—সভ্য অসভ্য মানুষ সকলেই পরস্পরের প্রতি বৈরী ভাবাপন্ন। চোখ বুজে ভাবলে পৃথিবীর দৃশ্য, অদৃশ্য সমস্ত অংশই এক রোমাঞ্চকারী রণক্ষেত্র। যেখানে দুর্বলেরা সবলের গ্রাসে পরিণত হচ্ছে। পুনর্জন্মে অবিশ্বাসী ধর্মের এই তত্ত্বকে তো বিনা বিরোধিতায় গ্রহণ করা উচিত। পুনর্জন্মাবাদীরা তবু বলতে পারে যে সমস্ত দুঃখকষ্টই পূর্ব জন্মের কর্মফলে। তবে সেখানেও প্রশ্ন থেকে যায়। ভালোমন্দের পার্থক্য হয়তো জ্ঞানী লোকের পক্ষে করা সম্ভব। কিন্তু উন্মাদ, নেশাগ্রস্ত, বেহুঁশ ব্যক্তি যদি কারও মৃত্যুরও কারণ হয়; তার জন্য তাদের সর্বতো ভাবে দায়ী করা যায় কি? কিংবা এ কথা কি অস্বীকার করা চলে যে

মনুষ্যজগতের বাইরে অন্যান্য প্রাণী, যাদের ভালোমন্দ বিচারবোধই নেই, কিংবা যাদের জীবন আরেকজনের মৃত্যুর উপরেই নির্ভরশীল—তাদের কি তাদের কর্মফলের জন্য দায়ী করা চলে? মানুষের মধ্যে, শিশু, বালক এবং উন্মাদদের পৃথক করে দিলে, কর্মফলের দায়িত্ব নিতে পারে এমন সংখ্যা নিশ্চিত ভাবেই অনেক কমে যাবে। যদি ধরে নেওয়া যায় কর্মফলের জন্য জবাবদিহি করতে পারে বা করা উচিত, এমন সংখ্যা দেড়শো কোটি ধরা হয়, তাহলে কর্মফল ভোগার জন্য এত বিশাল সংখ্যা কোথেকে আসবে? পৃথিবীতে কচ্ছপের সংখ্যাই হয়তো দেড়শো কোটি হবে, যারা মানুষের তুলনায় দীর্ঘজীবী, আর কীটাণু, হাতি, সমুদ্রের তিমি ইত্যাদি কোন কর্মফল ভোগ করছে?

উপাদান-কারণ বর্তমান থাকলে তা কী ভাবে নির্বিকার হতে পারে? যদি ঈশ্বরকে নিমিত্ত কারণরূপে স্বীকার করা যায়, অর্থাৎ তিনি জগৎ এমন ভাবে সৃষ্টি করেন যে ভাবে কুস্তকার তার কলসি অথবা স্বর্ণকার তার গহনা তৈরি করে। তাহলে প্রশ্ন উঠতেই পারে এই সৃষ্টি কী করে হয়? কোনো উপাদান-কারণ ব্যতিরেকেই অথবা উপাদান-কারণের সাহায্যে? যদি উপাদান-কারণ ব্যতিরেকেই এটা সম্ভব হয়ে থাকে তাহলে আমাদের বস্তুজগৎ থেকে ভাবজগতে প্রবেশ করতে হবে, এবং সে অবস্থায় কার্য-কারণ সম্বন্ধীয় সমস্ত সিদ্ধান্ত বাতিল হয়ে যাবে। তাহলে পৃথিবীকে দেখে, তার সৃষ্টির পশ্চাতে ঈশ্বরের ভূমিকা স্বীকার করারই বা কী প্রয়োজন? যদি ইন্দ্রজালের মতো কোনো কার্য-কারণ ব্যতিরেকেই এই মায়াময় জগৎ সৃষ্টি সম্ভব, তাহলে প্রত্যক্ষ বস্তু মায়াময় হলে ঈশ্বরের উপস্থিতি কোন যুক্তিতে টিকে থাকবে? যদি উপাদান-কারণে সৃষ্টি হয়ে থাকে তাহলে তা কী ভাবে? কুস্তকারের মতো বস্তু থেকে পৃথক হয়ে, নাকি বস্তুতে ব্যাপ্ত হয়ে? যদি পৃথক হয়ে থাকে তাহলে ঈশ্বর সর্বব্যাপ্ত নয় এবং সৃষ্টি করার জন্য তার অপরের সাহায্য কিংবা সাধনের প্রয়োজন। পরমাণুর চেয়েও সূক্ষ্ম নবকণ (Neutron) পর্যন্ত পৌছাতে এবং তার মিশ্রণে ক্রমশ স্থূলতর বস্তু সৃষ্টি করতে তার কী কী যন্ত্রপাতি, বীক্ষণাগারের প্রয়োজন হয়েছে? যেমন স্বর্ণকারের হয় সাঁড়াশি ইত্যাদি বস্তুর। এবং সে অবস্থায় ঈশ্বর কী ভাবে সর্বশক্তিমান হতে পারে? যদি উপাদান-কারণ সর্ব ব্যাপক মেনেও নেওয়া যায় তবুও উপাদান-ব্যতিরেকে সৃষ্টিতে অক্ষম ঈশ্বরকে সর্বশক্তিমান বলা চলে না। এমতাবস্থায় অপবিত্রতা, ক্রুরতা প্রভৃতি দোষের উৎস হিসাবে ঈশ্বরেরই দায়িত্ব থেকে যায়।

এ ভাবে ঈশ্বর না-উপাদান-কারণ না-নিমিত্ত-কারণ। জগৎ সৃষ্টির একটা কারণ থাকতেই হবে এটা আবশ্যিক নয়। যদি জগৎ সৃষ্টির পেছনে কী কারণ আছে এই প্রশ্ন তোলা হয়, তাহলে তো বিশ্বের কোনো সূক্ষ্মতম বস্তু বা কোনো বিশেষ শক্তিকে অতিক্রম করে ঈশ্বরেই সীমাবদ্ধ থাকে না, ঈশ্বরের সৃষ্টিই বা কী ভাবে হল সেই প্রশ্নও এসে যায়। এজন্যই ঈশ্বরকে আদি কারণ স্বীকার করা যুক্তিযুক্ত নয়।

ঈশ্বর সর্বময় কর্তা, মানুষ তার হাতের পুতুল মাত্র, তাহলে ভালো বা মন্দ কাজের জন্য মানুষ কেন জবাবদিহি করবে? মানুষকে পৃথিবীতে দুঃখকষ্ট দিয়ে ঈশ্বর কোন দয়ালুতার পরিচয় রেখেছেন?

ঈশ্বর সৃষ্টিকর্তা এ কথা মানার কোনো অর্থ হয় না। যদি সৃষ্টি অনাদি হয়, তাহলে তার জন্য কোনো প্রভুর প্রয়োজন নেই, কারণ, সৃষ্টির যদি কোনো প্রভু থাকে, তাকে কার্যের পূর্বেই কার্যস্থলে উপস্থিত থাকা দরকার। যদি সৃষ্টি আদি হয়, তাহলে এক কোটি, দুই কোটি, এক অর্বুদ, দুই অর্বুদ বর্ষ নয়, অচিহ্ননীয় অনন্তবর্ষ থেকে সৃষ্টি উৎপন্ন হওয়া পর্যন্ত-নিষ্ক্রিয় ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ কী? একমাত্র ক্রিয়াই তো অস্তিত্বের প্রমাণ।

ঈশ্বরকে স্বীকার করে নিলে, মানুষকে তার অধীন, মেনে নিতে হয়। সে অবস্থায়, মানুষ 'নিজেই নিজের ভাগ্যবিধাতা' এই তত্ত্ব থেকে সরে আসতে হয়। তাহলে মানুষের আপন উন্নতির জন্য চেষ্টা করার প্রশ্নই বা ওঠে কী ভাবে? সুতরাং প্রশ্ন ওঠে ধর্মের এবং সেক্ষেত্রে ধর্মও তো নিষ্ফল। ঈশ্বরকে অস্বীকার করলে মানুষ বর্তমানে যে অবস্থায় আছে, তা মানুষেরই সৃষ্টি এবং ভবিষ্যৎও মানুষের হাতেই। মানুষের নিজস্ব কর্মের স্বাধীনতার মধ্যেই ধর্ম সার্থক হতে পারে। কিন্তু যুগ যুগ ধরে ঈশ্বরবাদীরা ধর্মের নামে যে রক্তস্রোত প্রবাহিত করেছে, কেন ঈশ্বর তা রোধ করার চেষ্টা করেনি। কারণ ঈশ্বর মানুষেরই মনোজগতের সৃষ্টি।

আত্মাকে নিত্য স্বীকার না করা

এখানে আমাদের আগে জেনে নেওয়া প্রয়োজন যে বৌদ্ধরা আত্মাকে কী ভাবে স্বীকার করে। বুদ্ধের কালে ব্রাহ্মণ, পরিব্রাজক প্রভৃতি ভিন্নমতের আচার্যরা এ কথা মানতেন যে শরীরের অভ্যন্তরে এবং শরীর থেকে পৃথক এক নিত্য চেতন শক্তি বর্তমান যার উপস্থিতিতে, শরীরে উষ্ণতা, জ্ঞানান্বেষণের প্রেরণা আসে! যখন এই চেতন শক্তি, এক শরীর থেকে কর্মানুসারে শরীরান্তরে যায়, তখন পূর্ব শরীর শীতল ও চেষ্টা রহিত হয়ে যায়। এই নিত্য চেতন শক্তিকেই আত্মা বলা হয়। সমীপ (Semitic) ধর্মেও পুনর্জন্ম বাদ দিয়ে এই আত্মার কথা আছে। তাছাড়া বুদ্ধের সমসাময়িক অন্যান্য আচার্যগণও এই তত্ত্ব প্রচার করেছেন যে—শরীর থেকে আত্মা কোনো পৃথক বস্তু নয়। শরীরে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে মিশ্রিত রসের কারণেই উষ্ণতা প্রচেষ্টা বা উদ্যমের সৃষ্টি হয়, এই রসের পরিমাণের তারতম্যের কারণে তা আবার হারিয়েও যায়। এ ভাবে দেখা যায় আত্মা শরীর থেকে ভিন্ন কোনো বস্তু নয়। বুদ্ধ—একদিকে আত্মাকে নিত্য কুটস্থ বলে স্বীকার করা অন্যদিকে শরীরের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গেই আত্মারও বিনাশ হয়ে যাওয়া—এই দুই চরম মতকে পরিত্যাগ করে এক মধ্যম মার্গ বেছে নিয়েছিলেন। বুদ্ধ বলেছেন, আত্মা কোনো নিত্য কুটস্থ বস্তু নয় বরং বিশেষ কারণে ক্ষুদ্রের (বস্তু, মন) সহযোগে উৎপন্ন এক শক্তি, যা অন্য বাহ্য পদার্থের মতো ক্ষণে ক্ষণে উৎপন্ন হচ্ছে এবং বিলীন হচ্ছে। চিহ্নের ক্ষণে ক্ষণে উৎপন্ন হওয়া এবং বিলীন হওয়ার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যতক্ষণ চিত্ত প্রবাহ শরীরে বর্তমান থাকে, ততক্ষণই শরীরকে সজীব বলা যায়। আমাদের অধ্যাত্ম পরিবর্তনের সঙ্গে শারীরিক পরিবর্তনের প্রচুর মিল রয়েছে।

আমাদের শরীর প্রতিমুহূর্তে পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। চল্লিশ বছরের একটি শরীর কখনওই সেই শরীর নয় যা পাঁচ বা বিশ বছর বয়সে ছিল, অথবা ষাট বছর বয়সেও থাকবে। প্রতিটি অণু, যা দিয়ে আমাদের শরীর গঠিত তা প্রতিক্ষণে ঝরে যাচ্ছে, স্থান করে দিচ্ছে নবোৎপন্নের জন্য। এ সমস্ত ঘটনার পরও এক বিগত শরীর থেকে নির্গত পরমাণু কণা তার উত্তরাধিকারী কণার সঙ্গে বহুলাংশে সাদৃশ্য বহন করে। এ ভাবে আমাদের প্রথম বর্ষের শরীর দশম বর্ষে থাকে না, আবার বিশ বছরে আগের দশ বছরের শরীরটিও থাকে না। কিন্তু ওই সদৃশতার কারণেই সাধারণ ভাবে আমরা এই পর্যায়গুলিকে এক করে, এক শরীরেই আরোপ করে থাকি। এ ভাবে আত্মাও ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তিত হচ্ছে কিন্তু সেই সদৃশতার কারণে আত্মাকেও এক এবং অভিন্ন বলা হয়। এ বিষয়ে আপনি আপনার নিজের জীবন-ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করতে পারেন, দু'বছর আগে যে সিগারেটের ধোঁয়া আপনাকে দূর থেকেও হয়তো বিব্রত করত, আজ হয়তো সেটাই আপনাকে পরিতৃপ্তির চরম সীমায় নিয়ে যায়। দু'বছর আগে একটা পাখিকে হত্যা করে তার মৃত্যুযন্ত্রণা দেখা আপনার কাছে হয়তো বিলাস ছিল, কোনো ভাবান্তর হত না। আজ হয়তো সেই ঘটনা অন্যের দ্বারা ঘটলেও আপনি অস্বস্তিতে পড়েন। যদি আপনার মানসিক পরিবর্তন এবং প্রবৃত্তির দিনলিপি লেখার অভ্যাস থাকে, তাহলে আপনার বিগত দশ বছরের সেই দিনলিপি পড়ে দেখুন, সেখানে এমন অনেক বিচারধারা পাবেন, যা একদিন একান্তই আপনার ছিল, আর এখন সেই বিচারধারার অনেক কিছুকেই আপনি হয়তো অস্বীকার করতে চাইবেন। বস্তুতপক্ষে ফেলে আসা দশ বছর আপনার বিচারধারাকে প্রতিমুহূর্তে একটু একটু করে পরিবর্তিত করেছে। আপনি প্রশ্ন করতে পারেন, হ্যাঁ মন বদলাতে পারে কিন্তু আত্মা কি বদলায়? আমাদের উত্তর, মনের বাইরে কোনো আত্মা নেই। চিত্ত-বিজ্ঞান-আত্মা একই বস্তু। যেভাবে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা এবং ত্বক এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে আমরা প্রত্যক্ষ অনুভব করতে পারি, মনকে সে ভাবে পারি না। তবে আমাদের মনের সত্তাকে স্বীকার করতে হয় কেন? চোখ হয়তো তেঁতুল দেখতে পেল, আর অমনি জিভে জল চলে আসে। নাক যেই দুর্গন্ধ পেল অমনি হাত নাকে চলে আসে। আপনি দেখেছেন যে চোখ আর জিভ এক বস্তু নয়, উভয়ের মধ্যে কোনো প্রত্যক্ষ যোগাযোগও নেই, এই দুই বস্তুকে মেলাবার জন্য আরেকটি ইন্দ্রিয়ের ভূমিকা আছে, সেটারই নাম মন। আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয় তাদের নিজস্ব অনুভূতি শক্তি বা জ্ঞানকে একটা জায়গায় পৌঁছে দেয়, সেখান থেকে শরীরে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালনের অনুশাসন আসে, সেই জায়গারই নাম মন। সে-ই গ্রহণ, চিন্তন এবং নির্ণয় স্থির করে। মন গ্রহণ ইত্যাদি কী ভাবে করে? কোনো ফৌজের কমান্ডারের মতো পৃথক অস্তিত্ব রেখে নয়। ধরা যাক পাঁচটা কাচের নলে লাল, হলুদ, সবুজ, নীল এবং কালো রঙের চূর্ণ ভরা আছে আর নিচে আরেকটি কাচের নলে জল প্রবাহিত হচ্ছে—যার সঙ্গে পূর্বোক্ত নল পাঁচটি সংযুক্ত, আর নলের মুখ থেকে থেকে খোলা হচ্ছে। সে সময় যে রঙের চূর্ণ জলে মিশছে, জল সেই রং ধারণ করবে। এ ভাবেই যখন চোখ একটা কালো রঙের সাপের উপরে গিয়ে পড়ে তখন আমাদের কালো রঙের সর্প দর্শন হয়। সঙ্গে সঙ্গে এই

দর্শনজনিত জ্ঞান বিদ্যুৎ গতিতে মনে সঞ্চারিত হয়। সেই তাৎক্ষণিক সময়ের মন, তার অতীত মনের অভিজ্ঞতার যে বীজ নিজের অভ্যন্তরে সুপ্ত অবস্থায় রেখেছে, এই নতুন জ্ঞানরূপী চূর্ণ পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে তার ভিত্তিতে ভয়ের রঙে রঞ্জিত হয়ে যায়। যদি সাপটিকে দেখা মাত্র দাঁড়িয়ে পড়তে হয়, তবুও গতিশীল চক্রের মতো একের পর এক মুহূর্ত ওই রং মনের মধ্যে রঞ্জিত হতে থাকবে। যদিও প্রথম থেকে দ্বিতীয়, দ্বিতীয় থেকে তৃতীয় এ ভাবে প্রতি ক্ষণ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব ক্ষণের রংটি ফিকে হয়ে আসবে। আর যদি সাপটিকে অনেকক্ষণ ধরে দেখা যায় কিংবা সেটি আপনার দিকে তেড়ে আসে, তাহলে, প্রতি ক্ষণে ক্ষণে উৎপন্ন মনে ভয় সঞ্চারের আধিক্য ঘটবে। যে ব্যাপার প্রীতিপ্রদ বিষয়ে দেখা গেল, প্রীতিপ্রদ বা অন্যান্য মানসিক ঘটনার কারণও অনুরূপ হতে পারে।

এখন উক্ত কারণ থেকে চক্ষু ইত্যাদি ইন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত আরেকটি সংযোজক ইন্দ্রিয়কে স্বীকার করে নেবার আবশ্যকতা দেখা দেয়। যাকে আমরা মন বলি। এর উপরে আবার আত্মার প্রয়োজন কী? কেউ কেউ বলেন যে পুরোনো অভিজ্ঞতাকে স্মৃতিরূপে ধরে রাখার জন্য, কারণ মন এক ক্ষণিক বস্তু (যদিও এ কথা তাঁরা বলতে পারেন না কারণ কোনো কোনো মতে মন ক্ষণিক বস্তু নয়), তবে আমরা বলব মন ক্ষণিক, কিন্তু পরক্ষণের মনের কারণও সে। বংশের ধারা অনুসারে যে ভাবে বাবা মায়ের অনেক কিছু পুত্র পৌত্রদের মধ্যে দেখা যায়, সে ভাবেই পূর্বমন তার অনুভব, তার অভিজ্ঞতাকে, সংস্কারকে উত্তরাধিকারসূত্রে পরবর্তী মনকে দিয়ে যায়, আর তারই ফল স্মৃতি। বস্তুত সংস্কারের ছাপ তাৎক্ষণিক বস্তুর উপরেই পড়তে পারে। আত্মাকে যদি নিত্য কুটস্থ মনে করা যায়, তাহলে সে তো অনন্তকাল ধরে একই অবস্থায় বিদ্যমান থাকবে। তাহলে সর্বদা একই অবস্থায় বিদ্যমান থাকা আত্মায় পূর্ব অনুভবের ছাপ পড়বে কী ভাবে? আর যদি পড়ে, তাহলে ছাপ পড়ামাত্রই তার রূপ পরিবর্তিত হয়ে যাবে। আত্মা তো কোনো জড় পদার্থ নয় যে তার বাহ্য রূপেরই পরিবর্তন ঘটবে। যেহেতু আত্মা চেতনময়, সেজন্য ইন্দ্রিয়জনিত জ্ঞান তার মধ্যে সঞ্চারিত হবে, অতঃপর সে রাগ, দ্বেষ, মোহ ইত্যাদি নানা ভাবের সংমিশ্রণের এক অবস্থায় উপনীত হবে। তখন সে আর সেই আত্মা নেই, যা ছিল সংস্কারের ছাপ লাগার পূর্বে। তাহলে আত্মা নিত্য হয় কী করে? তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেওয়া যায় যে ছাপ লাগলেও নিত্য আত্মা অবিচল থাকে, তার কোনো পরিবর্তনই ঘটে না, তাহলে এহেন অবিচল, অচঞ্চল বস্তু থেকে তর্কি কিংবা মুক্তির আশা কী করে করা যেতে পারে?

যদি কেউ বলেন—কোনো নিত্য আত্মা নেই, তাহলে শরীর বিনষ্ট হবার পর, ভালোমন্দ কর্মের বিচার কী ভাবে হবে? এখানে প্রথমে এটা বুঝে নেওয়া প্রয়োজন যে বৌদ্ধরা বিচারকে কী ভাবে গ্রহণ করে। তারা এটা কখনওই স্বীকার করে না যে—আমরা যে সমস্ত ভালো অথবা মন্দ কাজ করি সেগুলির হিসাব রাখার জন্য ঈশ্বর আমাদের পেছনে কোনো দ্রুতলিপি লেখক নিযুক্ত করেছেন। আমরা যে সমস্ত ভালো কিংবা মন্দ কায়িক অথবা মানসিক কর্ম করি, সেই সমস্ত কর্মেরই উত্তম স্থল হল মন।

সেজন্য দ্বেষযুক্ত কাজ করতে হলে মনকেও দ্বেষযুক্ত হতে হয়, ক্রোধের কর্মের জন্য মনকে ক্রোধান্বিত হতে হয়। মনের এই গঠন, এই অবস্থা, ততক্ষণ পর্যন্ত বর্তমান থাকে যতক্ষণ না অন্য কোনো বিরোধী ভাব এর সঙ্গে লিপ্ত হয়ে পূর্বাবস্থাকে বিনষ্ট করে। মানুষ একদিনে হঠাৎ করে জ্বর হয়ে যায় না। অস্ত্রোপচারের সময় শল্যচিকিৎসককেও ধীরে ধীরে তার মনকে সংহত করতে হয়; হত্যাকারীর বেলায় এই অবস্থায় আসার প্রয়োজন হয় আরও অনেক বেশি। যখন কোনো অসহায় নিরপরাধ বালিকাকে লাঞ্চিত হতে দেখে দর্শকের মন প্রভাবিত হয়, (যদিও এটি একটি অবস্থা—করুণা) তখন স্বয়ং লাঞ্ছনাকারীকে কত বেশি মন শক্ত রাখতে হয়? সুতরাং আমরা যখন যে কাজই করি, সেই সময়ে আমাদের মনে তার প্রভাব পড়ে। মন যত শক্ত, কড়া হয়, তত তাতে সূক্ষ্ম মানসিক চিন্তন এবং বিকাশের যোগ্যতা কমে যেতে থাকে।

ভালো কিংবা মন্দ মনোভাব ধনাত্মক ও ঋণাত্মক। যদি ধনাত্মক অবস্থা বেশি পরিমাণে থাকে এবং ঋণাত্মক কম, তাহলে ধনাত্মক মনোভাবের বৃদ্ধি ঘটবে। এই অবস্থা মনের ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তনের মধ্যেই নিহিত থাকা এই হিসাবের যোগফল, দিন, সপ্তাহ কিংবা মাসান্তে তৈরি হয় না। প্রতি মুহূর্তে মানুষ কী? মানুষ তার অতীতের ভালোমন্দ অনুভবের সম্পূর্ণ যোগফল। প্রতি পরমুহূর্তের উৎপন্ন মন অনেক কিছু তার পূর্বমুহূর্তের মনের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করে? এই উত্তরাধিকারের ধারাবাহিকতা শৈশব থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত চলতে থাকে—এই উপলব্ধিতে কোনো দ্বিধা থাকা উচিত নয়। বুদ্ধের শিক্ষানুসারে এই ধারাবাহিকতা জন্মের আগে থেকে শুরু হয় এবং মৃত্যুর পরও তা থাকে। মৃত্যুর ঠিক পূর্বক্ষণে মন যখন শরীর ছেড়ে যেতে উদ্যত, সেই অবস্থাকে আমরা যদি একটি তপ্ত লৌহধারার সঙ্গে তুলনা করি, যা কোনো একটি নলের মাধ্যমে নিম্নাভিমুখে প্রবাহিত হয়ে চলেছে অবশেষে কোনো একটি উঁচু অবস্থানে গিয়ে সাময়িক বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। আবার ওই বাধক অবস্থানের আরেকদিকে আরেকটি নল সংযুক্ত আছে যার এক প্রান্ত অজস্র চৌম্বককণায় পরিপূর্ণ এবং যার সাহায্যে অপরূপ লৌহধারা বাধককে অতিক্রম করে এই দ্বিতীয় নলে প্রবাহিত হতে সক্ষম হয়। এ ভাবে যে ধারাপ্রবাহ চলতে থাকে জীবনপ্রবাহও অনুরূপ। আপন অভিজ্ঞতার আলোকে গড়ে ওঠা মনের উপমা—উপরোক্ত বর্ণনার মাধ্যমে সঠিক ভাবে দেওয়া যায়। মৃত্যুকালে চিত্তপ্রবাহ তার সমস্ত সংস্কাররাশি সমেত জীবনের প্রান্তদেশে এসে অবস্থান করতে থাকে, এই সংস্কাররাশি চুম্বককণার গুণাগুণ সংবলিত এবং নিকটতম শরীরে আকর্ষিত হয় এবং পুনরায় তার স্বাভাবিক প্রবাহ আরম্ভ হয়। এই প্রবাহ ততক্ষণ পর্যন্ত বর্তমান থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত নিবৃত্তির ক্ষয়ের ফলে প্রবাহের শৃঙ্খলা ভঙ্গ না হয়, জীব নির্বাণপ্রাপ্ত না হয়। এ ভাবেই কর্ম, কর্মফল এবং জন্মান্তর ঘটে।

জীবকে নিত্য স্বীকার করলে অনেক প্রশ্ন উঠতে পারে। তাকে যদি নিত্য বলে স্বীকার করা হয়, তাহলে তাকে ‘অমর’ বলাই যথেষ্ট হবে না, তার আর জন্মও হয় না, এ কথা মানতে হয়। তাছাড়া নিকটবর্তী অন্যান্য ধর্ম, যারা পুনর্জন্ম স্বীকার করে না, কিন্তু তারাও স্বীকার করে যে, জীব শুধুমাত্র কোটি কোটি বছর ধরে নয়, অনাদি

অনন্তকাল থেকে আজ পর্যন্ত নিশ্চেষ্ট অবস্থায় আছে। এই অবস্থায় পঞ্চাশ বা একশো বছর সময়ের জন্য কেউ কোনো পূর্ব কর্মফল ব্যতিরেকেই, এই পৃথিবীতে জন্মান্ন কিংবা চক্ষুমান, চিররূপণ অথবা স্বাস্থ্যবান, অল্পবুদ্ধি কিংবা প্রতিভাবান হয়ে জন্ম নেয়, আবার মৃত্যুর পর অনন্তকালের জন্য, নিজের কিছু সময়ের ভালোমন্দ কর্মের ফলে স্বর্গ কিংবা নরকে স্থান পায়। এ ধরনের নিত্যতা কি সাধারণ যুক্তিতেও স্বীকার্য মনে হয়? যারা পুনর্জন্ম মানেন আবার তার সঙ্গে সঙ্গে আত্মাকে নিত্য বলেও মানেন, তাঁদের এই মানাটা পরস্পর বিরোধী। যদি একটা নিত্য হয়, তাহলে সে কুটস্থও বটে, অর্থাৎ সর্বদাই এক রসে রসস্থ, এই একরস-সিদ্ধ বস্তুকে যদি পরিশুদ্ধ বলে স্বীকারও করা হয়, তাহলে তার সঙ্গে জন্ম-মৃত্যুর সংযোগ কোথায় কিংবা কি ভাবে? আর যদি পরিশুদ্ধ না হয়, অশুদ্ধ হয়— তাহলে অশুদ্ধ হওয়ার জন্য তার মুক্তিই বা কী ভাবে সম্ভব? নিত্য কুটস্থ হওয়ার ফলে তার উপর সংস্কারের কোনো প্রভাব পড়তে পারে না এ তত্ত্ব তো আগেই বলা হয়েছে। যদি প্রভাবের জন্য মনকে স্বীকার করা হয়, তাহলে আত্মাকে স্বীকার করার প্রয়োজনীয়তা কোথায় থাকে?

এখন প্রশ্ন হতে পারে আত্মা এবং মন একই বস্তু এবং ক্ষণিক তাহলে অনেকের মধ্যে—‘আমি আগে ছিলাম, আমি এখন আছি’—এরকম ঐক্যের ভান কেন? এর উত্তর একটাই, অনেকের মধ্যে এককের বৈশিষ্ট্য সারা বিশ্বের সার্বজনিক নিয়ম। এই পৃথিবীর যেকোনো বস্তুকে নেওয়া যাক, তা সহস্র সহস্র অণুর সমন্বয়ে গঠিত। এই সমন্বয়ের মধ্যেও একটি অণুর সঙ্গে আরেকটি অণুর ব্যবধান থাকে। এই ধর্ম লোহা, প্লাটিনাম, হীরা—প্রভৃতি সমস্ত কঠিন পদার্থেই বর্তমান। আমাদের দৃষ্টিশক্তি যদি তেমন পর্যায়ে সূক্ষ্ম এবং বিশ্লেষণী হত, তাহলে আমরা পদার্থের এই ধর্ম হয়তো দেখতেও পেতাম, যেমনটি ঘন অরণ্যের কাছে গেলে গাছগুলিকে আলাদা আলাদা করে দেখা যায়। এ ভাবে পৃথিবীর সমস্ত দৃশ্যমান পদার্থের মূলে বিচ্ছিন্নতার প্রবণতা থাকলেও ঐক্যের বাহ্য রূপটিই আমাদের সামনে দেখা দেয়। বহু খণ্ড খণ্ড অংশে প্রস্তুত শরীরকে আমরা একটি শরীর বলে মানি। বিভিন্ন ধরনের বৃক্ষলতায় পরিপূর্ণ অরণ্যকে আমরা একটি অরণ্য বলে মানি। অনেক নক্ষত্রের বিলিমিলিকে আমরা একটি নক্ষত্র বলি। একটা পার্থক্য অবশ্যই আছে। যেখানে শরীর, অরণ্য, নক্ষত্র সমস্ত কিছুই অংশী এবং অংশ একই মুহূর্তে এবং একই স্থানে অবস্থান করে, সেখান মন প্রতি ক্ষণে একটার পর একটা উৎপন্ন হয়েই চলে। এর জন্য সবচেয়ে ভালো উদাহরণ নেওয়া যেতে পারে বিমানের পাখা কিংবা সাধারণ বৈদ্যুতিক পাখা থেকে। বনেঠির (অলাত) আলো, (একটি লাঠির দুই মাথায় কাপড়ের গোলক বেঁধে তাতে আগুন জ্বালিয়ে ঘোরানো হয়। দূর থেকে ঘূর্ণায়মান লাঠিটিকে স্থির চক্রের মতো মনে হয়) কিংবা পাখার ব্লেড এত দ্রুত এবং সূক্ষ্ম লয়ে এক অবস্থান থেকে আরেক অবস্থানে যায়, যে আমরা ওই অবস্থান পরিবর্তনকে সাধারণ দৃষ্টিতে গ্রহণ করতেই পারি না। সময় এখানে এক স্বতন্ত্র সত্তায়, চক্রের আবর্তনের মধ্যে অবস্থান করে। এ ভাবেই একটি মন থেকে আরেকটি মনের, আবর্তন এত দ্রুতলয়ে ঘটে যে মধ্যকার ব্যবধানটিকে আমরা গ্রহণই করতে পারি না এবং

পাখার ব্রেডের মতো একেও এক বলে ভ্রম হয়। নদীর স্রোতকেও আপনি এক বলেন, কিন্তু ওই জল সহস্র সহস্র জলকণার সমাহার, আবার ওই জলকণা অগণিত অল্পজান (অস্মিজেন) এবং উদজান (হাইড্রোজেন) অণুর সমন্বয়ে গঠিত, আবার অণু অসংখ্য ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক ইলেকট্রন কণার সংযোগে (যাদের মধ্যেও আবর্তনের জন্য যথেষ্ট স্থান থাকে) গঠিত, এবং আরও সূক্ষ্মতম বিচারে সেগুলি কি নিউট্রনের সমন্বয়ে গঠিত নয়? বস্তুত বিশ্বের সমস্ত জায়গাতেই সমুদায়কে এক ধরা হয়। যখন আমরা এই শব্দটিকে সর্বজনীন ভাবে প্রয়োগ করি তখন ঋণিক মনের সন্ততিকে (?? প্রবাহ) সাধারণ দৃষ্টিতে আমরা এক ধরি, এতে বিশ্বয়ের কী আছে? বরং বিশ্বয়ের কথা যখন সারা বিশ্বে এক মনে করা বস্তুকে সমূহ অবস্থায় দেখেও প্রশ্ন তোলেন—সমূহ নিশ্চয়ই, তা সত্ত্বেও আত্মাকে কেন এক মনে হয়? প্রশ্ন উঠতে পারে—আত্মা যখন ঋণিক, পরক্ষণের দিকে কোনো প্রবাহ নেই, তবে তার পূর্ণতা বা পরিপূর্ণতা কী ভাবে? এর উত্তর, আমরা মনকে ঋণিক বলে মানলেও তার প্রবাহকে ঋণিক বলে মনে করি না। গঙ্গার জল তার আধার, দুই তীর, বালুরাশি, সবই সতত পরিবর্তিত হয়ে চলেছে, তা সত্ত্বেও তার প্রবাহ বজায় থাকছে, যাকে আমরা এক মনে করে গঙ্গা বলে থাকি। এই চিন্তাপ্রবাহের পরিপূর্ণতা আর পূর্ণতার প্রয়োজন। চিন্তাপ্রবাহ যত রাগ, দ্বেষ, মোহ ইত্যাদি মল থেকে মুক্ত হয়, ততই ওই ব্যক্তির কায়িক, বাচনিক, মানসিক কর্ম পরিপূর্ণ হতে থাকে, যার ফল ব্যক্তি মানুষ আপনপার সকলের উপকারে সমর্থ হয়। যখন তার মধ্যে পরিবার, গ্রাম, দেশ, ভূমণ্ডল, প্রাণী মাত্রেরই স্বার্থ নিজের স্বার্থ হয়ে ওঠে তখন সে তার পরিধি অতিক্রম করে এক অনন্তে পৌঁছে যায়। তখন অনন্ত পরিধিতে তার তৃষ্ণা বন্ধনহীন তৃষ্ণাতে পরিণত হয়, এবং সেই ব্যক্তির জন্য নির্বাণের পথ উন্মুক্ত হয়ে যায়, আর সে দুঃখের জাল থেকে মুক্ত হয়ে যায়। মুক্তি পর্যন্ত পৌঁছাতে হলে ব্যক্তিকে নিজ স্বার্থের সীমা অতিক্রম করে লোকহিতার্থে সমস্ত কিছু উৎসর্গ করতে হয়। আপনারা জাতকের সুন্দর সুন্দর কাহিনীতে এর উদাহরণ পাবেন, পূর্ণতার জন্য বোধিসত্ত্বকে সেখানে কত কিছু উৎসর্গ করতে হয়েছে। তৃষ্ণা ত্যাগ করার অর্থ দুঃখের পথ রোধ করা, কারণ পৃথিবীতে অধিকাংশ দুঃখের কারণই তো তৃষ্ণা এবং স্বার্থ।

এ ভাবেই মনের ঋণিক হওয়া সত্ত্বেও—চিন্তাপ্রবাহ ঋণিক নয়, সেজন্যই এর পূর্ণতা এবং পরিপূর্ণতা প্রয়োজন। বস্তুত আত্মাকে যদি নিত্য কুটস্থ আত্মা না মেনে, তার জায়গায় ঋণে ঋণে উৎপন্ন হওয়া চিন্তাপ্রবাহ বলে মেনে নেওয়া যায়, তাহলে কোনো বিশেষ শব্দ ব্যবহারের প্রতি আমাদের কোনো আসক্তি নেই। যেহেতু আত্ম শব্দ নিত্য চৈতন্য বস্তুর প্রতিই প্রযুক্ত হয়, সেজন্যই বুদ্ধ অনাত্ম শব্দের ব্যবহার করেছেন।

কোনো গ্রন্থকে স্বতঃ প্রমাণ হিসাবে স্বীকার না করা

স্বতঃ প্রমাণ হবার দাবি একমাত্র একটি গ্রন্থই করে না। সমস্ত ধর্মই নিজ নিজ ধর্মগ্রন্থকে স্বতঃ প্রমাণ বলে মানে এবং অপরকেও মানাবার চেষ্টা করে। ব্রাহ্মণরা বেদকে স্বতঃ প্রমাণ হিসাবে মানে। যার অনেক বক্তব্য অন্য ধর্মের বক্তব্যের এবং বিজ্ঞানের প্রয়োগ

দ্বারা প্রমাণিত তত্ত্বের বিরোধী। তারপরেও এরকম কোনো গ্রন্থকে স্বতঃ প্রমাণ বলে কী ভাবে মানা যায়? যদি বলা হয়, বেদ বিজ্ঞানসম্মত প্রয়োগ-সিদ্ধান্তের বিরোধী নয়, তাহলে প্রশ্ন উঠবে—এটাই বা কী ভাবে জানা গেল? তার প্রমাণের জন্য শেষ পর্যন্ত বুদ্ধির আশ্রয়ই নিতে হবে। এর দ্বারা এটাই কি প্রমাণিত হয় না যে বেদের প্রামাণিকতাও একান্ত ভাবেই বুদ্ধিনির্ভর? তাহলে তো বেদের চেয়ে বুদ্ধিই স্বতঃ প্রমাণ হিসাবে গৃহীত হবার দাবি করতে পারে। যে কথা এখানে বেদ সম্বন্ধে বলা হল, সে কথাই বাইবেল, এঙ্গেল, কোরান ইত্যাদি স্বতঃ প্রমাণ হিসাবে স্বীকৃত গ্রন্থ সম্বন্ধে প্রযোজ্য। বস্তুত যখন ঈশ্বরই নেই, তখন ঈশ্বরের গ্রন্থ কোথা থেকে আসবে?

গ্রন্থকে স্বতঃ প্রমাণ মানার জন্য যুগে যুগে পৃথিবী জুড়ে কত না অত্যাচার সংঘটিত হয়েছে। বাইবেলকে স্বতঃ প্রমাণ না মানলে গ্যালিলিওর ওই দুর্গতি হত না। আরও অনেক বৈজ্ঞানিক চেতনাসম্পন্ন মানুষকে প্রাণ বিসর্জন দিতে হত না, যদি না বাইবেল স্বতঃ প্রমাণের দাবি নিয়ে উপস্থিত হত। যখন তত্ত্বজ্ঞানীদের সহস্রাব্দীর চিন্তার ফল গ্রন্থরূপে আলেকজান্দ্রিয়ার পুস্তকাগারে সুরক্ষিত ছিল। সেই গ্রন্থাগার সহ গোটা নগরীকেই জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়া হত না, যদি না মুসলিম বিজেতারা কোরানকে স্বতঃ প্রমাণ হিসাবে মানত। কোনো গ্রন্থকে স্বতঃ প্রমাণ মানার অর্থই হল পরমত অসহিষ্ণুতা। এই গ্রন্থ-মান্যতা সারা পৃথিবী জুড়ে হাজার হাজার বছর ধরে মনুষ্য জাতিকে, ধর্মাত্মতা, অন্ধবিশ্বাস আর মানসিক দাসত্বের গাঢ় অন্ধকারে শুধু ফেলেই রাখেনি, মানুষের সমাজজ্ঞানের উন্মেষের পক্ষেও বাধার প্রাচীর খাড়া করেছে যার ফলস্বরূপ পৃথিবী বারবার রক্তে রঞ্জিত হয়েছে। খ্রিস্টানদের তথাকথিত ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ আদতে কী ছিল? কারণ ছিল, বাইবেল না কোরান স্বতঃ প্রমাণ হিসাবে কে মান্যতা পাবে।

কোনো গ্রন্থকে স্বতঃ প্রমাণ মানার অর্থ, গ্রন্থে বর্ণিত বিষয় সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন তোলার অধিকার না থাকা এবং জিজ্ঞাসার অগ্রগতি রোধ করা। জিজ্ঞাসাই বিশ্বে বড় বড় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সৃষ্টিকর্তা। যদি গ্যালিলিও বাইবেলের মত অনুযায়ী পৃথিবীকে গোল না বলে চ্যাপটা বলে মেনে নিতেন, তাহলে মনুষ্য সমাজকে আরও কতকাল না জানি ওই ভ্রান্ত ধারণা বহন করে চলতে হত। যদি কোপারনিকাস বাইবেলের বর্ণনানুযায়ী সূর্য সম্বন্ধীয় তত্ত্ব মেনে নিতেন, তাহলে পৃথিবী কর্তৃক সূর্য প্রদক্ষিণের আর্হিক এবং বার্ষিক গতির আবিষ্কার কী ভাবে হত? বস্তুত গ্রন্থকে স্বতঃ প্রমাণ হিসাবে মানলে নিউটনের 'মাধ্যাকর্ষণ শক্তির' খোঁজও পাওয়া যেত না এবং আইনস্টাইনও তাঁর উন্নত পর্যায়ে সাপেক্ষতাবাদের মহান সিদ্ধান্তের আবিষ্কারে সমর্থ হতেন না। প্রকৃতপক্ষে বিশ্বে জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্পকলা ইত্যাদির যে প্রগতি ঘটেছে, যার ফলে মানব সভ্যতার অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে, তার সবটাই ঘটেছে কোনো গ্রন্থকে স্বতঃ প্রমাণ হিসাবে না মেনে। ব্যবহারিক জীবনে কোন ব্যক্তি ধর্মগ্রন্থের প্রামাণিকতা সর্বাংশে মেনে চলে? গ্রন্থগুলির সবকটিই তার নিজের কালের প্রতিবন্ধকতা, অন্ধবিশ্বাস আর অজ্ঞানতায় ভরা। ওগুলি তাদের কালের ধার্মিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক অবস্থার পরিপোষক।

হাজার হাজার বছরের ব্যবধানে ওই সমস্ত তত্ত্ব পচা-গলা লাশে পরিণত হয়েছে, তবুও কেউ কেউ ওই গলিত মৃতদেহকেই কণ্ঠলগ্ন করতে আগ্রহী। সেন্টপলের সময়ে মেয়েদের মাথায় ঘোমটা জাতীয় আচ্ছাদন দেবার রেওয়াজ ছিল, লোকে তার মধ্যে সুরুচির পরিচয় পেত। সেই প্রথাকে উদাহরণ হিসাবে খাড়া করে আজও ইউরোপে মেয়েদের গির্জা কিংবা আদালতে শপথ নেবার সময় বাধ্যতামূলক ভাবে মাথায় টুপি পরতে হয়, অথচ বর্তমানে দৈনন্দিন জীবনে আর কোনো ক্ষেত্রে এর প্রয়োজনীয়তা বিন্দুমাত্র অনুভূত হয় না।

গ্রন্থকে স্বতঃ প্রমাণ মানলে, তার স্রষ্টাকে সর্বজ্ঞ বলে মানতে হয়। এবং তাও সমস্ত দেশ, কাল ও বস্তু সম্বন্ধে। যদি কোনো সর্বজ্ঞ আমাদের জন্মের হাজার বছর আগেই আমাদের দ্বারা কৃত ভালোমন্দ সমস্ত কর্ম সম্বন্ধেই ওয়াকিবহাল ছিলেন, তাহলে তো বলতে হয় আমরা সেই সমস্ত কর্ম করতে বাধ্য, অন্যথায় সেই সর্বজ্ঞের সর্বজ্ঞতা মিথ্যা হয়ে যাবে। তাহলে মানুষ কি প্রকৃতপক্ষে এরকম সর্বজ্ঞের হাতের কাঠের পুতুল মাত্র নয়? কাঠের পুতুলের কি কোনো অধিকার থাকে যাতে সে বাছবিচার করতে পারে কোনটা ভালো আর কোনটা মন্দ। তাহলে এরকম ধর্ম, তার গ্রন্থ এবং সেখানে বর্ণিত জ্ঞানের কী প্রয়োজন?

পরিশুদ্ধ ও মুক্ত হবার কর্মে মানুষের স্বাভাবিক অত্যন্ত জরুরি। কর্মের স্বাধীনতার জন্য বুদ্ধির স্বাধীনতার প্রয়োজন। বুদ্ধির স্বাধীনতার জন্য কোনো গ্রন্থের অধীনতাপাশে আবদ্ধ থাকাটা অপ্রয়োজনীয়। বস্তুত কোনো গ্রন্থের প্রামাণিকতা নির্ধারিত হয় বুদ্ধির দ্বারা, বুদ্ধির প্রামাণিকতা নির্ধারণের জন্য কোনো গ্রন্থেরই কোনো ভূমিকা নেই।

উপরোক্ত তিনটি অস্বীকারাত্মক তত্ত্ব, যা বৌদ্ধধর্ম মেনে চলে।

জীবনপ্রবাহ এই শরীরে আগে এবং পরে—এ তত্ত্ব মানা

শিশুর জন্মের সঙ্গে সঙ্গে তার জীবন আরম্ভ হয়। শিশু কী? শরীর এবং মনের সমুদায়। শরীর কোনো একক বস্তু নয়, বস্তুত প্রতি ক্ষণে উৎপন্ন অসংখ্য অণু সমুদায়। আবার এই অণুও ক্ষণ পরিবর্তনশীল, এবং তার শূন্যস্থানে সদৃশ অণু উৎপন্ন হয়ে চলে। এভাবে প্রতি মুহূর্তে শরীরে পরিবর্তন সংঘটিত হয়ে চলেছে। কয়েক বছর পর বস্তুত সেই শরীরও আর থাকে না, কিন্তু পরিবর্তন সংঘটিত হয়। সদৃশ অণুর সাহায্যে, এজন্যই আমরা বলি—এটি সেই শরীর। যে কথা শরীর সম্বন্ধে বলা হল—তা মন সম্বন্ধেও প্রযোজ্য, পার্থক্য শুধু এই যে মন সূক্ষ্ম বস্তু তার পরিবর্তনও সূক্ষ্ম, এবং পূর্বাপর রূপের ভেদও সূক্ষ্ম, সেজন্য সেই ভেদকে বোঝা কিছু কঠিন। আত্মা এবং মন একই বস্তু, আর আত্মা ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তনশীল।

শরীর এবং মন (= আত্মা) দুই-ই পরিবর্তনশীল। কোনো এক বিশেষ ক্ষণের একটি বালকের জীবনকে ধরা যাক, দেখা যাবে সে তার পূর্বের জীবনাংশের প্রভাবে প্রভাবিত। ক'খ শেখা থেকে আরম্ভ করে মধ্যবর্তী শ্রেণিতে উন্নীত হওয়া তার পূর্ববর্তী অবস্থার পরিণাম। আমরা শৃঙ্খলের একটি কড়িকেও বাদ দিতে পারি না। ম্যাট্রিক পাস

না করে কি কেউ আই. এ. পাস করতে পারে? এ ভাবেই কার্য-কারণ শৃঙ্খলা জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত অটুট থাকে। প্রশ্ন হতে পারে, যে জীবন এত দীর্ঘ সময় পর্যন্ত কার্য-কারণ-সম্পর্কের উপরে নির্ভরশীল, যেখানে কোনো অবস্থাই আকস্মিক নয়, তাহলে জীবনের একেবারে প্রারম্ভে কার্য-কারণ সম্বন্ধীয় নিয়মকে অস্বীকার করে আমরা কি প্রকৃতপক্ষে জীবনকেই আকস্মিক বলছি না? আকস্মিকতা কোনো সিদ্ধান্ত নয়, কারণ সেখানে কার্যসম্বন্ধীয় নিয়মকেই অস্বীকার করতে হয়, অথচ যাকে ছাড়া কোনো তত্ত্বকেই সিদ্ধ করা যায় না। যদি কেউ বলে মাতাপিতার শারীরিক গঠন অনুযায়ীই পুত্রের শারীরিক গঠন হয়, তাদের মানসিকতার প্রতিফলনও পুত্রের মধ্যে দেখা যায়, তাহলে আমরা বলি যে এই তত্ত্ব আংশিক সঠিক হলেও সর্বাংশে সঠিক নয়। কারণ এটাই অনিবার্য হলে, অল্পবুদ্ধি মাতাপিতার সন্তান কোনোদিন প্রতিভাশালী হত না কিংবা প্রতিভাশালী পিতামাতার সন্তান কখনও অল্প বুদ্ধি নিয়ে জন্মাত না। অনেক সময় দেখা যায় পণ্ডিতদের ঘরে মুর্থ পুত্র জন্ম নিয়েছে। যদি আমরা জীবনপ্রবাহকে শরীরের আগে স্থান দিই, সে ক্ষেত্রে জটিল সমস্যার সহজ সমাধান পাওয়া যেতে পারে। তাহলে আমরা এ কথা বলতে পারি যে প্রতিটি পূর্বজীবন এক পরবর্তী জীবনকে নির্মাণ করে চলে। যেরকম খনি থেকে নিষ্কাশিত লৌহ খনিজ, উত্তাপে গলিয়ে প্রথমে কাঁচা লোহা, তারপর অনেকবার 'উষ্ণ-শীতল' প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাকে ইস্পাতে পরিণত করা হয়, এই তিনটি অবস্থার মূল কিন্তু লোহা। কিন্তু যেমন যেমন তাকে সংস্কার করা হচ্ছে আমরা তাকে তেমন তেমন রূপে পাচ্ছি। সংস্কারের তারতম্য অনুসারে লোহার গুণাগুণেও তারতম্য দেখা যাবে। প্রতিভাশালী বালকের বুদ্ধি, ইস্পাতের মতোই, তার আগেকার সুঅভ্যাসের দ্বারা সুসংস্কৃত। মানসিক অভ্যাস সর্বদাই স্মৃতিরূপে উপস্থিত থাকবে এমন কোনো বাধ্যতা নেই; তথাপি প্রয়োজনানুসারে ন্যূনতম সংস্কার সর্ব অবস্থাতেই প্রয়োজন। এই জন্যে কলেজ ছাড়ার পর কয়েক বছরের মধ্যে, পাঠ্যপুস্তকে পড়া বহু বিষয়, সূত্র মানুষ ভুলে যায় কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, তার অধ্যয়নের সমস্ত পরিশ্রমই ব্যর্থ হয়েছে। নতুন কলসিতে কিছুদিন রেখে তারপর বের করে নেওয়া ঘিয়ের মতো বিদ্যা-অধ্যয়ন-সংস্কার মনের মধ্যে গাঁথে থাকে, এটাই শিক্ষার ফল। হয়তো অনেক বছর হয়েছে কলেজ ছেড়েছে, হয়তো অনেক পড়া ভুলেও গেছে; কিন্তু তথাপি যেরকম মানুষের সংস্কৃতিবোধ তার পূর্বের শিক্ষাকে প্রমাণিত করে; সেরকম ভাবেই শৈশবেই আভাস দেওয়া প্রতিভাকে আমরা পূর্বাভাসের পরিণতি বলে মেনে নিতে পারি। বস্তুত বংশানুক্রমিতা আর পারিপার্শ্বিকতা মানসিক শক্তির যতটা অংশের কারণ নয়—আর সেই অংশের পরিমাণও যথেষ্ট (মেধাবিত্ত্ব-মন্দবুদ্ধিতা, ভদ্রতা-নৃশংসতা ইত্যাদি বহু গুণ বা দোষ যা পৈতৃক সূত্রে প্রাপ্ত নয়, মানুষের মধ্যে আকছার দেখা যায়) এবং তার কারণ পূর্ব জীবনপ্রবাহের মধ্যেই খুঁজতে হবে। একজন তরুণ অনেক তপস্যা ও অধ্যয়ন করে হয়তো প্রথম শ্রেণিতে এম. এ. পাস করল, সে সময় তার পরিশ্রমের পুরস্কার না নিয়েই তার জীবন সমাপ্ত হয়ে গেল; তার সমস্ত পরিশ্রম শরীরের সঙ্গেই বিনষ্ট হয়ে গেল এটা মানার চেয়ে কি শেষ নয় যে তাকে যদি এক প্রতিভাশালী শিশুর

জন্মের সঙ্গে জুড়ে দেখা যায়? অল্পশিক্ষিত মাতাপিতার ঘরে গণিতজ্ঞ, সংগীতজ্ঞ শিশু যথেষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। উক্ত ক্রমানুসারে বিচার করলে, আমরা বুঝতে পারি যে, আমাদের এই শরীরের জীবনপ্রবাহ এক সুদীর্ঘ জীবনপ্রবাহের ছোট একটি মধ্যবর্তী অংশ, যার পূর্বকালীন প্রবাহ চিরন্তন চলে আসছে, আর পরবর্তীকালীন প্রবাহও চিরকাল বজায় থাকবে। আমরা চিরকালই বলতে পারি কারণ অনন্তকাল বললে অনন্তকাল থেকে সঞ্চিত রাশিতে কিছু বছরের সঞ্চিত সংস্কার কোনো বিশেষ প্রভাব ফেলতে পারে না, যেমন নোনা জলের সমুদ্রে একখণ্ড মিছরি। জীবনে আমরা প্রভাবকে অনুভব করি, এবং ব্যক্তি ও সমাজকে উন্নত করার অভীলায় তখনই যত্নবান হতে পারি যদি জীবনের সংস্কৃতিকে অনন্তকালের প্রচেষ্টা মনে না করে এক পরিমিত কালের প্রচেষ্টা বলে মনে করি। বস্তুত অনন্তকাল এবং ক্ষণকাল উভয়েই ভিন্ন ভিন্ন মানসিক সংস্কৃতির প্রভেদকে আকস্মিক করে দেয়। জীবনপ্রবাহ এই শরীরের আগে থেকেই এসেছে এবং পরেও থাকবে কিন্তু এতদসত্ত্বেও এটা অনাদি এবং অনন্ত নয়। এর আরম্ভ তৃষ্ণা থাকে, স্বার্থপরতা থেকে, আর তৃষ্ণার নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

জীবনপ্রবাহকে এই শরীরের আগে এবং পরে; স্বীকার করে নিলে, নিতান্ত নিকর্মা ব্যক্তির কাছ থেকেও উন্নতির আশা করা যায়। কোনো উচ্চাদর্শের জন্য লোক, সমাজ কিংবা অন্য ব্যক্তির উৎকর্ষের জন্য, নিজের জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করতে প্রস্তুত এরকম ব্যক্তি পর্যাপ্ত সংখ্যায় পাওয়া যেতে পারে। তখনই মানুষ তার ভালোমন্দ কর্মের দায়িত্বকে পুরোপুরি অনুধাবন করে, অন্যের অপকার করা থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পারে। সমাজের মঙ্গলের জন্য ব্যক্তিকে আত্মবলিদানে প্রস্তুত থাকা এবং সমাজের অমঙ্গল করলে ব্যক্তির আত্মনিগ্রহ, এই দুটি বিষয় মানুষকে আরও উন্নততর অবস্থানে নিয়ে যাবার জন্য অনিবার্য ভাবে আবশ্যিক। লোকোন্নতি বস্তুতপক্ষে এই দুই বিষয়ে উপরেই নির্ভরশীল। এই শরীরকে আদিম এবং অন্তিম স্বীকার করে নিলে, ওই দুই বিষয়ে মানুষের মধ্যে অনুপ্রেরণা সঞ্চারকারী বস্তুর অত্যন্ত অভাব না হলেও, এতটা অভাব নিশ্চয়ই হবে, যার ফলে উন্নতির পথে বাধা আসতে পারে এবং ফলত পশ্চাদ্গামিতা আরম্ভ হয়ে যাবে।

বুদ্ধের শিক্ষা এবং দর্শন এই চার সিদ্ধান্তের অবলম্বনের উপরে দণ্ডায়মান। প্রথম তিনটি সিদ্ধান্ত বৌদ্ধধর্মকে অন্যান্য ধর্ম থেকে পৃথক করে। উপরোক্ত তিন সিদ্ধান্ত বস্তুবাদ ও বৌদ্ধধর্মে সম ভাবে বিরাজমান। কিন্তু চতুর্থ সিদ্ধান্ত অর্থাৎ জীবনপ্রবাহকে এই শরীর পর্যন্ত সীমিত না মানা, একে বস্তুবাদ থেকে পৃথক করে, এবং সেই সঙ্গে এই সিদ্ধান্তটি ব্যক্তির ভবিষ্যৎকে আশাপ্রদ রূপে দেখাবার এক সুন্দর প্রচেষ্টা, প্রকৃতপক্ষে যা না থাকলে কোনো আদর্শবাদই কার্যকরী রূপ পেতে পারে না।

চারটি সিদ্ধান্তের প্রথম তিনটি, তিনটি বড় পরতন্ত্রতা থেকে মানুষকে মুক্ত করে। চতুর্থটি আশাপ্রদ ভবিষ্যতের চিত্র আঁকে, এবং শীল, সদাচারের ভিত প্রতিষ্ঠা করে। এই চারটি সিদ্ধান্ত যেখানে সম্মিলিত হয় সেটাই বৌদ্ধধর্ম।

গৌতম বুদ্ধ

(৫৬৩-৪৮৩ খ্রিঃ পূঃ)

দুই শতাব্দীর ভারতীয় দার্শনিকদের মস্তিষ্কের জোরদার প্রয়াসের অন্তিম ফল হিসাবে আমরা বৌদ্ধ দর্শন—ফণিক অনাত্মবাদ রূপে পেয়েছি। পরবর্তী আলোচনাকালে আমরা দেখব যে এই নির্ণয়, ভারতীয় দর্শনের প্রবহমান ধারার মধ্যে বহুদিন পর্যন্ত নতুন গবেষণা, নতুন আলোচনার ধারা সৃষ্টি করেছিল। নাগার্জুন, অসঙ্গ, বসুবন্ধু, দিঙ্নাগ, ধর্মকীর্তি—ভারতের এইসব অতুলনীয় প্রতিভার অধিকারী দার্শনিকগণ এই ধারার মধ্যেই জন্মগ্রহণ করেছেন—পরবর্তীকালের অন্যান্য দার্শনিকদের এঁদেরই উচ্ছিষ্টভোজী বলা চলে।

জীবনী

সিদ্ধার্থ গৌতমের জন্ম হয়েছিল খ্রিঃ পূঃ ৫৬৩ সালের কাছাকাছি কোনো সময়ে। তাঁর পিতা শুদ্ধোদনকে শাক্যদের রাজা বলা হয়। কিন্তু আমরা জানি যে শুদ্ধোদনের সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রিয় (চুল্লবগ্গ বিনয়পিটক, ৭), ('বুদ্ধচর্যা', পৃ. ৬০) এবং দণ্ডপাণিকেও শাক্যদের রাজা বলা হয়েছে। (মল্লিমনিকায় অট্টকথা, ১।২।৮)। এ থেকে এই ধারণাই হয় যে শাক্যদের প্রজাতন্ত্রের গণসংস্থার (সেনেট অথবা পার্লামেন্ট) সদস্যদের লিচ্ছবি গণরাজ্যের মতো রাজা বলা হত। সিদ্ধার্থের মাতা মায়াদেবী তাঁর পিত্রালয়ে যাচ্ছিলেন, সেই সময় কপিলাবন্ধু থেকে কয়েক মাইল দূরে লুম্বিনী নামে এক শালবনে (বর্তমানের রুম্মিনদেই, নেপাল-তরাই, নৌতনবা স্টেশন থেকে আট মাইল পশ্চিমে) সিদ্ধার্থের জন্ম হয়। সিদ্ধার্থের জন্মের ৩১৮ বছর পর, আপন রাজ্যভিষেকের বিংশতিতম বছরে সম্রাট অশোক এই জায়গায় এক প্রস্তরস্তম্ভ স্থাপন করেছিলেন, যা আজও বর্তমান। সিদ্ধার্থের জন্মের এক সপ্তাহের মধ্যে তাঁর মায়ের মৃত্যু হয়। এরপর তাঁর লালনপালনের ভার গিয়ে পড়ে তাঁর মাসি তথা বিমাতা প্রজাপতি গৌতমীর উপরে। তরুণ সিদ্ধার্থকে সাংসারিক বিষয়ে বিশেষ উদাসীন এবং সতত চিন্তামগ্ন দেখে শুদ্ধোদন ভীত হয়ে পড়েন, তাঁর ভাবনা হয়, যদি সাধুসন্ন্যাসীদের প্ররোচনায় সিদ্ধার্থ গৃহত্যাগ করেন; সেজন্য তিনি প্রতিবেশী কোলীয় গণরাজ্যের (প্রজাতন্ত্র) সুন্দরী কন্যা জ্ঞা কপিলায়নীর (অথবা যশোধরা) সঙ্গে সিদ্ধার্থের বিবাহ দেন। এর ফলে সিদ্ধার্থ কিছুদিনের জন্য সংসারে থেকে গেলেন। ইতিমধ্যে তাঁর একটি পুত্রসন্তান জন্মে। তিনি পুত্রকে তাঁর অষ্টম লক্ষ্যপথের রাহু মনে করে তাঁর নাম রাখেন রাহুল। বৃদ্ধ, পীড়িত,

মৃত এবং প্রব্রজিত (সন্ন্যাসী) এই চার দৃশ্য দেখে সংসার সম্বন্ধে তাঁর অনীহা আরও তীব্র হয়ে ওঠে, এবং এক নিশীথ রাত্রিতে তিনি সংসার ত্যাগ করেন। এ বিষয়ে বুদ্ধ স্বয়ং চুনারে (সুংসুমারগিরি) বৎসরাজ উদয়নের পুত্র বোধরাজ কুমারকে বলেছিলেন (মজ্জিমনিকায়, ২। ৪। ৫, অনুঃ পৃ. ৩৪৫)—‘রাজকুমার বুদ্ধ হওয়ার পূর্বে... আমার মনে হত—‘সুখে সুখপ্রাপ্তি হয় না। কিন্তু দুঃখে দুঃখপ্রাপ্তি হয়।’ সেজন্য... আমি তরুণ বয়সে, মাথা ভর্তি কালো কেশ নিয়ে, সুন্দর যৌবনে, প্রথমে মাতাপিতাকে অশ্রুভারাক্রান্ত রেখে...প্রব্রজিত হই।... (প্রথমে) আলাল কালাম (এর নিকটে)...যাই।’

আলাল কালাম কিছু যোগাভ্যাসের বিধি বর্ণনা করেন, কিন্তু তাতে সিদ্ধার্থের জিজ্ঞাসার পরিতৃপ্তি হয়নি। সেখান থেকে উদ্দক রামপুত্রের (= উদ্দক রামপুত্র) কাছে যান, এবং সেখানেও কিছু যোগবিদ্যা শেখেন, কিন্তু তাতে তাঁর সন্তুষ্টি হয়নি। অতঃপর তিনি বোধগয়ার কাছে প্রায় ছয় বছর পর্যন্ত যোগ এবং অনশনের কঠোর তপস্যা করেন। এই তপস্যার বিষয়ে তিনি নিজে বলেছেন (মজ্জিমনিকায়, অনুঃ পৃ. ৩৪৮)—‘আমার শরীর (দুর্বলতার) চরম সীমায় পৌঁছে গিয়েছিল।...আশীতিক (আশীতিপর) বৃদ্ধের গ্রন্থির ন্যায় আমার গ্রন্থি স্ফীত হয়েছিল... অঙ্গপ্রত্যঙ্গও তদনুরূপ হয়েছিল।...আমার গুহ্যদেশ উদ্ভের পায়ে ন্যায় বক্র এবং ভিতরমুখী হয়েছিল।...আমার পৃষ্ঠদেশ উঁচুনিচু এবং কণ্টকসদৃশ হয়ে গিয়েছিল। শালকাঠের পুরাতন কড়ি বরগা যেমন আঁকাবাঁকা হয়, আমার অস্থিপঞ্জরের অবস্থাও তদনুরূপ হয়েছিল।...যেমন গভীর কূপের জলের মধ্যে নক্ষত্র প্রতিবিম্বিত হয়, আমার চক্ষু কোটরাগত হয়ে সেরকম অবস্থায় পৌঁছেছিল।...যেমন কাঁচা লাউ রোদ বায়ুতে কুঁকড়ে যায়, শুষ্ক হয়, আমার মাথার ত্বকেরও সেই দশা হয়েছিল।...যদি মলমূত্র ত্যাগের জন্য দণ্ডায়মান হতাম তাহলে তৎক্ষণাৎই ভূপতিত হতাম। যখন আমি আমার শরীরে হস্ত সঞ্চালন করতাম...তখন শরীর থেকে রোমরাজি বারে পড়ত।...লোকে বলত ‘শ্রমণ গৌতম কৃষ্ণবর্ণ’ কেউ বলত কৃষ্ণবর্ণ নয় শ্যামবর্ণ।’...কেউ কেউ আমাকে পিঙ্গল বর্ণের বলেও অভিহিত করত। আমার পরিশুদ্ধ গৌরবর্ণ (= পরিঅবদাত) ত্বকের স্বাভাবিক রং সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়েছিল।...

‘...কিন্তু...আমি এই তপস্যা দ্বারা...সেই চরম দর্শনকে পাইনি। (তখন মনে হল) বোধির (= জ্ঞান) জন্য কি অন্য কোনো পথ আছে?... তখন আমার মনে পড়ল...আমি আমার পিতার (শুদ্ধোদন) শাক্যের উদ্যানে জামগাছের শীতল ছায়ার নিচে বসে প্রথম ধ্যানপ্রাপ্ত হয়ে চিন্তা করেছিলাম, বোধহয় এইটিই বোধিমার্গ।...কিন্তু...এই প্রকারের কুশ শরীরে সেই (ধ্যান) সুখ পাওয়া সম্ভব নয়।...অতঃপর আমি স্থূল আহাৰ্য—অন্ন ইত্যাদি গ্রহণ করতে আরম্ভ করলাম।...সে সময় আমার সঙ্গে আরও পাঁচ জন ভিক্ষু থাকতেন।...যখন আমি স্থূল আহাৰ্য গ্রহণ করা আরম্ভ করলাম, তখন এই পাঁচ জন ভিক্ষু আমার সম্বন্ধে হতাশ হয়ে আমার সঙ্গ পরিত্যাগ করেন।’ (মজ্জিমনিকায়, ১। ৩। ৬; অনুঃ পৃ. ১০৫)

পরবর্তী পর্যায়ের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে বুদ্ধ অন্যত্র বলেছেন—‘আমি এক রমণীয় ভূখণ্ডে, বনভূমিতে এক নদী (নিরঞ্জনা) প্রবাহিত হতে দেখি। নদীর ঘাট ছিল শ্বেতশুভ্র

এবং রামণীয়। আমি ওই স্থানকেই ধ্যানের উপযুক্ত মনে করে উপবেশন করি। জন্মগ্রহণের কুপরিণাম জ্ঞাত হয়ে...আমি অনুপম নির্বাণের সন্ধান লাভ করি। আমার জ্ঞানদর্শনে (সাক্ষাৎকার) পরিণত হয়, আমার চিত্তের মুক্তি অচল হয়। এটাই আমার অস্তিম জন্ম...আর দ্বিতীয় জন্ম হবে না।’

সিদ্ধার্থের এই জ্ঞানদর্শন ছিল—দুঃখই দুঃখের কারণ (সমুদয়), দুঃখের নিরোধ (বিনাশ) আছে এবং দুঃখবিনাশের পথও আছে। ‘যে ধর্ম (বস্তু, ঘটনা) বর্তমান, তা সবই হেতু হইতে উৎপন্ন এবং সেই হেতুর বিনাশ আছে।’ মহাশ্রমণের এটাই ছিল অভিমত।

‘যে ধর্ম হেতুপ্রভবা হেতুং তেষাং তথাগত হাবদত্।

তেষাং চ যো নিরোধ এবংবামী মহাশ্রমণঃ।’

সিদ্ধার্থ ঊনত্রিশ বছর বয়সে (৫৩৪ খ্রিঃ পূঃ) গৃহত্যাগ করেছিলেন। ছয় বছর পর্যন্ত যোগ তপস্যা করার পর ধ্যান এবং চিন্তনের মাধ্যমে ছত্রিশ বছর বয়সে (৫২৮ খ্রিঃ পূঃ) বোধি (জ্ঞান) প্রাপ্ত হয়ে বুদ্ধ হন। অতঃপর পয়তাল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি তাঁর ধর্মের (দর্শন) উপদেশ প্রচার করে আশি বছর বয়সে (৪৮৩ খ্রিঃ পূঃ) কুশীনারা (বর্তমান কসয়া, গোরখপুর জেলা) নামক স্থানে নির্বাণপ্রাপ্ত হন।

সাধারণ বিচার

বুদ্ধ হওয়ার পর তিনি তাঁর জ্ঞানের উত্তরাধিকারী হিসাবে সেই পাঁচ জন ভিক্ষুকে মনোনীত করেন, যারা একদিন তাঁকে অনশন ত্যাগ করতে দেখে তাঁর সঙ্গ বর্জন করেছিলেন। অনেক সন্ধানের পর তাঁদের আশ্রম ঋষিপত্তন মৃগদাবতে (সারনাথ, বারাণসী) উপস্থিত হন। বুদ্ধের প্রথম উপদেশ ছিল একদা তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করা পাঁচ জন ভিক্ষুর প্রতি, যাতে তাঁদের আশঙ্কা দূর হয়। বুদ্ধ বললেন—

‘ভিক্ষুগণ? এই দুই অতিকে (চরমপন্থা) সেবন করা অনুচিত। (১)...কামসুখে লিপ্ত হওয়া,...(২) শারীরিক কৃচ্ছ্রসাধন করা।—এই দুই অতিকে ত্যাগ করে...(আমি) মধ্যমমার্গের সন্ধান পেয়েছি, যা আমাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করবে, শান্তি দান করবে। ...এই মধ্যমমার্গ সেই আর্য (শ্রেষ্ঠ) অষ্টাঙ্গিক (আটটি অঙ্গ সংবলিত) পথ, যেমন—সম্যক দৃষ্টি (দর্শন), সম্যক সংকল্প, সম্যক বচন, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক লস্তু, সম্যক স্মৃতি এবং সম্যক সমাধি...।’ (ধর্মচক্রপ্রবর্তন সূত্র—সংযুক্তনিকায় ৫৫।২।১; ‘বুদ্ধচর্যা’ পৃ ২৩)

চারটি আর্যসত্য

দুঃখ, দুঃখ-সমুদয় (হেতু), দুঃখের বিনাশ, দুঃখনিরোধগামী পথ, যার আলোচনা আমরা করেছি, তাকেই বুদ্ধ আর্যসত্য (শ্রেষ্ঠসত্য) বলে অভিহিত করেছেন।

ক. দুঃখ-সত্যের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বুদ্ধ বলেছেন—‘জন্মও দুঃখ, বার্ধক্যও দুঃখ, মৃত্যু...শোক, রোদন...মানসিক খিন্না, অশান্তি ইত্যাদি সকলই দুঃখ। সংক্ষেপে পাঁচটি উপাদান বলাই দুঃখ।’ (মহাশক্তিপট্টান সূত্র—দীঘনিকায়, ২।৯)

(পাঁচটি উপাদান স্বক)—রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার এবং বিজ্ঞান। এই পাঁচটি উপাদান স্বক।

(অ) রূপ—চারটি মহাভূত—পৃথিবী, জল, বায়ু, অগ্নি এই চারটি রূপ উপাদান স্বক।

(আ) বেদনা—আমরা বস্তু এবং তার বিচারের সংস্পর্শে আসার পর যা সুখ, দুঃখ, অথবা না-সুখ-দুঃখের রূপে অনুভূত হয়, তাহাই বেদনা।

(ই) সংজ্ঞা—বেদনার পর আমাদের মস্তিষ্কে আগে থেকেই অঙ্কিত সংস্কারের দ্বারা আমরা যা কিছু জানতে বা চিনতে পারি তাকেই সংজ্ঞা বলে।

(ঈ) সংস্কার—রূপের বেদনা এবং সংজ্ঞার যে সংস্কার মস্তিষ্কের উপরে পড়ে, এবং যার সাহায্যে আমরা জানতে পারি যে এটা ‘দেবদত্ত’ তার নামই সংস্কার।

(উ) বিজ্ঞান—চেতনা কিংবা মনকেই বিজ্ঞান বলে।

এই পাঁচটি স্বক যখন ব্যক্তির তৃষ্ণার বিষয় হয়ে নিকটে আসে, তখন তাকেই উপাদান স্বক বলে। বুদ্ধ এই পাঁচটি উপাদান স্বককে দুঃখ-রূপ বলেছেন।

খ. দুঃখ হেতু—দুঃখের হেতু কী? তৃষ্ণা—কাম (ভোগ)-তৃষ্ণা, ভব-তৃষ্ণা, বৈভব-তৃষ্ণা। ইন্দ্রিয়সুখের যতগুলি বিষয় বা তৃষ্ণা আছে, সেই বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কের, তার চিন্তাই তৃষ্ণার জন্ম দেয়। ‘কাম (= প্রিয়ভোগ)-এর জন্যই রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়। ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের সঙ্গে, গৃহপতি (= বৈশ্য) গৃহপতির সঙ্গে, মাতা ও পুত্রের সঙ্গে, পুত্র ও মাতার সঙ্গে, পিতা-পুত্র, পুত্র ও পিতার মধ্যে, ভাই ভাইয়ে, ভাই বোনে, মিত্র মিত্রের সঙ্গে বিরোধে লিপ্ত হয়। সকলেই পরস্পরের সঙ্গে কলহ-বিগ্রহ-বিবাদ করতে করতে একে অপরকে হত্ব দিয়ে, দণ্ড দিয়ে শাস্ত্র দিয়ে আক্রমণ করে। এর দ্বারা তারা মৃত্যুও বরণ করে, মরণ সমান দুঃখের সম্মুখীন হয়।’

গ. দুঃখ বিনাশ—সেই তৃষ্ণাকে অত্যন্ত নিরোধ, পরিত্যাগ, বিনাশকে দুঃখ নিরোধ বলে। প্রিয় বিষয়, এবং তদ্বিষয়ক বিচার-বিকল্প দ্বারা যখন তৃষ্ণা দূর হয়, তখনই তৃষ্ণার নিরোধ হয়।

তৃষ্ণার নাশ হলে উপাদানের (= বিষয় সংগ্রহ করা) নিরোধ হয়। উপাদানের নিরোধে ভব (= বিশ্ব) লোকের নিরোধ হয়। ভব নিরোধ থেকে জন্মের (= পুনর্জন্ম) নিরোধ হয়। জন্মের নিরোধে, জরা, মৃত্যু, শোক, রোদন, দুঃখ, মানসিক খিন্নতা, অশান্তি বিনষ্ট হয়। এ ভাবে দুঃখের নিরোধ হয়। এই দুঃখ নিরোধই বুদ্ধের সমগ্র দর্শনের কেন্দ্রবিন্দু।

ঘ. দুঃখ বিনাশের পথ—দুঃখ নিরোধের দিকে নিয়ে যাবার পথ কী?—আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, যাকে প্রথমই গুণতিতে আনা হয়। আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের আটটি বাক্য জ্ঞান (= প্রজ্ঞা), সদাচার (= শীল) এবং যোগ (= সমাধি) এই তিন ভাগে (স্বক) বিভক্ত করলে যা হয়—

(ক) জ্ঞান	{ সম্যক দৃষ্টি সম্যক সংকল্প
(খ) শীল	{ সম্যক বাক্য সম্যক কর্ম সম্যক জীবিকা
(গ) সমাধি	{ সম্যক প্রযত্ন সম্যক স্মৃতি সম্যক সমাধি

(ক) সম্যক জ্ঞান

(অ) সম্যক দৃষ্টি—কায়িক, বাচনিক, মানসিক, ভালোমন্দ কর্মের সঠিক জ্ঞানকেই সম্যক দৃষ্টি বলে। ভালোমন্দ কর্ম এই প্রকারের—

	কু (মন্দ) কর্ম	সু (ভালো) কর্ম
কায়িক	{ (১) হিংসা (২) চুরি (৩) যৌন ব্যভিচার	অহিংসা অ-চুরি অ-ব্যভিচার
বাচনিক	{ (৪) মিথ্যাভাষণ (৫) চুকলি (৬) কটুভাষণ (৭) বাজে বকা	অ-মিথ্যাভাষণ অ-চুকলি অ-কটুভাষণ অ-বাজে বকা
মানসিক	{ লোভ প্রতিহিংসা ভ্রান্ত ধারণা	অ-লোভ অ-প্রতিহিংসা অ-ভ্রান্ত ধারণা

দুঃখ, হেতু, নিরোধ, মার্গের সঠিক জ্ঞানই সম্যক দৃষ্টি (= দর্শন) বলা হয়।

(আ) সম্যক সংকল্প—রাগ-হিংসা-প্রতিহিংসা-রহিত সংকল্পকেই সম্যক সংকল্প বলে।

(খ) সম্যক আচার

(অ) সম্যক বচন—মিথ্যা, চুকলি, কটুভাষণ এবং বৃথাবাক্য রহিত সত্য ও প্রিয় ভাষণ।

(আ) সম্যক কর্ম—হিংসা-, চুরি-, ব্যভিচার-, রহিত কর্মই সম্যক কর্ম।

(ই) সম্যক জীবিকা—মিথ্যা জীবিকা পরিত্যাগ করে সত্য জীবিকার দ্বারা জীবনযাত্রা নির্বাহ করা। সেই সময়কালের শাসক এবং শোষক সমাজ দ্বারা

অনুমোদিত সমস্ত জীবিকার মধ্যে কেবলমাত্র প্রাণীহিংসা সম্বন্ধীয় নিয়ে উল্লিখিত জীবিকাকে বুদ্ধ মিথ্যা জীবিকা বলেছেন—(অঙ্গুত্তরনিকায়, ৫)
‘অন্ত্রব্যাবসা, প্রাণী ব্যাবসা, মাংস ব্যাবসা, মদ্য ব্যাবসা এবং বিষ ব্যাবসা।’

(গ) সম্যক সমাধি

(অ) সম্যক প্রযত্ন (= ব্যায়াম), ইন্দ্রিয় সংযম, কু-চিন্তা না করা এবং সু-চিন্তার ভাবনাকে উদ্দীপ্ত করা, উৎপন্ন সু-ভাবনাকে বজায় রাখার প্রয়াস—এগুলিই সম্যক প্রযত্ন।

(আ) সম্যক স্মৃতি—কায়া, বেদনা, চিত্ত এবং মনের ধর্মের সঠিক স্থিতি—তার মালিন্য, ক্ষণ বিধ্বংসী হওয়া—ইত্যাদি সম্ভাবনাকে সর্বদা স্মরণ রাখা।

(ই) সম্যক সমাধি—‘চিত্তের একাগ্রতার নামই সমাধি।’ (মজ্জিমনিকায়, ১।৫।৪) মনের বিক্ষিপ্ততা যে সমাধি দ্বারা দূর হয় তাকেই সম্যক সমাধি বলে। বুদ্ধের শিক্ষাকে অত্যন্ত সংক্ষেপে এক প্রাচীন গাথাতে এ ভাবেই বলা হয়েছে।

‘সমস্ত মন্দ কর্ম পরিহার করা এবং সংকর্ম সম্পাদনে ব্রতী হওয়া, আপন চিত্তের সংযম বজায় রাখা, এগুলিই বুদ্ধের শিক্ষা।’

বুদ্ধের শিক্ষার মুখ্য প্রয়োজন কী? এই বিষয়টিকে বুদ্ধ এ ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন—‘ভিক্ষুগণ! এই ব্রহ্মচর্য (ভিক্ষু জীবন) লাভ-সংকার-প্রশংসার জন্য নয়, শীল সদাচার প্রাপ্তির জন্যও নয়, সমাধি প্রাপ্তির জন্যও নয়, জ্ঞান (দর্শন) প্রাপ্তির জন্যও নয়। অটুট চিত্তমুক্তি যা নয়, তারই জন্য এই ব্রহ্মচর্য, এটাই সার বস্তু, এখানেই তার অন্ত।’ (মজ্জিমনিকায়, ১।৩।৯)

বুদ্ধের দার্শনিক বিচার সম্বন্ধীয় আলোচনায় প্রবেশ করার আগে তাঁর জীবনের বাকি অংশের সমাপ্তি সাধন করা প্রয়োজন।

সারনাথে বুদ্ধ তাঁর জীবনের প্রথম উপদেশ প্রদান করেন। সে বছরের বর্ষা ঋতু, বুদ্ধ সারনাথেই কাটান। বর্ষান্তে সারনাথ ত্যাগ করে যাবার প্রাক্কালে, বিগত চার মাসে তিনি যে ৬০ জন শিষ্যকে উপদেশাবলি দিয়েছিলেন, তাঁদের এ ভাবে সম্বোধিত করেন—‘ভিক্ষুগণ! বহুজনহিতায়, বহুজনসুখায়, মানুষের প্রতি করুণা প্রদর্শনের জন্য, দেব-মनुষ্যের প্রয়োজনে, হিতার্থে, সুখার্থে বিচরণ করো। একাকী ভ্রমণ করবে, কোনো সঙ্গী নেবে না।...অমিও...উরুবেলা...সেনানীগ্রামে...ধর্মোপদেশের জন্য যাত্রা করছি।’ (সংযুক্তনিকায়, ৪।১।৪)

এরপর বুদ্ধ চ্যাবল্লিষ বছর জীবিত ছিলেন। এই দীর্ঘ সময়ে বর্ষার তিন মাস কাল ব্যতিরেকে, বাকি সময় বুদ্ধ ভ্রমণে অতিবাহিত করতেন। যেখানে যেখানে আশ্রয় গ্রহণ করতেন, সেখানকার চারপাশের অধিবাসীদের ধর্ম এবং দর্শন সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন। (বুদ্ধের জীবন ও প্রধান উপদেশাবলিকে প্রাচীন সংগ্রহের ভিত্তিতে বর্তমান গ্রন্থকারের ‘বুদ্ধচর্যা’ গ্রন্থে সংকলিত করা হয়েছে)। বুদ্ধ বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির পর চ্যাবল্লিষটি বর্ষা ঋতু নিম্নে বর্ণিত স্থানগুলিতে অতিবাহিত করেছিলেন।

	স্থান	খ্রিঃ পূঃ
	(লুম্বিনী, জন্ম)	৫৬৩)
	(বোধগয়া, বুদ্ধত্ব)	৫২৮)
১.	ঋষিপতন (সারনাথ)	৫২৮
২-৪.	রাজগৃহ	৫২৭-২৫
৫.	বৈশালী	৫২৪
৬.	মংকুল পর্বত (বিহার)	৫২৩
৭.	(ত্রয়স্ত্রিংশ?)	৫২২
৮.	সুংসুমার গিরি (চুনার)	৫২১
৯.	কৌশাঘী (এলাহাবাদ)	৫২০
১০.	পারিলেয়ক (মির্জাপুর)	৫১৯
১১.	নালা (বিহার)	৫১৮
১২.	বৈরঞ্জা (কনৌজ, মথুরার মধ্যবর্তী অঞ্চল)	৫১৭
১৩.	চালিয় পর্বত (বিহার)	৫১৬
১৪.	শ্রাবস্তী (গোঙ্গা)	৫১৫
১৫.	কপিলাবস্তু	৫১৪
১৬.	আলবী (অরবল)	৫১৩
১৭.	রাজগৃহ	৫১২
১৮.	চালিয় পর্বত	৫১১
১৯.	চালিয় পর্বত	৫১০
২০.	রাজগৃহ	৫০৯
২১-৪৫.	শ্রাবস্তী	৫০৮-৪৮৪
৪৬.	বৈশালী (কুশীনারাতে মহাপরিনির্বাণ)	৪৮৩ ৪৮৩

তাঁর বিচরণ ক্ষেত্র অধুনা উত্তরপ্রদেশ ও বিহার রাজ্যের মধ্যেই সীমিত ছিল। এই অঞ্চলের বাইরে তিনি কখনও বিচরণ করেননি।

গণতন্ত্রবাদ

আমরা দেখেছি যে, যেখানে বুদ্ধ একদিকে অত্যন্ত ভোগাসক্ত জীবনযাপনের বিরোধিতা করেছেন, সেখানেই অন্যদিকে অপ্রয়োজনীয় কৃচ্ছ্রসাধন করে শরীরকে শুষ্ক করাকেও মূর্থতা মনে করতেন। কর্মকাণ্ড, ভক্তি ইত্যাদি অপেক্ষা জ্ঞান এবং বুদ্ধিবৃত্তির দিকেই তাঁর ঝোঁক ছিল বেশি। আমরা তাঁর দর্শনের বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করব। তাঁর বিশিষ্ট

চিন্তার কারণেই, তাঁর জীবদ্দশায় এবং নির্বাণের পরেও, তাঁর দর্শন বহুকাল ধরে প্রতিভাশালী ব্যক্তিদের আকর্ষিত করে রাখতে পেরেছিল। মগধের সারিপুত্র, মৌদগল্যায়ন, মহাকাশ্যপাই শুধুমাত্র নয়, সুদূর উজ্জয়িনীর রাজপুরোহিত মহাকাট্যায়নের মতো বিদ্বান ব্রাহ্মণও বুদ্ধের শিষ্যত্ব স্বীকার করেন; এবং তিনি ব্রাহ্মণদের ধর্ম ও স্বার্থ-বিরোধী বৌদ্ধধর্মের বিরুদ্ধে, ব্রাহ্মণদের তিজ্ঞতা প্রচারের অপপ্রয়াস—বিশেষত প্রারম্ভিক শতাব্দীতে রুখে দিয়েছিলেন। মগধের রাজা বিহিসার বুদ্ধের অনুগামী ছিলেন। কোশলরাজ প্রসেনজিতের তো রীতিমতো গর্ব ছিল, যে বুদ্ধও কোশল বংশীয় ক্ষত্রিয় আর তিনিও তাই। তিনি বুদ্ধের আরও ঘনিষ্ঠ হওয়ার জন্য শাক্য বংশের এক কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। শাক্য-মল্ল, লিচ্ছবি প্রজাতন্ত্রে তাঁর অনুগামীদের সংখ্যা ছিল বিশাল। বুদ্ধ জন্মেছিলেন এক গণরাজ্যে (শাক্য) আর তাঁর মৃত্যুও হয় এক গণরাজ্যে (মল্ল)। প্রজাতন্ত্রকে তিনি কী দৃষ্টিতে দেখতেন এই দুটি ঘটনাই তার খানিকটা ইঙ্গিত বহন করে। বিহিসারের পর তাঁর পুত্র অজাতশত্রু মগধের রাজা হন। বুদ্ধের সঙ্গে তাঁর প্রীতির সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও বুদ্ধ অজাতশত্রুর বিরোধী বৈশালীর লিচ্ছবিদের গণরাজ্যের বিশেষ প্রশংসা করেছেন, এবং কী করলে তাদের প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে অপরাজিত রাখতে পারবে, সেই বিষয়ে সাতটি পরামর্শ দেন। (মহাপরিনিব্বান সূত্র, বোধনিকায় ২।৩, 'বুদ্ধচর্যা' পৃ. ৫২০-২২)

(১) চিরকাল ঐক্যবদ্ধ হয়ে সামূহিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা; (২) (নির্ণয়ানুসারে) ঐক্যবদ্ধ ভাবে কর্তব্য করা; (৩) ব্যবস্থার (= নিয়ম এবং বিনয়) যথাবিধি পালন করা; (৪) বুদ্ধদের সম্মান ও সমাদর করা; (৫) স্ত্রীলোকের প্রতি শক্তি প্রদর্শন না করা; (৬) জাতীয় ধর্ম পালন করা; (৭) ধর্মচার্যদের সম্মান করা।

এই সাতটি বাক্যের মধ্যে সামূহিক নির্ণয়, সামূহিক কর্তব্যপালন, স্ত্রী স্বাতন্ত্র্য ইত্যাদি প্রগতির জন্য অনুকূল বিচার ছিল; বাকি বিষয়গুলির উপরে গুরুত্ব দেওয়া এটাই নির্দেশ করে যে বুদ্ধ তৎকালীন সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে বিশেষ হস্তক্ষেপ করতে চাননি। ব্যক্তির তৃষ্ণার ফল যে দুঃখ পরিণাম তাকে তিনি দেখেছিলেন। তৃষ্ণাই দুঃখের কারণ। দুঃখের বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন—

'চিরকাল তোমরা...মাতা-পিতা-পুত্র-কন্যার মৃত্যুযন্ত্রণা সহ্য করেছ...রোগভোগের বিপদ সহ্য করেছ, প্রিয়জনের বিয়োগে দুর্জনের সংসর্গে রোদন করতে করতে যত অশ্রুবিন্দু তুমি ব্যয় করেছ, তা চারটি সাগরের জলরাশির চেয়েও বেশি।' (সংযুক্তনিকায়, ১৪)

এখানে বুদ্ধ দুঃখ এবং দুঃখের কারণগুলিকে সমাজের মধ্যে না খুঁজে সেগুলিকে ব্যক্তির মধ্যে সন্ধান করেছেন। ভোগতৃষ্ণার জন্য, রাজা, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য তথা সমগ্র পৃথিবীকে কলহে লিপ্ত হতে, মরতে এবং মারতে দেখেছেন কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি তৃষ্ণাকে কেবলমাত্র ব্যক্তি জীবন থেকেই অপসারিত করার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর মতানুসারে, মনে করো কাঁটার হাত থেকে রক্ষার জন্য সারা পৃথিবীকে তো ঢাকা চলে না, তবে নিজের পদযুগলকে চর্ম দ্বারা আবৃত করে কাঁটার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া

যায়। তখনকার সময়, পরিবেশ সেরকম ছিল না, যে বুদ্ধের মতো একজন প্রয়োগবাদী দার্শনিক, সামাজিক কুফলগুলিকে সামাজিক চিকিৎসার দ্বারা দূর করার চেষ্টা করতে পারতেন। ব্যক্তিগত সম্পত্তির কুফল সন্থকে তিনি ওয়াকিবহাল ছিলেন, সেজন্যই তিনি যতটা সম্ভব তাঁর ভিক্ষু সংঘগুলিতে, ব্যক্তি সম্পদ উচ্ছেদ করে, ভোগ্যবস্তুতে পূর্ণ সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন।

দুঃখ-বিনাশ মার্গের ক্রটিসমূহ

বুদ্ধের দর্শন ঘোরতর ক্ষণিকবাদী, কোনো বস্তুকে ক্ষণেকের বেশি স্থায়ী স্বীকার করে না, কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গিকে তিনি সমাজের আর্থিক ব্যবস্থার উপরে প্রযুক্ত করতে চাননি। ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারী শাসক-শোষক সমাজের সঙ্গে এ ভাবে এক আপস সমঝোতা করে নেবার ফলে, তাঁর মতো একজন প্রতিভাশালী দার্শনিকের উপরে সমাজের উপরতলা থেকে নানাবিধ সম্মান বর্ষিত হওয়া স্বাভাবিক ছিল। পুরোহিতবর্গের মধ্য থেকে কূটদন্ত, শোণদণ্ডের মতো ধনী ক্ষমতাশালী ব্রাহ্মণেরা তাঁর অনুগামী হয়েছিলেন, বিভিন্ন রাজন্যবর্গ তাঁর আগমনের জন্য ব্যাকুল থাকতেন। তৎকালীন বণিক শ্রেষ্ঠীর দল এ বিষয়ে ছিল সবচেয়ে এগিয়ে, তারা বুদ্ধের সমাদর-সংস্কারের জন্য নিজেদের মুদ্রার থলি উজাড় করে দিত, যেমন আমরা আধুনিক ইতিহাসে দেখেছি ভারতীয় বণিকেরা গান্ধীর জন্য করেছে। শ্রাবস্তীর ধনকুবের সুদন্ত (অনাথপিণ্ডক) স্বর্ণমুদ্রা ছড়ানো এক বৃহৎ উদ্যান (জেতবন) ক্রয় করে বুদ্ধ এবং তাঁর শিষ্যদের বসবাস করার জন্য দেন। সেই নগরের আর-একজন শ্রেষ্ঠীকন্যা বিশাখা প্রচুর অর্থব্যয়ে দ্বিতীয় আর-একটি বিহার (মঠ) পূর্বারাম নির্মাণ করেন। দক্ষিণ এবং দক্ষিণ পশ্চিম ভারতের সঙ্গে সেকালের বাণিজ্যিক যোগাযোগের মহাকেন্দ্র কৌশাঘীর তিন বৃহৎ শ্রেষ্ঠী তো বিহার নির্মাণে নিজেদের মধ্যে প্রায় প্রতিযোগিতা গড়ে তুলেছিলেন। এটাই সত্য যে, বৌদ্ধধর্মের প্রসারে রাজন্যবর্গের চেয়েও শ্রেষ্ঠী বণিকদের ভূমিকা অনেক বেশি ছিল। যদি বুদ্ধ তৎকালীন আর্থিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যেতেন তাহলে নিশ্চয়ই এই সমস্ত সুযোগ সুবিধা তাঁর ধর্মের ভাগ্যে জুটত না।

দার্শনিক বিচার

'অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম' (অঙ্গুত্তরনিকায়, ৩।১।৩৪) এই এক সূত্রের মধ্যেই বুদ্ধের সমগ্র দর্শন প্রতিফলিত। এর মধ্যে দুঃখ সন্থকে আমরা আলোচনা করেছি।

(১) ক্ষণিকবাদ—বুদ্ধ তিন ভাগে এই তত্ত্বকে ভাগ করেছেন (১) স্কন্ধ;

(২) আয়তন; (৩) ধাতু।

স্কন্ধ পাঁচটি। রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান। রূপের মধ্যে পৃথিবীর আদি চার মহাভূত অন্তর্গত। বিজ্ঞান, চেতনা যা মনেরই নাম। সুখ-দুঃখের অনুভবই বেদনা। সংজ্ঞার অর্থ হুঁশ অথবা অভিজ্ঞান। সংস্কার মনের মধ্যে থেকে যাওয়া ছাপ বা বাসনার নাম। এ ভাবেই বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার—রূপ সম্পর্কে বিজ্ঞানের (মন) ভিন্ন ভিন্ন স্থিতি

আছে। (মহাবেদন সূত্র, মজ্জিমনিকায়, ১।৫।৩—‘সংজ্ঞা...বেদনা...বিজ্ঞান...এই তিন ধর্ম (পদার্থ পরস্পর মিলিত ভাবে আছে। বিচ্ছিন্ন করে এদের পার্থক্য বোঝানো যায় না) বুদ্ধ এই স্বাক্ষকে ‘অনিত্য সংস্কৃত (কৃত) = প্রতীত্য সমুৎপন্ন = ক্ষয়ধর্মী = ব্যয়ধর্মী = নিরোধ (বিনাশ) ধর্মী ধর্ম’ বলেছেন। (মহানিদান সূত্র) (দীঘনিকায়, ২।৭৫; ‘বুদ্ধচর্যা’, ১৩৩)

আয়তন বারোটি—ছয়টি ইন্দ্রিয় (চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় অর্থাৎ ত্বক এবং মন) এবং ছটি এর বিষয়—রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ এবং ধর্ম (বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার)।

ধাতু আঠারোটি—উপরোক্ত ছয় ইন্দ্রিয়, তার ছয় বিষয় এবং তাদের সঙ্গে সম্পর্কিত ছয় বিজ্ঞান (চক্ষু-বিজ্ঞান, শ্রোত্র-বিজ্ঞান, ঘ্রাণ-বিজ্ঞান, জিহ্বা-বিজ্ঞান, কায়-বিজ্ঞান এবং মন-বিজ্ঞান)।

বিশ্বের সমস্ত বস্তুকেই স্বাক্ষ, আয়তন এবং ধাতু এই তিনটি ভাগের কোনো একটি ভাগে অবশ্যই রাখা যায়। এদের নাম ও রূপেও বিভক্ত করা যায়, যেখানে নাম বিজ্ঞানের পর্যায়বাচী এবং এ সমস্ত কিছুই অনিত্য। (অঙ্গুত্তরনিকায়, ৩।১।৩৪)।

‘এ এক অটল নিয়ম...রূপ (মহাভূত), বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার; বিজ্ঞানের সমস্ত সংস্কার (কৃত বস্তুরাশি) অনিত্য।’

‘রূপ...বেদনা...সংজ্ঞা...সংস্কার...বিজ্ঞান (এই পাঁচ স্বাক্ষ) নিত্য, ধ্রুব, শাস্বত, অবিকারী নয়, এটাই বিশ্বে পণ্ডিতসম্মত চিন্তা, আমিও অনুরূপ বাক্যই বলি। এরকম বলার...বোঝানোর...পরও যে কিছু বুঝাতে বা দেখতে অনিচ্ছুক, সেই বালখিল্য মূর্খ...অন্ধ...চক্ষুহীন অজ্ঞানের জন্য আর কীই-বা করতে পারি।’ (সংযুক্তনিকায়, ১৬)

রূপের (ভৌতিক পদার্থ) ক্ষণিকতাকে সহজেই বোঝা যেতে পারে। বিজ্ঞান (= মন) তার চেয়েও ক্ষণভঙ্গুর। বুদ্ধ বলেছেন—‘ভিক্ষুগণ! এটা তবুও ভালো যে অজ্ঞান...(ব্যক্তি) এই চারটি মহাভূতের কায়াকেই আত্মা (= নিত্য তত্ত্ব) হিসাবে মেনে নেয়, কিন্তু চিন্তকে ওরকম মানা ঠিক নয়। তা কেন?...চারটি মহাভূতের সেই কায়াকে...দুই...তিন...চার...পাঁচ...ছয়...সাত বছর পর্যন্ত বিদ্যমান থাকতে দেখা যায়; কিন্তু যাকে ‘চিন্ত’ না ‘মন’ অথবা ‘বিজ্ঞান’ বলা হয়, তা দিনরাত্রির ব্যবধানে পৃথক রূপে উৎপন্ন হয় এবং একটির উৎপত্তিতে পূর্বেরটি বিনষ্ট হয়ে যাবে।

বুদ্ধের দর্শনে অনিত্যতা এক চিরন্তন সত্য যার কোনো ব্যতিক্রম স্বীকৃত নয়।

বুদ্ধের এই অনিত্যবাদও ‘দ্বিতীয়টিই উৎপন্ন হয় এবং দ্বিতীয়টিই বিনষ্ট হয়’ এই বক্তব্য অনুসারে কোনো একটি মৌলিক তত্ত্বের বাইরের পরিবর্তন, নিছক পরিবর্তন মাত্র নয়, বস্তুর একটির সম্পূর্ণ বিনাশ এবং আরেকটির ‘সম্পূর্ণ নতুন উৎপাদন।’—বুদ্ধ কার্য-কারণের নিরন্তর অথবা নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহকে অস্বীকার করেন।

(২) প্রতীত্য-সমুৎপাদ—যদিও বুদ্ধ কার্য-কারণকে অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ স্বীকার করেন না, তথাপি তিনি এটা স্বীকার করেন যে, ‘এটি ঘটলে ওইটি ঘটে।’ ‘অগ্নি সতি ইদং

ভবতি' (মজ্জিমনিকায়, ১।৪।৮; অনুবাদ পৃ. ১৫৫) (একর বিনাশের পর আরেকটির উৎপত্তি, এই নিয়মকেই বুদ্ধ প্রত্যয়-সমুৎপাদ নাম দিয়েছেন)। প্রতিটি উৎপন্নের একটি প্রত্যয় আছে। প্রত্যয় এবং হেতু (= কারণ) সমানার্থক শব্দ বলে মনে হয়, কিন্তু বুদ্ধ প্রত্যয় শব্দটিকে ভিন্নার্থে ব্যবহার করেছেন যা এ বিষয়ে তৎকালীন অন্যান্য দার্শনিক বিচারকদের মতামতের বিপরীত। 'প্রত্যয় থেকে উৎপন্ন' এর অর্থ, বিনাশ থেকে উৎপন্ন—অর্থাৎ একের অতীত হয়ে যাবার পর, বিনষ্ট হয়ে যাবার পর, দ্বিতীয়ের উৎপত্তি। বুদ্ধের প্রত্যয় এমন একটি হেতু; যা কোনো বস্তু বা ঘটনা উৎপন্ন হওয়ার আগের ক্ষণেই তাকে লুপ্ত হতে দেখা যায়। প্রতীত্য-সমুৎপাদ কার্য-কারণ নিয়মের অবিচ্ছিন্ন নয় বিচ্ছিন্ন প্রবাহ মাত্র (Discontinuous Continuity)। প্রতীত্য-সমুৎপাদের এই বিচ্ছিন্ন প্রবাহকে নিয়েই নাগার্জুন তাঁর শূন্যবাদ তত্ত্বকে বিকশিত করেছিলেন।

প্রতীত্য-সমুৎপাদ বুদ্ধের সমগ্র দর্শনের মূল ভিত্তি, তাঁর দর্শনকে বোঝার জন্য এটিই একমাত্র চাবিকাঠি। বুদ্ধের নিম্নলিখিত বক্তব্য থেকেও এই বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয় (মজ্জিমনিকায়, ১।৩।৮)। 'যারা প্রতীত্য-সমুৎপাদকে অনুধাবন করে, তারা ধর্ম (বৌদ্ধ দর্শন)-কেই অনুধাবন করে; যারা ধর্মকে অনুধাবন করে, তারা প্রতীত্য-সমুৎপাদকে অনুধাবন করে। পাঁচটি উপাদান ক্ষুদ্রই (রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান) প্রতীত্য-সমুৎপন্ন (= বিচ্ছিন্ন) প্রবাহের রীতিতে উৎপন্ন।'।

প্রতীত্য-সমুৎপাদের নিয়মকে ব্যক্তি মানবের উপরে আরোপ করে, বুদ্ধ এর বারোটি অঙ্গের (দ্বাদশাঙ্গ প্রতীত্য-সমুৎপাদ) কথা বলেছেন। প্রাচীন উপনিষদের দার্শনিকগণ তথা অন্যান্য আচার্যগণ নিত্য, ধ্রুব, অবিনাশী তত্ত্বকেই আত্মা বলেন। বুদ্ধের প্রতীত্য-সমুৎপাদের মধ্যে আত্মার জন্য কোনো অবকাশ নেই, সেজন্যই তিনি আত্মবাদকে মহা-অবিদ্যা বলেছেন। এই বিষয়টিকে তিনি তাঁর এক উপদেশের মধ্যে উত্তমরূপে ব্যাখ্যা করেছেন (মহাতত্ত্বা-সংখ্য সুত্ত, মজ্জিমনিকায়, ১।৪।৮, অনুঃ পৃ. ১৫১-৫৫)।—'সাতি কেবটপুত্র ভিক্ষুরও এক ভ্রান্ত ধারণা উৎপন্ন হয়েছিল—আমি ঈশ্বরের উপনিষদের ধর্মকে এত বিশদ ভাবে জানি যে দ্বিতীয় কেউ সেরকম জানে না, এবং সেই (এক) বিজ্ঞানই (=জীব) সংসরণ-সংধাবন (=আগমন নির্গমন) করে থাকে।'

বুদ্ধ এ কথা শুনেতে পেয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—

'সাতি! সত্যি কি তোমার মধ্যে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়েছে?'

'হ্যাঁ...দ্বিতীয় কিছু নয়, সেই বিজ্ঞানই আগমন-নির্গমন করে থাকে।'

'সাতি! সেই বিজ্ঞান কী?'

'ভগ্নে! বজ্রা যা অনুভব করে, যা এদিক ওদিকে (জন্ম নিয়ে) ভালোমন্দ কর্মের ফলকে অনুভব করে।'

'নিষ্কর্মা (মোঘপুরুষ = মূর্খ) আমি কাকে এরকম উপদেশ দিয়েছি তুমি শুনেছ? আমি তো মূর্খ? তাই বিজ্ঞানকে (= জীব) অনেক প্রকারের প্রতীত্য-সমুৎপাদ বলেছি—প্রত্যয় (= বিগত) না হলে বিজ্ঞানের প্রাদুর্ভাব হতে পারে না বলেছি। মূর্খ তুমি বিষয় ঠিকমতো অনুধাবন না করতে পেরে আমাকে দোষারোপ করছ।...'

তারপর ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বুদ্ধ বলেন—‘ভিক্ষুগণ! যে যে প্রত্যয় থেকে বিজ্ঞান (=জীব) চেতনা উৎপন্ন হয়, সেটাই তার সংজ্ঞা। চক্ষুর প্রয়োজনে যে বিজ্ঞান উৎপন্ন হয় সেই চক্ষু বিজ্ঞানই তার সংজ্ঞা হয়। এ ভাবেই স্রোত, ঘ্রাণ, রস, কাসা, মনোবিজ্ঞান সকলই সংজ্ঞা।...যেমন, যে যে নিমিত্ত (=প্রত্যয়) থেকে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়, সেই নিমিত্তগুলিই তার সংজ্ঞা,...কাষ্ঠ-অগ্নি...তৃণ-অগ্নি...তুষ-অগ্নি...’

‘...এই পঞ্চক্ক উৎপন্ন—এগুলিকে উত্তম প্রজ্ঞা দ্বারা দেখলে আত্মা উপস্থিতির সন্দেহ বিনষ্ট হয়ে যায় না কি?’

‘হ্যাঁ ভণ্ডে!’

‘ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চক্ক (=ভৌতিক তত্ত্ব এবং মন) উৎপন্ন’...এগুলি নিজস্ব আহারের সাহায্যে উৎপন্ন...আবার ‘তাদের আহারের নিরোধ হলেই সেগুলি নিরুদ্ধ হয়’—ইহা সঠিক ভাবে জ্ঞাত এবং সুদৃঢ় নয় কি?’

‘হ্যাঁ ভণ্ডে!’

‘ভিক্ষুগণ! তোমরা এই...পরিণুদ্ধ, সুদৃষ্ট বিচারেও আসক্ত হয়েও না, রমণ করো না। ‘আমার সম্পদ’—এইরূপ ধারণা করো না, তার প্রতি কোনো মমতা রেখো না। বরং ভিক্ষুগণ! আমার উপদেশকে ভেলা মনে করবে, যা একান্তই নদী পার হবার জন্য, কার্যসিদ্ধির পরও ধরে রাখার জন্য নয়।...’

সাতি কেবটপুণ্ডের মনে যেমন ‘আত্মা আছে’ এ ধরনের অবিদ্যা ছেয়ে ছিল, সেই অবিদ্যার কারণ বোঝাতে গিয়ে বুদ্ধ বলেছেন—‘সমস্ত আহারের নিদান (=কারণ) হল তৃষ্ণা...তার নিদান বেদনা...তার নিদান স্পর্শ...তার নিদান ছয় আয়তন (= পঞ্চ ইন্দ্রিয় এবং মন)...তার নিদান নাম এবং রূপ...তার নিদান বিজ্ঞান...তান নিদান সংস্কার...তার নিদান অবিদ্যা।’

অবিদ্যা অতঃপর আপন চক্রকে ১২ অঙ্গে ঘূর্ণায়মান রাখে, একেই দ্বাদশাঙ্গ প্রতীত্য-সমুৎপাদ বলা হয়—

১. অবিদ্যা



২. সংস্কার



৩. বিজ্ঞান



৪. নাম-রূপ



৫. ছয় আয়তন (= ইন্দ্রিয়সমূহ)



৬. স্পর্শ

১২১১১১১১ ১৫

(১১১ =) ১১১ ১৫

(১১১১১১-১১১১১১) ১১১ ১০৫

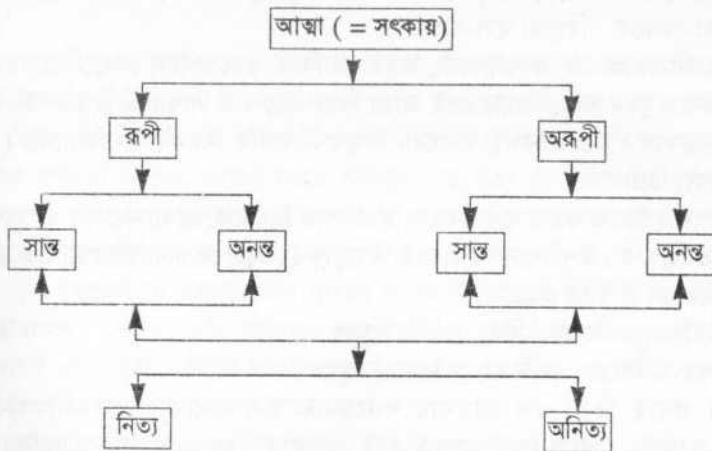
(১১১১১১১ ১১১১ ১১১১ =) ১১১১১১ ১৫

১১১১ ১৫

১১১১১ ১৬

তৃষ্ণার উৎপত্তি সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বুদ্ধ এ কথাই বলেছেন—‘ভিক্ষুগণ! তিনটি বিষয় একত্রিত হলেই গর্ভধারণ হয়।... (১) মাতাপিতার একত্রিত হওয়া; (২) মাতা ঋতুমতী হওয়া; (৩) এবং গর্ভব উপস্থিত হওয়া।...তখন মাতা গর্ভের...নয় অথবা দশ মাস পর জননী হয়। মাতা...পুত্রকে...আপন রক্ত...স্তন্য দ্বারা পালন করে। সেই শিশু কিষ্কিৎ বয়ঃপ্রাপ্ত হলে... নানাবিধ খেলনা সহযোগে খেলা করে।...আরও বড় হলে, পাঁচ ধরনের বিষয়-ভোগ—(রূপ, শব্দ, রস, গন্ধ, স্পর্শ)-কে সেবা করে।...সে (তার অনুকূলতা, প্রতিকূলতা ইত্যাদি অনুসারে) অনুরোধ (= রাগ), বিরোধে সুখময়, দুঃখময়, না-সুখময়-না-দুঃখময় বেদনাকে অনুভব করে, এবং তাকে অভিনন্দন করে।...এই প্রকার অভিনন্দন করায় তাহার নন্দী (= তৃষ্ণা) উৎপন্ন হয়।...বেদনার বিষয়ে যা সেই নন্দী (তৃষ্ণা), তাই তার উপাদান (= গ্রহণ করা এবং গ্রহণেচ্ছা)।’

(৩) অনাত্মবাদ— বুদ্ধের আগে উপনিষদের ঋষিদের আত্মার পক্ষে জোরদার প্রচার চালাতে আমরা দেখেছি। সেই সঙ্গে তৎকালে চার্বাকের মতো বস্তুবাদী দার্শনিকও ছিলেন। নিত্যবাদীদের আত্মসম্বন্ধীয় বিচারকে বুদ্ধ দুই ভাগে ভাগ করেছেন, যেখানে আত্মাকে রূপী (ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য মনে করা হয়) এবং দ্বিতীয়টিতে তাকে অ-রূপী মনে করা হয়। এরপর এই দুই বিচারধারায় বিশ্বাসীদের একাংশ আত্মাকে অনন্ত মনে করে, অন্য অংশ সান্ত (= পরিত অথবা অণু) মনে করে। (মহানিদান-সূত্র, দীঘনিকায় ২।১৫; ‘বুদ্ধচর্যা’, পৃ. ১৩১, ১৩২) অতঃপর এই দুই বিচারবাদের দল নিত্যবাদী এবং অনিত্যবাদী এই দুই ভাগে বিভক্ত।



আত্মাবাদের পরিবর্তে বুদ্ধ অন্য আরেকটি শব্দ ব্যবহার করেছেন— সৎকায় দৃষ্টি। সৎকায় শব্দের অর্থ, কায়াতে বিদ্যমান (= কায় থেকে ভিন্ন অজর অমর তত্ত্ব)। ইতিপূর্বে আমরা বর্ণনা করেছি যে সান্তি কেবটুপুন্ডের বিজ্ঞানের (= জীব) আগমন-নির্গমনের আলোচনাকালে বুদ্ধ তাকে কত না তিরস্কার করেছিলেন এবং নিজের বক্তব্য

সুদৃঢ় ভাবে পুনরায় ব্যাখ্যা করেছিলেন। সৎকায়ের (= আত্মা) ধারণাকে দর্শন বিষয়ে এক ভারী বন্ধন (= দৃষ্টি সংযোজন) মনে করতেন, এবং সত্য জ্ঞান প্রাপ্তির জন্য ওই ধারণার অবিলম্বে বিনাশ হওয়া আবশ্যক মনে করতেন। বুদ্ধের জ্ঞানী শিষ্যা, ভিক্ষুগী ধম্মদিন্না তাঁর এক উপদেশে পাঁচ উপাদান (গ্রহণ এবং গ্রহণেচ্ছার সঙ্গে যুক্ত)-স্বাক্ষকে সৎকায় বলেছেন, আর গমনাগমনের তৃষ্ণাতে সৎকায়-দৃষ্টি কারণ বলেছেন। (চুলবদল্ল-সূত্র, মঃ নিঃ ১। ৫। ৪; অনু, পৃ. ১৭৯)

বুদ্ধ অবিদ্যা এবং তৃষ্ণার দ্বারাই ব্যক্তি-মানুষের সমস্ত প্রবৃত্তিকে ব্যাখ্যা করেছেন। জার্মান দার্শনিক শোপেনহাওয়ার বুদ্ধের এই সর্বশক্তিমতী তৃষ্ণাকে ব্যাপক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন।

কিন্তু বুদ্ধ সৎকায়-দৃষ্টি অথবা আত্মবাদী ধারণাকে নৈসর্গিক মনে করতেন না। সেজন্যই তিনি বলেছেন (মহামালুংক্য-সূত্র, মঃ নিঃ ২। ২। ৪; অনুঃ পৃ. ২৫৪)—‘দুষ্কপোষ্য অবোধ শিশুর সৎকায় (আত্মবাদ) সম্বন্ধে কোনো ধারণাই থাকে না, তাহলে সৎকায় দৃষ্টি তার মধ্যে কী ভাবে উৎপন্ন হবে?’

এ বিষয়ে নেকড়েদের মধ্যে পালিতা পরে উদ্ধারীকৃত কমলা নামের বালিকার উদাহরণ নেওয়া যেতে পারে, যে চার বছরে মাত্র তিরিশটি শব্দ শিখেছিল। (দ্র. বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ)

উপনিষদের বহু পরিশ্রমে স্থাপিত আত্মা সর্বস্বীয় মহান সিদ্ধান্তগুলিকে প্রতীত্য-সমুৎপাদী বুদ্ধ কত না তুচ্ছ দৃষ্টিতে দেখতেন। (মজ্জিমনিকায়, ১। ১। ২, ‘অয়ং ভিক্ষবে! কেবলো পরিপুরো বাল-ধম্মো।’)

‘যে আমার আত্মার অনুভব কর্তা, অনুভবের বিষয় এবং এখানে সেখানে ভালোমন্দ কর্মের ফল অনুভব করে; আমার সেই আত্মা নিত্য = ধ্রুব = শাস্ত = অপরিবর্তনশীল এবং অনন্তকাল পর্যন্ত ওরকমই থাকবে। ভিক্ষুগণ! এগুলি নিছকই বালখিল্যদের (= মূর্খ বিশ্বাস) চিন্তাধারা।’

আপন দর্শনে অনাত্মার দ্বারা কোনো অভাবাত্মক বিষয়কে ব্যাখ্যা করবেন তা বুদ্ধের অভিপ্রেত ছিল না। উপনিষদে আত্মাকেই নিত্য, ধ্রুব, বস্তুসত্য মানা হয়েছে। বুদ্ধ তাঁর উত্তর দিয়েছেন এ ভাবে।—

(উপনিষদ)—আত্মা—নিত্য, ধ্রুব = বস্তুসং

(বুদ্ধ)—অনাত্মা—অ-নিত্য, অ-ধ্রুব = বস্তুসং।

সে জনাই তিনি এক জায়গায় বলছেন—‘রূপ অনাত্মা, বেদনা অনাত্মা, সংজ্ঞা...সংস্কার—বিজ্ঞান প্রভৃতি সমস্ত ধর্মই অনাত্মা।’ (চুলসল্লক-সূত্র মজ্জিমনিকায়, ১। ৪। ৫; অনুঃ পৃ. ১৩৮)।

বুদ্ধ প্রতীত্য-সমুৎপাদের যে মহান এবং ব্যাপক সিদ্ধান্তগুলিকে আবিষ্কার করেছিলেন, সে সময় সেগুলিকে যথাযথ ব্যাখ্যা করার উপযুক্ত ভাষাশৈলীও তৈরি হয়নি, সেজন্যই নিজের বিচারধারাকে সম্যকরূপে বোঝানোর জন্য তাঁকে প্রতীত্য-সমুৎপাদন, সৎকায় ইত্যাদি কত নতুন শব্দের প্রয়োগ করতে হয়েছিল। বহু প্রচলিত শব্দকে তিনি

নতুন অর্থে ব্যবহার করেছেন। এরকম উদাহরণে তিনি ধর্মকে তাঁর বিশেষ অর্থে ব্যবহার করেছেন, যা বর্তমানকালে বিজ্ঞানের ভাষায় বস্তুর পরিবর্তে প্রযুক্ত ঘটনা শব্দের পর্যায়বাচক। 'য়ে ধর্মা হেতু-প্রভবাঃ' (=যা ধর্ম তার সকলই হেতু থেকে উৎপন্ন)—এখানেও ধর্ম বিচ্ছিন্ন-প্রবাহযুক্ত বিশ্বের কণা-তরঙ্গের অবয়বকে ব্যাখ্যা করছে।

(৪) অ-বস্তুবাদ—বুদ্ধ আত্মবাদের বিশেষ বিরোধী ছিলেন; কিন্তু তা থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া উচিত হবে না যে তিনি বস্তু (জড়) বাদী ছিলেন। বুদ্ধের সময়কাল কোশল রাজ্যের সালবিকা নগরীতে লৌহিত্য নামে এক ব্রাহ্মণ সামন্ত বাস করতেন। ধর্ম বিষয়ে তাঁর অনেক ভ্রান্ত ধারণা ছিল। (দীঘনিকায়, ১। ১২; অনুঃ পৃ. ৮২)—'সংসারে এমন কোনো শ্রমণ (= সন্ন্যাসী) অথবা ব্রাহ্মণ নেই যে সঠিক ধর্মকে সম্যক অনুধাবন করে, অন্যকেও বোঝাতে সক্ষম হবে। প্রকৃতপক্ষে একে অপরের জন্য কী করবে? নতুন নতুন ধর্ম কী? ঠিক যেন এক পুরাতন বন্ধনকে ছিন্ন করে আরেক বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া। সেজন্যই আমি একে পাপ (= মন্দ) এবং লোভের বিষয় বলে মনে করি।'

বুদ্ধ তাঁর শীল-সমাধি-প্রজ্ঞা সম্বন্ধীয় উপদেশ দ্বারা তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন।

কোশল দেশেই অন্য আরেকজন সামন্ত—সেতব্যার স্বামী পায়াসী রাজ্য ছিলেন। তাঁর মত ছিল (দীঘনিকায়, ২। ১০; অনুঃ পৃ. ১৯৯) 'ইহলোকও নেই, পরলোকও নেই, জীব মৃত্যুর পরে আর জন্মগ্রহণ করে না। ভালোমন্দ কোনো কর্মেরই কোনো ফল হয় না।'

পায়াসী কেন পরলোক ও পুনর্জন্মে বিশ্বাস করতেন না, সে সম্বন্ধে তাঁর তিনটি যুক্তি ছিল, যা তিনি বুদ্ধের শিষ্য কুমার কাশ্যপের কাছে রেখেছিলেন—(১) কেউ মৃত্যুর পর ফিরে এসে বলেনি যে আরেকটি লোক আছে; (২) ধর্মাত্মা আন্তিক—মৃত্যুর পর যাদের স্বর্গলাভ নিশ্চিত, তারাও মরতে অনিচ্ছুক হয়; (৩) জীবাত্মা শরীর ত্যাগ করার পরও শরীরের ওজন বিন্দুমাত্রা হ্রাস পায় না; এবং খুব সাবধানতার সঙ্গে মরলেও জীবকে কোনো দিক থেকে বের হয়ে আসতে দেখা যায় না।

বুদ্ধ বুঝতেন যে, বস্তুবাদ তাঁর ব্রহ্মচর্য ও সমাধি তত্ত্বেরও ততটাই বিরুদ্ধে যতটা আত্মবাদের। সেজন্য তিনি বলেছেন (অঙ্গুত্তরনিকায়, ৩) 'যেই জীবন, সেই শরীর, (উভয়েই এক) এরকম বিচার থাকলে ব্রহ্মচর্যবাস হয় না। 'জীব এবং শরীর স্বতন্ত্র' এই মত (= দৃষ্টি) থাকলেও ব্রহ্মচর্যবাস হয় না।'

মানুষ ব্রহ্মচর্যবাস (= ভিক্ষু জীবন) তখনই করে যখন বর্তমান জীবনের পরেও এই জীবনের কর্মফল কিংবা অসমাপ্ত কর্মকে সমাপ্ত করার সুযোগ পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এই কারণেই বস্তুবাদীদের জন্য ব্রহ্মচর্যবাস ব্যর্থ হয়। শরীর আর জীবকে স্বতন্ত্র মনে করা আত্মবাদীদের কাছেও ব্রহ্মচর্যবাস ব্যর্থ; কারণ নিত্যপ্রব আত্মার মধ্যে ব্রহ্মচর্য দ্বারা সংশোধন, সংবর্ধনের কোনো প্রয়োজনই নেই। এ ভাবেই বুদ্ধ নিজেকে অবস্তুবাদী এবং অনাত্মবাদী স্থিতিতে রেখেছেন।

(৫) অনীশ্বরবাদ—বৌদ্ধ দর্শনের যে রূপ—অনিত্য, অনাত্মা, প্রতীত্য-সমুৎপাদ—আমরা দেখেছি, সেখানে ঈশ্বর অথবা ব্রহ্মের কোনো স্থানই নেই, তেমনই স্থান নেই আত্মার। এ কথা সত্য যে বুদ্ধ ঈশ্বরবাদ সম্বন্ধে তেমন বিশেষ আলোচনা করেননি, যেমনটি তিনি অনাত্মবাদ বিষয়ে করেছেন। এর ফলে বেশ কিছু ভারতীয় এবং লব্ধ প্রতিষ্ঠ পাশ্চাত্য ধরনের অধ্যাপক এ কথাই বলতে চান যে ঈশ্বরবাদ সম্পর্কে নীরব থেকে বুদ্ধ প্রকৃতপক্ষে উপনিষদের সিদ্ধান্তগুলিকেই পূর্ণরূপে স্বীকার করেছেন।

ঈশ্বর সম্বন্ধে যখন ধারণা করা হয়, তখন তাকে বিশ্বের স্রষ্টা, ভর্তা, হর্তা একে নিত্যচেতন ব্যক্তির অর্থে ধরা হয়। বুদ্ধের প্রতীত্য-সমুৎপাদে এরকম ঈশ্বরের স্থান তখনই হতে পারে যখন অন্যান্য সমস্ত ধর্মের মতো ঈশ্বরও প্রতীত্য-সমুৎপন্ন হবে। আবার প্রতীত্য-সমুৎপন্ন হলে তা আর ঈশ্বর থাকবে না। উপনিষদে আমরা বিশ্বের এক কর্তাকে পাই—

‘প্রজাপতি প্রজার ইচ্ছায় তপ করলেন...তপ করে তিনি যুগল সৃষ্টি করেন।’ (প্রশ্নোপনিষদ, ১। ৩-১৩)।

‘ব্রহ্ম...কামনা করলেন।...তপ করে তিনি এই সব (= ‘জগৎ সৃষ্টি করি।’ তিনি এই জগৎ সৃষ্টি করলেন।’ (ঐতরেয়, ১। ১)

বুদ্ধ এবার এই ব্রহ্মা, ঈশ্বর, সৎ ইত্যাদির কী গতি করলেন সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া যাক। মল্লদের এক প্রজাতন্ত্রের রাজধানী অনুপিয়াতে বুদ্ধ ভার্গব গোত্রের পরিব্রাজকদের সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন। (ছাপরা জেলার কোনো এক জায়গায়, অনোমানদীর কাছাকাছি অঞ্চলে) ‘ভার্গব! যে শ্রমণ-ব্রাহ্মণ ঈশ্বর (=ইস্বর) অথবা ব্রহ্মার কর্তৃত্বের মতকে শ্রেষ্ঠ মনে করেন তাঁদের আমি জিজ্ঞাসা করি—সত্যিই কি আপনারা ঈশ্বরের কর্তৃত্বকে শ্রেষ্ঠ মনে করেন? আমার এই জিজ্ঞাসার উত্তরে তাঁরা সম্মতিসূচক উত্তর দেন। আমি পুনরায় তাঁদের প্রশ্ন করি যে—আপনারা কী ভাবে ঈশ্বর অথবা ব্রহ্মার কর্তৃত্বকে শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যা দেন? আমার এই প্রশ্নের উত্তর তাঁরা আমার কাছেই জানতে চান। তখন আমি তাঁদের উত্তর দিই—‘...বহুকাল অতিক্রান্ত হওয়ার পর...এই লোকে প্রলয় হয়।...পুনরায় বহুকাল অতিক্রান্ত হওয়ার পর এই লোকের উৎপত্তি হয়। উৎপত্তি হওয়ার পর শূন্য ব্রহ্ম-বিমান (= ব্রহ্মার উড়ন্ত বাসস্থান) প্রকট হয় তখন আভাস্বর দেবলোকের কোনো প্রাণী তার আয়ু ক্ষীণ হলে অথবা পুণ্য ক্ষীণ হলে...সেই শূন্য ব্রহ্ম-বিমানে উৎপন্ন হয়।...সেখানে সে বহুকাল থাকে। বহুকাল একাকী থাকার কারণে সে বিচলিত হয় এবং তার মধ্যে ভীতির সঞ্চার হয়—’ (বুদ্ধ এখানে ব্রহ্মার একাকী থাকায় ভয়ের সঞ্চার হওয়াকে বৃহদারণ্যকের সেই বাক্যের দিকে ইঙ্গিত করেছেন—‘আত্মাই প্রথমে ছিল। তিনি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দ্বিতীয় কাউকে দেখতে পেলেন না। তিনি তখন ভীত হলেন। সেজন্য একাকী ব্যক্তি ভীত হয়।...তিনি তখন দ্বিতীয় আরেকটির জন্য ইচ্ছুক হলেন।’) ‘আহা যদি আরও অনেক প্রাণী এখানে আসত।’...অতঃপর অন্য প্রাণীও আয়ু ও পুণ্য ক্ষয়জনিত কারণে...সেই ব্রহ্ম-বিমানে উৎপন্ন হয়। যে প্রাণী সেখানে প্রথম উৎপন্ন হয়েছিল, তার মনে হয়—‘আমি ব্রহ্মা, মহাব্রহ্মা, বিজেতা, অ-

বিজিত, সর্বজ্ঞ, সর্বজ্ঞা, যশোবতী, ঈশ্বর, কর্তা, নির্মাতা, শ্রেষ্ঠ, স্বামী এবং ভূত ভবিষ্যতের প্রাণীদের পিতা। আমিই এই প্রাণীদের উৎপন্ন করেছি। কারণ আমার মনেই প্রথম এই ইচ্ছা জাগ্রত হয়েছিল, 'তাই অন্য প্রাণী এখানে আবির্ভূত হয়েছে'। এতএব এই প্রাণীরা সকলে আমার মন থেকেই উৎপন্ন হয়েছে। এরপর পরবর্তী পর্যায়ে উৎপন্ন প্রাণীদেরও মনে হয়—ইনিই ব্রহ্মা ইনিই ঈশ্বর। কেন? কারণ আমরা উৎপন্ন হয়েই একে দেখতে পেয়েছি, অর্থাৎ তিনি আমাদের থেকে পূর্বেই এখানে বিরাজমান ছিলেন। অন্য প্রাণীরা সেই দেবকায়্য পরিত্যাগ করে এই লোকে আবির্ভূত হয়। যখন এদের মধ্যে সমাধিপ্ৰাণ্ড হয়ে পূর্বজন্মকে স্মরণ করে তখন তারা সেই শূন্য ব্রহ্ম-বিমানে অবস্থানের আগের ঘটনা স্মরণে আনতে পারে না। তারা বলে—'এই যে ব্রহ্মা, ঈশ্বর, কর্তা, তিনি নিত্য (= ধ্রুব), শাস্ত্রত, নির্বিকার এবং তিনি সদা এরকমই থাকবেন। আর আমরা যারা এই ব্রহ্মার দ্বারা সৃষ্ট হয়েছি, তারা অ-নিত্য, অ-ধ্রুব, স্বল্পায়ু, নশ্বর।' এ ভাবেই তো আপনারা ঈশ্বরের কর্তৃত্বকে বর্ণনা করেন? তখন তাঁরা বলেন— 'যে ভাবে আয়ুস্মান গৌতম বর্ণনা করলেন, আমরাও অনুরূপই শুনেছি।'

সেই সময়ের—পরম্পরা, চমৎকার, শব্দের ইন্দ্রজাল ইত্যাদির দ্বারা প্রমাণিত ঈশ্বরের কর্তৃত্বের এ ছিল এক উৎকৃষ্টতম খণ্ডন যার মধ্যে সূক্ষ্ম কৌতুকও বিদ্যমান ছিল। (কেবটঠো-সূত্ত, দীঘনিকায়, ১। ১১; অনু পৃ. ৭৯-৮০)।

বহু পূর্বে...এক ভিক্ষুর মনে এই প্রশ্ন দেখা দেয় যে—'এই চার মহাভূত—পৃথিবী-ধাতু, জল-ধাতু, তেজ-ধাতু, বায়ু-ধাতু—কোথায় গিয়ে সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ হয়?'...সে চতুর্মহারাজিক দেবতাদের কাছে গিয়ে এই প্রশ্ন করলে, চতুর্মহারাজিক দেবতাগণ সেই ভিক্ষুকে বলল—'...আমরাও এ প্রশ্নের উত্তর জানি না...আমাদের চেয়েও বড় আরও চার মহারাজ আছেন, হয়তো তাঁরা এর উত্তর জানেন।' (ধূতরাত্রি, বিরুঢ়ক, বিরুপাক্ষ, বৈশ্বণ (= কুবের))।

'আমাদের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ত্রয়স্রিংশ...যাম...সুযাম...তৃষিত (দেবগণ) ...সত্তৃষিত দেবপুত্র...নির্মাণ রতি (দেবগণ)...সুনির্মিত (দেবপুত্র)...পরিনির্মিতবশবী (দেবগণ...বশবতী নামক দেবপুত্র...ব্রহ্মকায়িক নামের দেবতা বর্তমান, তাঁরা হয়তো এ বিষয়ে অবগত আছেন। ব্রহ্মকায়িক দেবতারাও ওই ভিক্ষুকে বললেন—'আমাদের অপেক্ষা আরও অনেক বড় ব্রহ্মা আছেন, তিনি...ঈশ্বর, কর্তা, নির্মাতা...সমস্ত সৃষ্টি এবং সৃষ্ট হবে, এমন সমস্ত কিছুই জনক, হয়তো তিনি জানেন এ প্রশ্নের উত্তর। ভিক্ষু প্রশ্ন করলেন সেই ব্রহ্মা কোথায় অবস্থান করেন?' উত্তরে তাঁরা বললেন—'আমরা জানি না ব্রহ্মা (= ঈশ্বর) কোথায় অবস্থান করেন।' এর কিছুক্ষণ পরে মহাব্রহ্মা (= মহা ঈশ্বর) প্রকট হলেন। ভিক্ষু মহাব্রহ্মাকে সেই একই প্রশ্ন করলেন, 'এই চার মহাভূত কোথায় বিরুদ্ধ হয়।' মহাব্রহ্মা সেই একই কথা বললেন। ভিক্ষু তৃতীয়বারও ওই একই প্রশ্ন করায়, মহাব্রহ্মা ওই ভিক্ষুর হাত ধরে দেবতাদের সভা থেকে একান্তে নিয়ে গিয়ে বললেন—'হে ভিক্ষু, এই দেবতারা মনে করে যে আমার অজানা কিছু নেই, আমার অদৃষ্ট কিছু নেই, সেজন্যই তোমার প্রশ্নের সঠিক উত্তর আমি তাদের সম্মুখে দিতে

পারিনি। তোমার প্রশ্নের উত্তর আমারও অজানা। তবে তোমার ক্রটি এই যে তুমি বুদ্ধকে ত্যাগ করে অন্যত্র তোমার প্রশ্নের উত্তর সন্ধান করছ। তাঁর কাছেই যাও...তিনি যেমন ব্যাখ্যা করেন...তেমনই বুঝে নাও।’

এখানে এক কথা স্মরণ রাখা যেতে পারে যে আজ হিন্দুধর্মে ঈশ্বর শব্দের যে ব্যঞ্জনা গৃহীত হয়েছে, সেই ব্যঞ্জনা সে সময় ব্রহ্মা শব্দ সম্বন্ধে ব্যবহৃত হত। তখন শিব এবং বিষ্ণুকে ব্রহ্মার উপরে বসানো হয়নি। বুদ্ধের এই পরিহাসপূর্ণ কাহিনী পূর্ণ রসাস্বাদন তখনই করা যাবে যদি আপনারা ব্রহ্মার পরিবর্তে আল্লাহ কিংবা ভগবান, বুদ্ধের পরিবর্তে মার্কস এবং ভিক্ষুর জায়গায় কোনো সাধারণ মার্কস অনুগামীকে রেখে এ কাহিনীর পুনরুক্তি করেন। সহস্র অবিশ্বাস্য বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপনকারী সেই সময়কার অন্ধ শ্রদ্ধালুদের বুদ্ধ এটাই বোঝাতে চেয়েছিলেন যে তোমাদের ঈশ্বর নিত্য, ধ্রুব ইত্যাদি কোনো কিছুই নয়। না সে সৃষ্টি করে, না বিনষ্ট করে। সেও অন্য প্রাণীদের মতো জন্ম-মৃত্যুর অধীন। তিনি অগুণতি দেবতাদের একজন মাত্র। বুদ্ধের ঈশ্বরের (= ব্রহ্মা) বিরুদ্ধে এরকম উঠে পড়ে লেগে যাওয়ার আরেকটি উদাহরণ নেওয়া যেতে পারে। এখানে বুদ্ধ স্বয়ং ঈশ্বরের সম্মুখীন হচ্ছেন। (ব্রহ্মনিমন্তিক সূত্র, মজ্জিমনিকায়, ১। ৫। ৯, অনুঃ পৃ. ১৯৪-১৯৫)। ‘কোনো এক কালে...বকব্রহ্মার মনে এমন এক ভ্রান্ত ধারণার উদয় হয়েছিল যে—সে (ব্রহ্মলোক) নিত্য, ধ্রুব, শাস্বত, শুদ্ধ, অচ্যুত, অজ, অজর, অমর; সে না হয় চ্যুত, না হয় উৎপন্ন। এর আগে দ্বিতীয় কোনো নিঃসরণ (গন্তব্যস্থল) নেই।’...তখন আমি (বুদ্ধ) ব্রহ্মলোকে প্রকট হই। বকব্রহ্মা দূর থেকে আমাকে আসতে দেখে বলেন—‘আসুন মিত্র! স্বাগত মিত্র। চিরকালের পর আপনার এখানে আগমন হয়েছে মিত্র। এই ব্রহ্মলোক নিত্য, ধ্রুব, শাস্বত, অজর ও অমর।’ প্রত্যুত্তরে আমি বললাম—‘অহো, আপনার অবিদ্যায় পতন হয়েছে। বকব্রহ্মা বললেন—‘মিত্র আমি নিত্যকেই নিত্য বলছি।’ তখন আমি বললাম—‘ব্রহ্মা অন্য লোক থেকে চ্যুত হয়েই তুই এখানে উৎপন্ন হয়েছিস।’ (যাজ্ঞবল্ক্য গার্গীকে ‘ব্রহ্মলোকের পরে কী?’ এই প্রশ্ন করায় তাঁকে শিরোচ্যুত করা ভয় দেখিয়ে নিরস্ত করেছিলেন। (বৃহদারণ্যক, ৩। ৬)।

ব্রাহ্মণ, অন্ধের অনুসরণকারী, অন্ধের মতো না দেখে, না জেনে ঈশ্বর (ব্রহ্মা) আর তাঁর লোকের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে। এই ভাবকে বোঝাতে গিয়ে এক জায়গায় বুদ্ধ বলেছেন (তেবিজ্জ, সূত্র, দীগনিকায় ১। ১৩; অনুঃ পৃ. ৮৭-৮৯)—

বাশিষ্ট ব্রাহ্মণ বুদ্ধকে বললেন—‘হে গৌতম পথ-বিপথ (মার্গ-অমার্গ)-এর সম্বন্ধে ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ, ছন্দাবা ব্রাহ্মণ, নানা পথের কথা বলেন, তা সত্ত্বেও এরা সকলেই ব্রহ্মার সালোকতাতে পৌঁছায়। যেমন গ্রাম বা নগরের চারপাশে অনেক পথ থাকে কিন্তু তার সবকটিই গ্রাম বা নগরাভিমুখী হয়ে থাকে।’

‘বাশিষ্ট...ত্রেবিদ্যা ব্রাহ্মণের মধ্যে একজন ব্রাহ্মণও নেই, যে স্বচক্ষে ব্রহ্মাকে দেখেছে। এক আচার্য, আচার্য-প্রাচার্য, এমনকি সপ্তপুরুষের পরম্পরাতেও এমন কোনো আচার্য নেই। ব্রাহ্মণের পূর্বজ ঋষিমন্ত্রের কর্তা, মন্ত্রের প্রবক্তা...অষ্টক, বামক, বামদেব,

বিশ্বামিত্র, জামদগ্নি, অঙ্গিরা, ভরদ্বাজ, বশিষ্ঠ, কাশ্যপ, ভৃগু—এদের মধ্যে কেউ কি আছেন, যিনি ব্রহ্মাকে স্বচক্ষে দেখেছেন। যাকে জানা নেই, দেখা নেই, তার সালোকতার জন্য পথ নির্দেশ করছে। বশিষ্ঠ! এটা তো সেই তিন অন্ধের সারির মতো হল, যারা একে অপরের সঙ্গে যুক্ত, কিন্তু প্রথম জনও কিছু দেখতে পায় না, মধ্যবর্তী জনও নয়, পশ্চাদবর্তী জনও তথৈবচ।' (ঋগ্বেদে ঋষিদের মধ্যে বামকের নাম নেই। অঙ্গিরারও নিজস্ব মন্ত্র নেই। কিন্তু অঙ্গিরার গোত্রীয়দের ৫৭টির বেশি সূত্র আছে। (ঋক্ ১।৩৫।৩৬, ৬।১৫, ৮।৫৭।৫৮; ৬৪, ৭৪, ৭৬, ৭৮-৭৯, ৮১-৮৫, ৮৭, ৮৮; ৯।৪, ৩০, ৩৫-৩৬, ৩৯-৪০, ৪৪-৪৬, ৫০-৫২, ৬১, ৬৭, (২২-৩২), ৬৯, ৭২, ৭৩, ৮৩, ৯৪-৯৭ (৪৫-৫৮), ১০৮ (৮-১১), ১১২, ১০।৪২-৪৪, ৪৭, ৬৭-৬৮, ৭১, ৭২, ৮২, ১০৭, ১২৮, ১৬৪, ১৭২-৭৪; অবশিষ্ট আট ঋষিগণের ঋগ্ মন্ত্র এই প্রকারের—

সূত্র সংখ্যা নির্দেশ

(১) অষ্টক (বিশ্বামিত্র পুত্র)	১	১।১০৪
(২) বামক	০	
(৩) বামদেব (বৃহদুকথ, মূর্ধন্বা অংহোমুচের পিতা)	৫৫	৪।১-৪১; ৪৫-৫৮
(৪) বিশ্বামিত্র (কুশিক পুত্র)	৪৬	৩।১-১২, ৩৪, ২৬, ২৭-৩০ ৩২-৫৩, ৫৭-৬২, ৯।৬৭, (১৩-১৫); ৯, ১৭১ (১৩-১৮)
(৫) জামদগ্নি (ভার্গব)	৪	৮।৯০, ৯।৬২, ৬৫, ৬৭, (১৬-১৮)
(৬) অঙ্গিরা	০	০
(৭) ভরদ্বাজ (বৃহস্পতি পুত্র)	৬০	৬১-১৪, ১৬-৩২, ৩৭-৪৩, ৫৩-৭৪, ৯।৬৭, (১-৩)
(৮) বশিষ্ঠ (মিত্রাবরুণ পুত্র)	১০৫	৭।১-১০৪, ৯-৬৭, (১৯-২১) ৯০, ৯৭ (১-৩)
(৯) কাশ্যপ (মরীচি পুত্র)	৭	১/৯৯, ১৬৪, ৬৭, (৪-৬) ৯১-৯৩, ১১৩-১৪
(১০) ভৃগু (বরুণ পুত্র)	১	৯।৬৫

(৬) দশ অকথনীয়—বুদ্ধ কিছু কথাকে অকথনীয় (= অব্যাকৃত) বলেছেন। অনেক বৌদ্ধিক বিশ্বাসঘাতকতায় উন্মুক্ত ভারতীয় লেখক বুদ্ধের এই বক্তব্যের উদাহরণ টেনে বলতে চায় যে, বুদ্ধ ঈশ্বর, আত্মা সম্বন্ধে নীরব ছিলেন। অতএব তাঁর এই নীরবতার এই বৌদ্ধ দর্শন-৪

অর্থ করা অনুচিত যে তিনি এ সমস্তর অস্তিত্বকে অস্বীকার করতেন। কিন্তু তারা এ কথা গোপন রাখতে চায় যে বুদ্ধের অব্যাকৃত বাক্যের সূচি কোনো খোলামেলা বিষয় নয় যে তাতে যার যা ইচ্ছা মনগড়া কথা ঢোকাতে পারে। বুদ্ধের অব্যাকৃত সূচির মধ্যে মাত্র দশটি কথা আছে যা লোক (= বিশ্ব), জীব শরীরের ভেদ-অভেদ তথা মুক্ত পুরুষের গতি সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। —(মজ্জিমনিকায়, ২।২।৬; অনু, পৃ. ২৫১)

ক. লোক

১. লোক কি নিত্য?
২. লোক কি অনিত্য?
৩. লোকের অন্ত আছে?
৪. লোক কি অন্ত?

খ. জীব শরীরের ঐক্য

৫. জীব এবং তার শরীর কি একই বস্তু?
৬. জীব এবং তার শরীর কি পৃথক বস্তু?

গ. নির্বাণের অবস্থা

৭. মৃত্যুর পর সকলেই কি তথাগত (মুক্ত) হয়?
৮. মৃত্যুর পর সকলেই কি তথাগত হয় না?
৯. মৃত্যুর পর তথাগত হয় এবং হয় না?
১০. মৃত্যুর পর তথাগত হয় না, না হয়ই না?

মালুংক্যপুত্র বুদ্ধকে উপরোক্ত দশটি অব্যাকৃত (= অকথনীয়, নিশ্চুপ) বাক্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলেন—‘ভগবান যদি এ বিষয়ে আপনি জ্ঞাত থাকেন, তাহলে আমাদের বলুন, যদি জ্ঞাত না হন, তাহলে না জানা, না বোঝা ব্যক্তিদের জন্য পরিষ্কার বলুন—আমি জানি না, আমার জানা নেই।’

এ কথার উত্তরে বুদ্ধ বলেন—‘আমি একে অব্যাকৃত এজন্যই বলেছি যে এগুলি সম্বন্ধে বলা নিরর্থক, ভিক্ষুচর্যার (= আদি ব্রহ্মাচার্য) জন্য অনুপযোগী। এগুলি নির্বেদ = বৈরাগ্য, নিরোধ = শান্তি, পরমজ্ঞান, নির্বাণের জন্যও অপ্রয়োজনীয়; সেজন্যই আমি এগুলিকে অব্যাকৃত রেখেছি।’

(স্যার রাধাকৃষ্ণণের সংস্কার)—বুদ্ধের দর্শনে ঈশ্বর, আত্মা ব্রহ্মা এ ধরনের কোনো নিত্য প্রব বস্তুর উপস্থিতি না থাকা সত্ত্বেও, উপনিষদ এবং ব্রাহ্মণের তত্ত্বজ্ঞান সৎ-চিত-আনন্দ থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত তত্ত্ব অ-সৎ (= অনিত্য প্রতীত্য-সমুৎপন্ন) অ-চিত (= অনাত্মা), অন্-আনন্দ (= দুঃখ) অনিত্য দুঃখ অনাত্মা—ঘোষণা করা সত্ত্বেও স্যার রাধাকৃষ্ণণের মতো হিন্দু লেখক দায়িত্বজ্ঞানহীন ভাবে এ কথা বলার ধৃষ্টতা প্রকাশ করেন, তখন তাঁকে ধর্মকীর্তির ভাষায় ‘ধিক ব্যাপকতম’ বলতে হয়।—

(ক) ‘তিনি (= বুদ্ধ), ধ্যান এবং প্রার্থনার পথ গ্রহণ করেন।’ কার প্রার্থনা? (*Indian Philosophy*, Sir Radhakrishnan, Vol. I, 1st edition; p. 355)

(খ) ‘বুদ্ধের মত ছিল যে শুধুমাত্র বিজ্ঞানই (= চেতনা) ক্ষণিক, আর কিছু নয়।’ ‘সমস্ত ধর্মই প্রতীত্য-সমুৎপন্ন’ এই তত্ত্বের উপযুক্ত ব্যাখ্যাই তিনি দিলেন? (*Indian Philosophy*, Vol. I. P. 378)

(গ) 'যেহেতু বুদ্ধ ব্রহ্ম সম্বন্ধে পরিষ্কার হ্যাঁ কিংবা না বলেননি, এটা কোনো ভাবে পরম সত্যকে (= ব্রহ্ম) অস্বীকার করার অর্থে গ্রহণ করা যায় না। এটা মনে করা অসম্ভব যে বুদ্ধ বিশ্বের এই প্রবাহের মধ্যে কোনো বস্তুকে নিত্য (= ধ্রুব) বলে স্বীকার করেননি। পৃথিবীতে চলে আসা নানা অশান্তির মধ্যে বুদ্ধ এমন কোনো আশ্রয়স্থলের কথা বলেননি, যেখানে মানুষের অশান্ত হৃদয় শান্তি পেতে পারে।' (*Indian Philosophy*, Vol. I, p. 379)

উপরোক্ত সংকট থেকে পরিত্রাণের জন্য স্যার রাধাকৃষ্ণণ বৌদ্ধ নির্বাণকে নিজের মনোমতো করে 'পরমসত্তা' রূপে স্বীকার করিয়ে নেবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন, কিন্তু বৌদ্ধ নির্বাণকে অ-ভাবাত্মক না ভেবে ভাবাত্মক বস্তু রূপে স্বীকার করাই যায় না। বুদ্ধ যেখানে শান্তি প্রাপক আত্মাকে বালসুলভ মূর্খতা বলে মনে করে, তখন তার বিশ্রামের জন্য আশ্রয়স্থল স্যার রাধাকৃষ্ণণের পক্ষেই খোঁজা সম্ভব। আবার তিনি বুদ্ধের সেই বাণীকেও উদ্ধৃত করেছেন যে, 'এই নিরন্তর প্রবাহের মধ্যে কোনো কিছুই নিত্য নয়। এই বিশ্বে কোনো কিছুই নিত্য বা স্থির নয়, না নাম (= চেতনা) না রূপ (= বস্তুবাদ)।' It is a Perpetual Process with nothing Permanent. Nothing here is Permanent, neither name nor form—মহাবগ্গ (বিনয়পিটক) VL. 35 ff.

(ঘ) 'আত্মা সম্পর্কে বুদ্ধের নীরব থাকার অন্য কারণ ছিল।' বুদ্ধ উপনিষদে বর্ণিত আত্মা সম্পর্কে মৌন, তিনি না করেছেন তাকে স্বীকার, না অস্বীকার।' (*Indian Philosophy*, Vol. I, p. 385 & 387)

না মহাশয়, বুদ্ধের দর্শনের নামই অনাত্মবাদ। উপনিষদের নিত্য, ধ্রুব আত্মার আগে অন শব্দ যুক্ত হয়েছে। 'অনিত্য দুঃখ অনাত্মা' ঘোষণাকারীর উদ্দেশ্যে আপনার এই বাণী শুধু এটাই প্রমাণ করে যে আপনি দর্শন শাস্ত্রের ইতিহাস লেখার জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি নন। এরপর তিনি আরও বলছেন—

'এই অতর্কিত তত্ত্ব ব্যতিরেকে জীবনের ব্যাখ্যা করা যায় না? এজন্যই বুদ্ধ সর্বদা আত্মার সত্যতার অস্বীকৃতিকে অস্বীকার করেছেন।' (*Indian philosophy*, Vol. I, p. 389)

একেই বলে—'মুখমন্তীতি বক্তব্যং দশহস্তা হরীতকী' যদি সত্য সত্যি স্যার রাধাকৃষ্ণণ তাঁর এই বক্তব্য নিয়ে বুদ্ধের সম্মুখে উপস্থিত হতে পারতেন তাহলে তাঁর কী অবস্থা তা জানার জন্য আগ্রহী পাঠক মালুংকাপুত্তের কাহিনীটি পড়ে নিতে পারেন। (*Indian Philosophy*, Vol. I, p. 289)

(ঙ) মিলিন্দ প্রশ্নের রচয়িতা নাগসেন (১৫০ খ্রিঃ পূঃ) বুদ্ধের দর্শনের সহজ সরল ব্যাখ্যা যবন সম্রাট মিলিন্দের সামনে রেখেছিলেন, সে সম্পর্কে স্যার রাধাকৃষ্ণণের বক্তব্য—'নাগসেন বৌদ্ধ বিচারকে তার পূর্বজ শাখা উপনিষদ থেকে বিচ্যুত করে শুধুমাত্র বৌদ্ধিক ক্ষেত্রে রোপণ করেছেন।' (*Indian Philosophy*, Vol. I, p. 390) এবং

'বুদ্ধের লক্ষ্য (= মিশন) ছিল যে উপনিষদের শ্রেষ্ঠ ভাববাদকে (Idealism) স্বীকার করে তাকে মানবজাতির দৈনন্দিন প্রয়োজনের জন্য সহজ ভাবে ব্যাখ্যা করা।

ঐতিহাসিক বৌদ্ধধর্মের অর্থ উপনিষদের সিদ্ধান্তগুলিকেই অন্য ভাবে জনগণের মধ্যে ব্যাপক প্রচার।' (Indian Philosophy, Vol. I, p. 471)

স্বয়ং বুদ্ধ, এবং পরবর্তীকালে তাঁর অনুগামী নাগসেন (১৫০ খ্রিঃ পূঃ), নাগার্জুন (১৭৫ খ্রিঃ), অসঙ্গ (৩৭৫ খ্রিঃ), বসুবন্ধু (৪০০ খ্রিঃ), দিঙ্নাগ (৪২৫ খ্রিঃ), ধর্মকীর্তি (৬০০ খ্রিঃ), ধর্মোত্তর, শান্তরক্ষিত (৬৫০ খ্রিঃ), জ্ঞানশ্রী, শাক্যশ্রী ভদ্র (১২০০ খ্রিঃ) যে রহস্যের মীমাংসা করতে পারেননি, সেই রহস্য সমাধানের বিরল কৃতিত্বের দাবিদার স্যার রাধাকৃষ্ণণ, যিনি অনাত্মবাদী বুদ্ধকে উপনিষদের আত্মবাদের প্রচারক বানিয়ে ছেড়েছেন। প্রায় আড়াই হাজার বছর ধরে ভারতবর্ষ, শ্রীলঙ্কা, বর্মা, শ্যাম, চীন, জাপান, কোরিয়া, মঙ্গোলিয়া, তিব্বত, মধ্য এশিয়া, আফগানিস্তান সহ আরও বহু দেশের মাটিতে কী ভয়ানক ভ্রম এতদিন ধরে প্রচারিত হয়ে এসেছে, যার ফলে এই বিশাল ভূভাগের জনগণ বুদ্ধকে, অনাত্মবাদী, অনীশ্বরবাদী মনে করে এসেছে। অন্যদিকে অক্ষপাদ, বাদরায়ণ, বাৎস্যায়ন, উদ্যোতকর, কুমারিল, বাচস্পতি, উদয়ন প্রভৃতি 'অবিদ্যার' পরিচয় রেখেছেন বলতে হয়।

(৭) বিচার স্বাতন্ত্র্য—প্রতীত্য-সমুৎপাদের আবিষ্কারের কাছে বিচার স্বাতন্ত্র্য একটি স্বাভাবিক বিষয়। বৌদ্ধ দার্শনিকগণ তাঁদের প্রবর্তকের আদেশানুসারে, প্রত্যক্ষ এবং অনুমান, এই দুই প্রমাণ ব্যতিরেকে তৃতীয় কোনো প্রমাণকে অস্বীকার করেন। বুদ্ধ বিচার স্বাতন্ত্র্যকে তাঁর উপদেশে এ ভাবে গুরু করেছেন—(মজ্জিমনিকায়, অনুঃ, পৃ. ৮৬-৮৭) 'ভিক্ষুগণ! মনে করো কোনো এক ব্যক্তির সামনে এক জলধারা, যার এক তীর শঙ্কা ও বিপদে পরিপূর্ণ অথচ অন্য তীর শঙ্কাহীন, সমৃদ্ধিপূর্ণ। সেই মুহূর্তে অন্য তীরে যাবার জন্য না আছে কোনো সেতু কিংবা কোনো তির। সেই ব্যক্তির তখন করণীয় কী? সে তৃণ, কাষ্ঠ, পত্র, পল্লব সংগ্রহ করে একটি ভেলা নির্মাণ করবে এবং সেই ভেলায় আরোহণ করে নিজের হস্তপদের যথোপযুক্ত ব্যবহার করে স্বস্তির সঙ্গে কাঙ্ক্ষিত তীরে উপনীত হবে। তীরে উপনীত হওয়ার পর 'এই ভেলা আমার অনেক উপকার সাধন করেছে, এর সাহায্যেই আমি আমার বাঞ্ছিত তীরে এসে পৌঁছেছি অতএব একে আমি শিরোপরে অথবা স্কন্ধে করে বহন করে নিয়ে চলি' এরকম চিন্তা কেউ যদি করে; তাহলে সেই ব্যক্তি কি ভেলাটির প্রতি প্রকৃত কর্তব্যপরায়ণ বলে বিবেচিত হবে? না ভিক্ষুগণ। বহন করতে গেলে পরবর্তী সময়ে ওই ভেলা তার দুঃখেরই কারণ হবে।'

একবার বুদ্ধকে কেশপুত্র গ্রামের কালামগণ নানা মতবাদের সত্যাসত্য সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে প্রশ্ন করেছিলেন (অঙ্গুত্তরনিকায়, ৩।৭।৫)—'ভণ্ডে! কোনো কোনো ব্রাহ্মণ কেশপুত্রে আসে, নিজের মতকে প্রকাশ করে, অন্য মতবাদের নিন্দা করে, সে সম্বন্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করে। এর ফলে আমরা সন্দিহান হয়ে উঠি, কে সঠিক আর কে নয়।'

'কালামগণ! তোমাদের সন্দিহান হওয়া সর্বাত্মক সঠিক। যেখানে সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক তোমাদের সেখানেই সন্দেহ হয়েছে। কালামগণ, কোনো শ্রুত বচনের (= বেদ) ভিত্তিতে কোনো কিছুকে সত্য বলে মান্য করো না। তোমার মনোমতো যুক্তির

कारणे किंवा बत्तार आकृति, आचरणे मुक्त হয়ে, এই শ্রমণ আমার গুরু, এরকম সিদ্ধান্তে উপনীত হোয়ো না। তুমি নিজেই উত্তমরূপে অবগত যে প্রকৃত ধর্ম (ধর্ম ও বাণী) নির্দোষ এবং বিজ্ঞজন প্রশংসিত, এর গ্রহণ মানবের কল্যাণ ও সুখের জন্য। অতএব কালামগণ তোমরা সেই প্রকৃত ধর্মকেই স্বীকার কোরো।’

(৮) সর্বজ্ঞতা ভ্রান্ত—বুদ্ধের সমকালীন বর্ধমানকে সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী বলা হত, যার প্রভাব পরবর্তীকালে বুদ্ধের অনুগামীদের উপরেও পড়েছিল। কিন্তু বুদ্ধ নিজে এই ধারণার বিরোধী ছিলেন।

বৎসগোত্র প্রশ্ন করেছিলেন (মজ্জিমনিকায়, ২।৩।১)—‘ভণ্ডে শুনেছি শ্রমণ গৌতম সর্বজ্ঞ এবং সর্বদর্শী। এরকম যারা বলে থাকে তারা কি যথার্থ বলে? এর ফলে অসত্য দ্বারা ভগবানের নিন্দা করা হয় না কি?’

‘বৎস! এরকম কথা যারা আমার সম্পর্কে বলে, তারা যথার্থ বলে না, তারা অসত্যের দ্বারা আমার নিন্দাই করে।’

আবার অন্যত্র (মজ্জিমনিকায়, ২।৪।১০; অনুঃ, পৃ. ৩৬৯)—‘এরকম শ্রমণেরা ব্রাহ্মণ নয়, যারা একেবারেই সব জেনে ফেলবে, দেখে ফেলবে, সর্বজ্ঞ সর্বদর্শী হবে।’

(৯) নির্বাণ—নির্বাণের অর্থ নির্বাণিত হওয়া। প্রদীপ কিংবা আগুনের জ্বলতে জ্বলতে নিভে যাওয়া। প্রতীত্য-সমুৎপন্ন (বিচ্ছিন্ন প্রবাহ থেকে উৎপন্ন) নাম-রূপ (= বিজ্ঞান ও বস্তু) তৃষ্ণার আকর্ষণে মিলিত হয়ে যে এক জীবনপ্রবাহ রূপে প্রবাহিত হয়ে চলেছে, এই প্রবাহের পরিসমাপ্তির নামই নির্বাণ। তৈলপ্রবাহ বন্ধ হলে যেমন প্রদীপ কিংবা আগুন নিভে যায়, তেমনি নানা ধরনের আশ্রব = চিত্তমল। (কাম-ভোগ, পুনর্জন্ম এবং নিত্য আত্মার নিত্যত্ব ইত্যাদি দৃষ্টিভঙ্গি) ক্ষীণ হলে এই গমনাগমন বিনষ্ট হয়ে যায়। নির্বাণ শব্দের মধ্যেই তার অর্থ বলা আছে অর্থাৎ নির্বাণিত হওয়া। বুদ্ধ তাঁর এই বিশেষ শব্দটিকে এই ভাবের দ্যোতনার জন্যই বেছে নিয়েছিলেন। সেই সঙ্গে তিনি এ কথা বলতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন যে নির্বাণ উত্তর পর্বে মানুষ (তথাগত) কোথায় যায়। অনাত্মবাদী দর্শনে তার গতি কী হতে পারে তা সহজেই বোঝানো যেতে পারে, কিন্তু সেই ব্যাখ্যা ‘বালানাং ত্রাসজনকম্’ (অজ্ঞকে ভয়ভীত করা) হবে। সেজন্যই বুদ্ধ এর সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা করতে চাননি (ইতিবৃত্তক, ২।২।৬)। উদানের এই বাক্যের ভিত্তিতে কিছু কিছু ব্যক্তি নির্বাণকে এক ভাবাত্ম ব্রহ্মলোকের মতো কিছু সৃষ্টি করতে উদ্যত। (উদান, ৮।২)

‘ভিক্ষুগণ! অ-জাত, অ-ভূত, অ-কৃত = অ-সংস্কৃত।’ কিন্তু এই নিষেধাত্মক বিশেষণ থেকে কোনো ভাবাত্মক নির্বাণকে তখনই সিদ্ধ করা সম্ভব, যখন তার ‘আনন্দ’ ভোগ করার জন্য কোনো নিত্য আত্মার অস্তিত্ব থাকে। বুদ্ধ নির্বাণকে সেই অবস্থা বলে বর্ণনা করেছেন, যখন আকর্ষণ ক্ষীণ হয়ে গেছে, আশ্রব (= চিত্তমল—ভোগ, জন্মান্তর এবং বিশেষ মতবাদের তৃষ্ণা) যেখানে বিলীন হয়েছে। এর বেশি কিছু বলার অর্থ বুদ্ধের অ-দ্ব্যাকৃত প্রতিজ্ঞার অবহেলা করা। (উদান, ৮।২)

‘দুদসং অন্তর নাম ন হি সন্তং সুদসসনং ।

পটিবিদ্ধা তণ্হা জানতো পস্সতো নথি কিঞ্চণা’

বুদ্ধের দর্শন ও তৎকালীন সমাজ-ব্যবস্থা

দর্শন একান্ত ভাবে মনোজগতের বিষয়, অস্থি মাংস সর্বস্ব সমাজের, এর উপরে কীসের অধিকার? দর্শন শুধুমাত্র এক কল্পনার আকাশে ডানা মেলা মনোময় জগতের উপজ একটি বিষয়, অতএব একে সেই মাপকাঠিতেই দেখা উচিত। দর্শন বিষয়ে এ ধরনের চিন্তা প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য উভয় অঞ্চলেই দেখা যায়। তাদের মতানুসারে দর্শন বাস্তব জগৎ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক এক বিষয়। আমরা গ্রিক দর্শনে দেখেছি যে দর্শন মনোজগতের বিষয় হওয়া সত্ত্বেও, একেবারে ‘ত্রিলোকের মধ্যে মথুরা শ্রেষ্ঠ’ জাতীয় বিশ্বাসের বিষয় নয়। মন স্বয়ং এক বাস্তব সৃষ্টি। যাগ্জবল্ক্যের গুরু উদালক আরুণী স্পষ্ট বলেছেন—‘মন অনুময়। ভক্ষিত অন্নের সূক্ষ্মতম অংশের উর্ধ্বগতির নামই মন।’ (ছান্দোগ্য উপনিষদ, ৬।৬।১-৫) (এই গ্রন্থকারও তার অন্য একটি গ্রন্থে লিখেছে যে আমাদের মানসিক বিকাশে, আমাদের দুই হাত, তার শ্রম, ব্যক্তিগত সমষ্টিগত উভয়ক্ষেত্রে, সর্বপেক্ষা বেশি অবদান রাখে। মানুষের মতো তার মনও তার নির্মাণের জন্য সমাজের কাছ ঋণী। দ্র. ‘মানব সমাজ’) এরকম অবস্থাতে মনের উপজ দর্শন শাস্ত্রের বিচার সমাজ থেকে দূরে সরে গিয়ে কী ভাবে করা যেতে পারে? যেমন মানবদেহে চোখের বাস্তব অবস্থিতিকে শরীর থেকে পৃথক করে দেখা চলে না, তেমনি দর্শনকেও তার জন্ম এবং কর্মের পরিস্থিতি থেকে পৃথক করে দেখা চলে না।

উপনিষদে আমরা দেখেছি যে সমাজের স্থিতিকে ধারণকারী (রুদ্ধকারী) ধর্মীয় (বৈদিক ক্রিয়াকর্ম ও পূজার্চনা) ব্যবস্থার প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থার অভাব ঘটতে দেখে, তৎকালীন শাসকবর্গের মধ্যে চিন্তার উদয় হয় এবং ক্ষত্রিয় তথা রাজন্যবর্গের দল—ব্রহ্মজ্ঞান এবং পুনর্জন্মের দর্শন সৃষ্টি করে। মানুষের চিন্তাশক্তিকে নিষ্ক্রিয় করার, সামাজিক বৈষম্যকে যথার্থ বলে প্রমাণিত করার এ ছিল এক কৌশল। দ্বন্দ্বিক রীতিতে আমরা যদি এর বিশ্লেষণ করি, তাহলে দেখব : বাদ—যজ্ঞ, বৈদিক ক্রিয়াকর্ম, পূজাপাঠই শ্রেয় পথ; প্রতিবাদ—যজ্ঞ রূপ ভেলা পার হওয়ার জন্য যথেষ্ট দুর্বল; সংবাদ—ব্রহ্মজ্ঞান শ্রেয় পথ, কর্ম যেখানে সহায়ক।

বৌদ্ধ দর্শন : বাদ (উপনিষদ)—আত্মবাদ; প্রতিবাদ (চার্বাক)—আত্মা নয় বস্তুবাদ; সংবাদ (বুদ্ধ)—অবস্তুবাদী অনাত্মবাদ।

এটা তো গেল বিচার শৃঙ্খলা। সমাজে বৈদিক ধর্ম ছিল স্থিতিস্থাপক এবং তা সম্পত্তির অধিকারী শ্রেণিগুলিকে রক্ষা করা এবং অন্যদিকে শ্রমজীবী—দাস, কারিগর, প্রভৃতি শ্রেণিকে দৃঢ় নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য জনতাকে নৃশংসভাবে পদদলিত করে প্রতিষ্ঠিত রাজ্য ব্যবস্থা (শাসন)—কে কায়ম রাখার জন্য ব্যবহৃত হত।

ধার্মিক নেতাদের (পুরোহিত) পুরস্কারস্বরূপ শোষণের অংশীদার করা হত। শোষিত জনতা তাদের স্বাধীন—শ্রেণিহীন, অর্থনৈতিক দাসত্বমুক্ত—অতীতকে প্রায় বিস্মৃত

হয়েছিল, এবং ধর্মের প্রবঞ্চনায় পড়ে তারা তাদের বর্তমান দুরবস্থাকে 'দেবতাদের বিচার' বলে মেনে নিয়েছিল। শোষিত জনতাকে প্রকৃত ন্যায় দিতে হলে প্রথম কর্তব্য ছিল তাদের ধর্মের প্রবঞ্চনা থেকে মুক্ত করা। সেখানে প্রয়োজন ছিল দেব-পরলোকে বিশ্বাসহীন এক নিরীশ্বরবাদী দর্শনের—বস্তুবাদী দর্শনের। ব্রাহ্মণেরা (পুরোহিত) তাদের দক্ষিণা সংগ্রহে ব্যস্ত ছিল এবং প্রতিবাদের ছোটখাটো ফুলিসক্রে তারা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনত না। প্রাচীনকাল থেকে চলে আসা বর্ণাশ্রমপ্রথা এখন আর উপায়মাত্র ছিল না, সে উদ্দেশ্যে পরিণত হয়েছিল, অতএব এই ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার জন্য তাদের সব ধরনের চেষ্টাই অব্যাহত ছিল। ক্ষত্রিয় (শাসক) গোষ্ঠী এই বাস্তব দুনিয়া এবং তাতে বিচরণশীল শোষিত জনগণের মানসিক ধ্যানধারণা এবং তাদের ক্ষমতা সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান রাখত। তারা বিপদ অনুমান করেছিল এবং সেজন্যই ধর্মের ফাঁদটিকে আরও সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে তার সঙ্গে ব্রহ্মবাদ তথা পুনর্জন্মকে জুড়ে দিল। প্রথম দিকে এর জন্য পুরোহিতবর্গ নিদারুণ অসন্তুষ্ট হয়েছিল। তাদের অসন্তোষের প্রমাণ পাওয়া যায় জৈমিনি এবং কুমারিলের মীমাংসা দর্শনে। তাঁরা ব্রহ্ম (পুরুষ) এবং ব্রহ্মজ্ঞানকে অস্বীকার করে বলেছিলেন, বেদ অপৌরুষেয়; তা কারও সৃষ্টি নয়। প্রকৃতির মতোই বেদও স্বয়ম্ভু। বেদের বিধানই কর্মফল এবং পরলোকের নিশ্চয়তা। বেদ কর্মের বিধান করে এবং এই বিধানের সমর্থনে অর্থবাদ (স্তুতি, নিন্দা, প্রশংসা) হিসাবে বাকি সমস্ত সংহিতা, যথা ব্রাহ্মণ, উপনিষদ তাদের বক্তব্য রেখেছে। এত চেষ্টা সত্ত্বেও যে আঘাত আসছিল, তায় হাত থেকে বৈদিক ক্রিয়াকর্মকে সম্পূর্ণ রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র থেকে জানা যায় যে, লোকায়ত দর্শন (বস্তুবাদী ও নিরীশ্বরবাদী) শাসকশ্রেণির মধ্যেও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। অন্য দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এ কথা বলতে হয় যে, শাসকশ্রেণি তাদের কায়েমি স্বার্থ বজায় রাখার জন্য সময়ের চাহিদানুসারে, সমস্ত ধরনের সামাজিক, ধার্মিক ব্যবস্থাকে পরিবর্তিত করে যুগোপযোগী করে তোলার পক্ষে ছিল। সাধারণ মানুষের ধর্মীয় অন্ধবিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে, শাসকদের রাজকোষ ও শক্তি বৃদ্ধি করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। 'দশকুমার চরিত'-এর সময় (খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতক) রাজ্যের গুপ্তচরেরা ধার্মিকের নির্দোষ বেষভূষা ব্যবহার করত। এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে ধার্মিক পরিধেয়র এহেন ব্যবহারে চাণক্য এবং তাঁর পূর্বজন্মেরও সমর্থন ছিল। তবে শাসকশ্রেণি তার নিজের স্বার্থে কোনো কোনো সময় বস্তুবাদকেও ব্যবহার করেছে, তার প্রমাণ পাওয়া যায় এই কুরুচিকর বাক্যের মধ্যে 'ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ'। যদি বস্তুবাদ সঠিক ভাবে শোষিত জনগণের জন্য ব্যবহৃত হত, তাহলে তা নিঃস্বার্থ হত এবং যার ফলে শোষিত মানুষ তাদের নিজেদের পরিশ্রমের ফল নিজেরা ভোগ করার জন্য দাবি তুলত, এবং সমাজ থেকে শোষণকে নির্মূল করার জন্য সচেষ্ট হত।

বুদ্ধের দর্শন তার মৌলিক রূপে—প্রতীত্য-সমুৎপদ (ক্ষণিকবাদ)—অত্যন্ত যুগান্তকারী ছিল। বিশ্বজগতের সমস্ত কিছুকেই সে পরিবর্তনশীল বলে ঘোষণা করেছে। এই দর্শন, বিগত দিন, যা কোনোদিনই আর ফিরে আসবে না, তার মুখাপেক্ষী হয়ে না থেকে মানুষকে সময়ানুসারে পরিবর্তিত হওয়ার এবং সর্বদা যেকোনো সামাজিক

পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত থাকার শিক্ষা দেয়। বুদ্ধ তাঁর উচ্চতম দার্শনিক বিচার বিশ্লেষণকেও, ভেলার মতো, তাৎক্ষণিক ব্যবহারের জন্য বলেছিলেন। তিনি তাঁর বিচারকে কোনো এক নির্দিষ্ট কালের গণ্ডিতে বেঁধে দেবার চেষ্টাকে নিন্দা করেছেন। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও এই যুগান্তকারী দর্শন তার অভ্যন্তরের সেই তত্ত্বকে নিঃশেষ করতে পারেনি, যা ছিল সামাজিক প্রগতির পক্ষে বাধাস্বরূপ। বুদ্ধ নিত্য আত্মার এক শরীর থেকে অন্য শরীরে গমনাগমনকে স্বীকার করেননি, কিন্তু অন্য ভাবে তিনি পুনর্জন্ম, পরলোক ইত্যাদি স্বীকার করেছেন। যেমন এই শরীরে ‘জীবন’ এক বিচ্ছিন্ন প্রবাহ (উৎপত্তি-নষ্ট-উৎপত্তি) রূপে এক ধরনের ঐক্য স্থাপন করে যা শরীরান্তরেও বর্তমান থাকে। পুনর্জন্মের দার্শনিক ভিত্তিকে আরও সুদৃঢ় করে বুদ্ধ পুনর্জন্মের পুনর্জন্ম দিয়েছেন। এজন্য তিনি প্রতিসন্ধি তত্ত্ব উপস্থিত করেছেন—অর্থাৎ নাশ এবং উৎপত্তির সন্ধির (শৃঙ্খলা) সঙ্গে যুক্ত হয়ে যেমন জীবনপ্রবাহ এই শরীরে প্রবাহিত তেমনই তার প্রতিসন্ধি (ঐক্য) এক শরীর থেকে অন্য শরীরেও বজায় থাকে। অধিকারী আত্মায় পূর্বের সংস্কার বজায় থাকে না, কিন্তু কক্ষপরিবর্তনশীল তরল বিজ্ঞানে (জীবন) তার বাসনা বা সংস্কার রূপে অসীভূত হতে কোনো অসুবিধা হয় না। ক্ষণিকবাদ সৃষ্টির ব্যাখ্যার জন্য নিঃসন্দেহে যথেষ্ট, কিন্তু ঈশ্বরের কাজ সমাজে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা—শোষিত জনগণকে বিদ্রোহের চেষ্টা থেকে দূরে রাখা। এজন্যই বুদ্ধ কর্মের সিদ্ধান্তকে আরও দৃঢ় করেছেন। ‘গমনাগমন (জন্মমৃত্যু) ধনী-নির্ধনের ভেদাভেদ সেই কর্মের কারণেই ঘটে, যার কর্তা ছিলে তুমি স্বয়ং, যদিও আজ সেই কর্ম তোমার হস্ত নিষ্কিণ্ড তির সদৃশ।’

বুদ্ধের প্রতীত্য-সমুৎপাদ তত্ত্ব প্রাথমিক ভাবে তৎকালীন শাসকবর্গকে কিঞ্চিৎ ভয়ভীত করে তুলেছিল, কিন্তু তারপরেই তাঁর প্রতিসন্ধি ও কর্মের তত্ত্ব তাদের পরম নিশ্চিন্ত করে দেয়। সে কারণেই আমরা বুদ্ধের পতাকাতেলে বড় বড় রাজা-মহারাজা, শ্রেষ্ঠী বণিকদের দেখতে পাই। ভারতবর্ষের বাইরে, শ্রীলঙ্কা, চীন, তিব্বত, জাপানে বৌদ্ধধর্ম প্রসারের কাজে সেখানকার রাজন্যবর্গই অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাঁরা বুঝেছিলেন, এই ধর্ম সামাজিক বিদ্রোহের সম্ভাবনাকে দূর করে সামাজিক সুস্থিতিকেই রক্ষা করবে। দেশ, জাতির সীমারেখা ঘুচিয়ে রাজ্য বিস্তারে এই ধর্ম যথেষ্ট সহায়ক হয়েছে। সমাজে আর্থিক বৈষম্য বজায় রেখেই বুদ্ধ বর্ণভেদ, জাতিভেদ ইত্যাদি প্রথাকে দূর করতে চেয়েছিলেন। যদিও প্রকৃত ভেদাভেদ দূর হয়নি কিন্তু সমাজের নিম্নবর্ণের মানুষ দলে দলে এই ধর্মের প্রতি আনুগত্য দেখিয়েছিল। শ্রেণিদৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে মনে হতে পারে যে এই ধর্ম প্রকৃতপক্ষে শাসকশ্রেণির অন্যতম প্রতিনিধির ভূমিকা পালন করেছে, সামাজিক বৈষম্য দূর করার কথা ঘোষণা না করেও নিজেই ন্যায়ের পক্ষে বলে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছে।

সিদ্ধার্থ গৌতম তাঁর দর্শনকে এইরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে কেন বাধ্য হলেন? এর জন্য তৎকালীন সমাজের বাস্তব পরিস্থিতি কতটা দায়ী ছিল? এ সমস্ত প্রশ্ন উঠতেই পারে। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে, ব্যক্তির উপরে বাস্তব পরিস্থিতির যে প্রভাব সমাজের উপরে আবশ্যিক ভাবে প্রতিফলিত হয়, কখনও কখনও ব্যক্তির ব্যক্তিজীবনের

বাস্তব পরিস্থিতি তার দিশা পরিবর্তনের সহায়ক হয়। প্রথম দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমরা বৌদ্ধ দর্শনের আলোচনা করেছি। বুদ্ধের ব্যক্তিগত জীবনের বাস্তব পরিস্থিতি তাঁর দর্শনের উপরে কী প্রভাব বিস্তার করেছিল তারও বিস্তৃত আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। শারীরিক দিক থেকে বুদ্ধ অত্যন্ত সুস্থ ছিলেন। মানসিক দিকে থেকে তিনি ছিলেন শান্ত, গভীর এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধির এক প্রতিভাশালী বিচারক। মহত্ত্বাকাজ্ঞা তাঁরও ততটাই ছিল, যা একজন আত্মবিশ্বাসী ব্যক্তির থাকা স্বাভাবিক। তিনি তাঁর দার্শনিক বিচারধারার সত্যতায় পূর্ণ আস্থাবান ছিলেন এবং প্রতীত্য-সমুৎপাদ তত্ত্বের মহত্ত্ব সম্যক রূপে অনুধাবন করতেন। তিনি অবশ্য প্রাথমিক স্তরে এরকম আশা করতেন না যে তাঁর বিচারধারা অবিলম্বেই দিগ্বিদিকে ছড়িয়ে পড়বে। এর কারণ, তৎকালীন বিচার বিশ্লেষণ যে ধারায় প্রবাহিত হচ্ছিল, তাতে তিনি অত্যন্ত হতাশ বোধ করতেন। তিনি হয়তো শেষ পর্যন্ত বুঝতেও পারেননি যে তাঁর চিন্তাধারা এবং সেই সময়ের প্রভুবর্গের প্রবৃত্তির মধ্যে আপনার যথেষ্ট সঙ্গাবনা আছে।

বুদ্ধের দর্শনে অনিত্য-অনাত্মবাদের অতিরিক্ত দুঃখবাদেরও একটি স্থান আছে। এই দুঃখবাদের কারণ যদি এখনকার সমাজ-ব্যবস্থা কিংবা বুদ্ধের নিজের চতুষ্পার্শ্বের পরিস্থিতির মধ্যে অনুসন্ধান করি তাহলে দেখতে পাই যে শৈশবেই তাঁকে মাতৃবিয়োগের ব্যথা সহ্য করতে হয়েছিল। তবে তাঁর মাসি প্রজাপতি গৌতমীর স্নেহের ভূমিকা তাঁর জীবনে বড় একটা কম ছিল না। গার্হস্থ্য জীবনে তাঁকে কোনো দুঃখকষ্ট সহ্য করতে হয়েছে এমন কোনো ঘটনার কথা জানা যায় না। একজন ধনী সন্তানের জন্য জীবনে যে সমস্ত সুখভোগের ব্যবস্থা থাকে, সে সবকিছু তাঁর জীবনেও ছিল, কিন্তু সমাজে প্রতিদিন সংঘটিত হওয়া ঘটনা দ্রুত তাঁকে প্রভাবিত করত। বৃদ্ধ, অসুস্থ ও মৃত ব্যক্তিকে দেখে তাঁর মধ্যে বৈরাগ্যের উদয় হওয়া থেকে সেই মনোভাবেরই পরিচয় পাওয়া যায়। দুঃখের কঠোর সত্যতাকে হৃদয়ঙ্গম করার জন্য ওই তিনটি বস্তুর দর্শনই হয়তো যথেষ্ট ছিল না, হয়তো এর চেয়েও বেশি কষ্টের ক্রীতদাস প্রথা কিংবা অসীম দারিদ্র্য তাঁর জীবনে অনুঘটকের কাজ করেছিল, যদিও ইতিহাস থেকে এ বিষয়ে কোনো সাক্ষ্য মেলে না। এর কারণ সুস্পষ্ট—বুদ্ধ সমাজ থেকে দারিদ্র্য এবং দাসপ্রথা থেকে নির্মূল করার কর্মসূচি তাঁর দর্শনের অন্তর্ভুক্ত করেননি। প্রাথমিক পর্বে, ইতিহাস সাক্ষী, দারিদ্র্য, দাসপ্রথার নির্মমতাকে কিছু সহনীয় করে তোলার একটা প্রচেষ্টা বুদ্ধ-সংঘগুলির ছিল। ঋণদাতা উত্তমর্গগণ ঋণ পরিশোধের জন্য অধমর্গের উপযুক্ত সম্পত্তি না থাকলে তাকে শারীরিক ভাবে কিনে নেবার অধিকারী ছিল। সেজন্য বহু ঋণগ্রহীতা দাসত্বের যন্ত্রণা থেকে বাঁচবার জন্য ভিক্ষু হয়ে যেত। এর ফলে শ্রেষ্ঠী-মহাজনদের বুদ্ধ-বিরোধী হয়ে ওঠার আশঙ্কা দেখা দিল। বুদ্ধ তখন ঘোষণা করলেন— ‘ঋণী ব্যক্তিকে প্রবজ্যা (সন্ন্যাস) দেওয়া অনুচিত।’ (মহাবগ্গ ১। ৩। ৪। ৮; গ্রন্থকারের ‘বিনয়পিটক’, হিন্দি, পৃ. ১১৮)।

এরপর ক্রীতদাসের দলও যখন দলে দলে ভিক্ষু হয়ে দাসত্ব এড়াতে লাগল, এবং যথারীতি দাস মালিকের দল শোরগোল তুলল, তখন বুদ্ধ আবার ঘোষণা করলেন—

‘ভিক্ষুগণ! ক্রীতদাসের জন্য প্রবজ্যা অনুচিত।’ (মহাবগ্গ ১। ৩। ৪। ৯; গ্রন্থকারের ‘বিনয়পিটক’, হিন্দি, পৃ. ১১৮)

বুদ্ধের অনুগামী মগধ সম্রাট বিম্বিসারের সৈন্যবাহিনী থেকে দলে দলে সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে অস্বীকার করে প্রবজ্যার আশ্রয় নিতে শুরু করে। রাজশক্তি প্রধানত সামরিক বলের উপরে টিকে থাকে। এই অবস্থার রাজ সিংহাসন টলায়মান হয়ে উঠল। বিম্বিসার তাঁর রাজসভায় মন্ত্রীদের প্রশ্ন করলেন যে যারা সৈনিকদের প্রবজ্যায় উৎসাহ দেয় তাদের কী দণ্ড প্রাপ্য? উত্তর আসে—‘তাদের গুরু শিরশ্ছেদ করা উচিত। অনুশাসকের (ভিক্ষুদীক্ষার বিধিবাক্য পাঠকারী) জিহ্বা উৎপাটিত করা উচিত, এবং গণ- (সংঘ) গুলিকে অবিলম্বে ধুলায় মিশিয়ে দেওয়া উচিত।’ (মহাবগ্গ, ১। ৩। ৪। ২; গ্রন্থকারের ‘বিনয়পিটক’ পৃ. ১১৬-১৭)

বিম্বিসার বুদ্ধের কাছে গিয়ে অভিযোগ জানালেন। বুদ্ধ ঘোষণা করলেন—
‘ভিক্ষুগণ। রাজসৈনিকদের প্রবজ্যা দেওয়া অনুচিত।’

এ ভাবে দুঃখ সত্যের মুখোমুখি হয়ে দুঃখের কারণগুলিকে সমাজ থেকে দূর করার যে প্রশ্ন ছিল, তা ধীরে ধীরে নিঃশেষ হয়ে গেল, শুধু টিকে রইল তাঁর আধ্যাত্মিক আলোচনা। এবং এর ফলে বুদ্ধের দর্শন সম্পদভোগী শ্রেণির কাছে বিষদত্তহীন সর্পের মতো নিষ্ক্রিয় হয়ে গেল।

এ সমস্ত দেখে আমরা এ কথা বলতে পারি যে, তৎকালীন সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যকার দারিদ্র্য এবং দাসপ্রথা বুদ্ধকে দুঃখ সত্য অনুধাবনে সহায়তা করেছিল। দুঃখ দূর করা যায়, এই ধারণায় পৌছে বুদ্ধ প্রতীত্য-সমুৎপাদ তত্ত্বে উপনীত হয়েছিলেন—
ক্ষণিক তথা ‘হেতুপ্রভ’ হওয়ার ফলে তার অন্ত হয়েছে। সংসারে স্পষ্ট দৃশ্যমান দুঃখের হেতুগুলিকে দূর করতে অসমর্থ হয়ে তিনি সেগুলির এক অলৌকিক ব্যাখ্যা উপস্থিত করেছেন।

নাগসেন

(১৫০ খ্রিঃ পূঃ)

সামাজিক পরিস্থিতি

বুদ্ধের জন্মের কিছুকাল আগে থেকেই উত্তর ভারতের সামন্তবর্গ রাজ্য বিস্তারের লক্ষ্যে পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল। দু-তিন পুরুষ আগেই কোশল রাজ্য কাশী জনপদকে গ্রাস করে নিয়েছিল। বুদ্ধের সময়েই বিহিসার অঙ্গরাজ্যকে মগধে বিলীন করে নেয় যার ফলে তখনকার মগধের রাজ্যসীমা বিক্র্য পর্বতমালা অতিক্রম করে অবন্তী (উজ্জয়িনী) পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। বৎসরাজ্য (কোশ্চাষী-এলাহাবাদ) সে সময় মধ্য ভারতের অন্যতম বৃহৎ রাজ্য হিসাবে গণ্য হত। তখনকার পাঁচটি মহাশক্তি ছিল—কোশল, মগধ অবন্তী, বৎস এবং লিচ্ছবী (বৈশালী) প্রজাতন্ত্র। আর্যরা বিভিন্ন অঞ্চল জয় করে তাকে এক একটি জনপদরূপে প্রতিষ্ঠা করেছিল। আর্যদের এই জনপদগুলিতে, একদিকে জনপদগুলির প্রাচীন অধিবাসী এবং অন্যদিকে অন্যান্য প্রতিবেশী এই উভয়ের সঙ্গে নিত্য সংঘর্ষ লেগেই থাকত। এই নিত্য সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে কোনো কোনো জনপদ অধিকতর শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। বহুদিন পর্যন্ত এই জনপদগুলির কোথাও রাজতন্ত্র কোথাও প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল। উপনিষদের যুগেও আমরা এই জনপদগুলিকে দেখতে পাই তবে তা প্রজাতন্ত্র রূপে নয়, আরও অধিকতর সাম্য স্বাধীন গণতান্ত্রিক রূপে। বুদ্ধের কালে এই জনপদগুলি আপন আপন সীমানা ভাঙছিল, এবং অনেক জনপদ মিলিত হয়ে রাজ্যরূপে গড়ে উঠেছিল। বণিকশ্রেণি তাদের বাণিজ্যিক প্রয়োজনে অনেক আগে থেকেই এই সীমারেখাকে অগ্রাহ্য করেছিল। একাধিক রাজ্যে তাদের বাণিজ্যিক স্বার্থ থাকায় তারা এরকম করতে বাধ্য হয়েছিল। ছোট ছোট জনপদ মিলিত হয়ে রাজ্যরূপে গড়ে ওঠার জন্য শ্রেষ্ঠী-বণিকশ্রেণি যথাসাধ্য সহায়তা করেছিল। মগধের শ্রেষ্ঠী ধনঞ্জয় (বিশাখার পিতা) সাকেতে (অযোধ্যায়) তাঁর বাণিজ্যের এক শাখা স্থাপন করেছিলেন। এ ভাবেই, যখন বণিকেরা তাদের পণ্যসম্ভারের সাহায্যে এবং রাজন্যবর্গ তাদের সামরিক বলে জনপদের সীমানা ভাঙার অভিযানে নামে, তখন যে ধর্ম কিংবা ধার্মিক বিচার তাদের এই ঈঙ্গিত কাজের সহায়ক হয়েছিল, তারা স্বাভাবিক ভাবেই সেই দর্শনের প্রচারে উৎসাহী হয়েছিল। বৌদ্ধধর্ম সাফল্যের সঙ্গে এই কাজ করেছিল, যদিও তা হয়তো শ্রেষ্ঠ-বণিকদের স্বর্ণমুদ্রার প্রলোভনে কিংবা রাজন্যবর্গের সামরিক বলের কাছে নতি স্বীকার না করেই।

বুদ্ধের নির্বাণের তিন বছর পর (৪৮০ খ্রিঃ পূঃ) অজাতশত্রু (মগধ লিচ্ছবী) প্রজাতন্ত্রকে ধ্বংস করে এবং তার রাজত্বকালে মগধের সীমা একদিকে কোশী থেকে যমুনা, আর-একদিকে হিমালয় থেকে বিদ্যাচল পর্যন্ত প্রসারিত হয়।

তৎকালীন বুদ্ধিবাদীদের অধিকাংশই সমকালীন ছয় জন তীর্থঙ্করের বিচার বিশ্লেষণের চেয়ে বৌদ্ধ দর্শন সম্বন্ধে বেশি আগ্রহী হয়েছিল, কারণ এই দর্শন জনপদ জাতি ও বর্ণের সীমাবদ্ধতাকে স্বীকার করেনি। তৎকালীন প্রচলিত দার্শনিক বিচার প্রবাহের চরম রূপ ছিল বৌদ্ধ দর্শন। তখনকার বহু ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বিশ্লেষক এই দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাছাড়াও বৌদ্ধ ভিক্ষুদের আদর্শবাদ, ত্যাগ, তিতিক্ষা এবং অত্যন্ত সরল জীবনযাপন ইত্যাদি বিষয়গুলিও তখনকার জনমানসে গভীর ছাপ রেখেছিল, বিশ্বাসের বংশের পর মগধের রাজসিংহাসনে আসীন হয় নন্দবংশ। তাদের রাজত্বকালে মগধের রাজ্যসীমা উত্তর পশ্চিমে শতদ্রু পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। যেহেতু আগের রাজবংশ বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে উৎসাহী ছিলেন সেজন্য নন্দবংশ বৌদ্ধধর্মের প্রতি আগ্রহ দেখায়নি, কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনপদগুলিকে একত্রিত করে এক বৃহৎ সাম্রাজ্য গড়ার জন্য যে নৈতিক সমর্থন বৌদ্ধ দর্শন এযাবৎকাল জুগিয়ে এসেছিল তাকেও তারা একেবারে অস্বীকার করতে পারেনি। বুদ্ধের জীবদ্দশাতেই মগধে বৌদ্ধধর্ম বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল, এমনকী রাজধর্ম রূপে স্বীকৃত হয়েছিল। অতঃপর মগধ রাজ্যের শাসন এবং প্রভাব যে ভাবে বিস্তার লাভ করে, বৌদ্ধধর্মও সেই সঙ্গে আরও নতুন নতুন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। নন্দবংশের অন্তিমলগ্নে গ্রিক সম্রাট আলেকজান্ডার উত্তর পশ্চিম ভারতের পাঞ্জাব অঞ্চলে অভিযান চালায়। যদিও সেই অঞ্চলে গ্রিক শাসন বেশিদিন স্থায়ী হয়নি, কিন্তু এই অভিযানের পরবর্তীকালে ভারতে প্রচুর গ্রিক সৈন্য, বণিক, শিল্পী, কারিগর বসবাস আরম্ভ করে। এই আত্মাভিমानी 'ম্লেচ্ছ' জাতিকে ভারতীয় জাতিসত্তার মূল স্রোতে নিয়ে আসার সুকঠিন কাজেও বৌদ্ধরাই অগ্রণী হয়েছিল। যবন সম্রাট মিনান্দর এবং শক সম্রাট কনিষ্ক যে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন, তা নেহাতই কোনো আকস্মিক ঘটনা ছিল না, বরং এর দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে জনপদে, রাজ্যে রাজ্যে, আর্য এবং ম্লেচ্ছদের মধ্যে যোগসূত্র রচনার কাজে বৌদ্ধধর্ম সার্থক এবং সমর্থক ভূমিকা পালন করেছিল।

গ্রিক ও ভারতীয় দর্শনের সমাগম

ভারতীয়দের মতো গ্রিকরাও সে সময় সভ্যতা এবং সংস্কৃতিতে এক অগ্রগণ্য জাতি হিসাবে পরিচিত ছিল। দর্শন, কলা, বাণিজ্য, রাষ্ট্রনীতি এই সমস্ত বিষয়ে তারা প্রায় ভারতীয়দের সমপর্যায়ে ছিল; কিন্তু ভাষ্কর্য এবং নাট্যশাস্ত্র ইত্যাদি বিষয়ে তারা ভারতীয়দের চেয়েও এগিয়ে ছিল। দর্শনশাস্ত্রের নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলি গ্রিক দার্শনিকদেরই আবিষ্কার এবং পরবর্তীকালে কোনোরকম স্বাণ স্বীকার না করেই এগুলিকে ভারতীয় দর্শনের অঙ্গীভূত করে নেওয়া হয়।

বাদ	দার্শনিক	সময় খ্রিঃ পূঃ
আকৃতিবাদ	পিথাগোরাস	৫৭০-৫০০
ঋণিকবাদ	হেরাক্লিটাস	৫৩৫-৪৭৫
বীজবাদ	অনখাগোর	৫০০-৪২৮
পরমাণুবাদ	ডেমোক্রিটাস	৪৬০-৩৭০
বিজ্ঞান (= আকৃতি)	প্লেটো	৪২৭-৩৪৭
বিশেষ	"	
সামান্য (= জাতি)	"	
মূল স্বরূপ	প্লেটো	
সৃষ্টিকর্তা	"	
উপাদান কারণ, নিমিত্ত কারণ	অ্যারিস্টটল	৩৮৪-৩২২
তর্কশাস্ত্র	"	
বস্তু	"	
গুণ	"	
কর্ম	"	
দিশা	"	
কাল	"	
পরিমাণ	"	
আসন	"	
স্থিতি	"	

উপরোক্ত দার্শনিক বিচারগুলি ভারতীয় দর্শনের উপরে কতদূর প্রভাব ফেলেছিল সে বিষয়ে আমরা পরবর্তী পর্যায়ে আলোচনা করব, আমাদের এটাও স্মরণে রাখা প্রয়োজন যে, হেরাক্লিটাস, প্লেটো, অ্যারিস্টটলের দর্শন চিন্তার সঙ্গে সম্যক পরিচয় আছে, এমন বহু গ্রিক ভারতে বসবাস করছিল এবং বৌদ্ধ দর্শনের মহত্বকে তারা সহজেই অনুধাবন করতে পেরেছিল।

এরকম একটি সময়ে, যখন শাসিত পাঞ্জাবে নাগসেনের জন্ম হয়।

নাগসেনের জীবনী

‘মিলিন্দ প্রশ্নে’ (‘মিলিন্দ প্রশ্ন’, অনুঃ. ভিক্ষু জগদীশ কাশ্যপ, ১৯৩৭) নাগসেনের জীবনপঞ্জি সম্বন্ধে যেটুকু পাওয়া যায়, তাতে অনুমান করা হয় যে পাঞ্জাবের উত্তরাঞ্চলে হিমালয় পর্বত সংলগ্ন অঞ্চলে কজঙ্গল গ্রামের সোমুন্ডর ব্রাহ্মণের ঘরে নাগসেন জন্মগ্রহণ করেন। পিতৃগৃহে থাকার সময় তিনি ব্রাহ্মণদের অবশ্য শিক্ষণীয় বেদ, ব্যাকরণ ইত্যাদি পাঠ সমাপ্ত করেন। এর পর রোহণ নামের এক জ্ঞানী ভিক্ষুর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় এবং তাঁর কাছ থেকেই নাগসেন বৌদ্ধ দর্শন সম্বন্ধে জানতে পারেন। অতঃপর তিনি রোহণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং গুরুর সঙ্গে বিজ্ঞবস্তু হয়ে হিমালয়ের রক্ষিতবল নামে এক

স্থানে চলে যান। সেখানেই তিনি তৎকালীন প্রথানুযায়ী গুরুর কাছ থেকে সমস্ত বৌদ্ধ শাস্ত্র কণ্ঠস্থ করেন। আরও জ্ঞানলাভের ইচ্ছায় তিনি গুরুর অনুমতি নিয়ে পদব্রজে বর্তনীয়াতে চলে যান এবং সেখানকার এক জ্ঞানী পণ্ডিত অশ্বগুপ্তের নিকটে উপস্থিত হন। অশ্বগুপ্ত তাঁর এই নতুন বিদ্যার্থীকে নানা ভাবে পরীক্ষা করেছিলেন। এই সময়ে একদিন কোনো এক গৃহস্থের আবাসে, তৎকালীন প্রথানুযায়ী ভোজনোত্তর ধর্মোপদেশ দেবার ভার পড়ে নাগসেনের উপর। সেই ধর্মালোচনার মধ্যেই নাগসেন তাঁর অনন্য প্রতিভার পরিচয় রাখেন। অশ্বগুপ্ত এই তরুণ প্রতিভাবান শিষ্যকে আরও যোগ্যতর হাতে সমর্পণের জন্য তাঁকে পাটলিপুত্রের অশোকারাম বিহারের আবাসিক আচার্য ধর্মরক্ষিতের কাছে যেতে উপদেশ দিলেন। তখনকার দিনে কয়েক শত যোজন দূরের পাটলিপুত্র নগরে পদব্রজে যাওয়া খুব সহজসাধ্য ব্যাপার ছিল না। কিন্তু নানা প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও বৌদ্ধ ভিক্ষুরা সে পথে সর্বদা যাতায়াত করতেন। নাগসেন এক সার্থবাহ দলের যাত্রী হন। সেই সার্থবাহ দলের প্রভু অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে সেই তরুণ বিদ্যার্থীকে যাত্রাসঙ্গী করে নেন এবং তার আহাৰ্য পানীয়ের দায় বহন করেন। অশোকারামে আচার্য ধর্মরক্ষিতের নিকট থেকে নাগসেন বৌদ্ধ তত্ত্বজ্ঞান এবং সমস্ত পিটকের পূর্ণ অধ্যয়ন করেন। ইতিমধ্যে পাঞ্জাব থেকে তাঁর ডাক আসায় তিনি রক্ষিতবলে ফিরে যান। (বর্তনীয়; কজ্জল এবং সম্ভবত বিজৃম্ববস্তু শিয়ালকোট জেলাতে অবস্থিত ছিল)

মিনান্দারের (মিলিন্দ) রাজ্য যমুনা থেকে আমুদরিয়া (বক্ষু) পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বলখ (বাহল্লীক) ছিল তাঁর অন্যতম এক রাজধানী। কিন্তু সমস্ত ঐতিহাসিক পরম্পরা বিচার বিশ্লেষণ করে এ কথা নিশ্চিত করে বলা যায় যে শালখ (শিয়ালকোট) নগরীও তাঁর আরেকটি রাজধানীর মধ্যে গণ্য হত। পুতাকের লেখা থেকে আমরা জানতে পারি যে মিনান্দার ছিলেন একজন বিদ্বান, ন্যায়পরায়ণ এবং জনপ্রিয় সম্রাট। মিনান্দারের মৃত্যুর পর তাঁর অস্থির অবশিষ্ট নিয়ে তাঁর প্রজাদের মধ্যে তুমুল গোলযোগের সৃষ্টি হয়েছিল, অবশেষে অস্থিখণ্ডগুলির উপরে বৃহৎ বৃহৎ স্তূপ নির্মাণ করা হয়েছিল। মিনান্দারের শাস্ত্রচর্চা এবং বিতর্ক করার প্রবণতা ছিল এবং সেজন্য সাধারণ মানের পণ্ডিতেরা তাঁকে এড়িয়ে চলতেন। একদিন জনৈক ভিক্ষু বললেন—‘নাগসেন, রাজা মিলিন্দ নানা বিতর্ক তুলে, প্রশ্নাবলি নিক্ষেপ করে ভিক্ষু সংঘকে উত্তর দিতে বাধ্য করে, অপমান করে। একমাত্র তুমিই পারো এই রাজাকে তার এই কাজের জন্য যথোচিত শিক্ষা দিতে।’

নাগসেন সংঘের আদেশানুসারে সাকল নগরে অসংখ্যে নামের এক মঠে (পরিবেণ) গিয়ে পৌঁছালেন। এর কিছুদিন আগেই সেখানকার একজন খ্যাতনামা পণ্ডিত আয়ুপালকে মিনান্দার বিতর্কে পরাজিত করেছিলেন। নাগসেনের আগমন সংবাদ নগরের চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। মিনান্দার তাঁর এক অমাত্য দেবমতীর (সম্ভবত গ্রিক ভাষায় ডিমিত্রি) মাধ্যমে নাগসেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার অভিপ্রায় জানালেন। তারপর একদিন পাঁচশো যবন পাত্রমিত্র সহকারে সুসজ্জিত রথে আরোহণ করে অসংখ্যে পরিবেণেতে উপস্থিত হলেন। মিনান্দার নাগসেনকে প্রণাম ও অভিনন্দন জানিয়ে প্রশ্ন

গুরু করলেন। এই প্রশ্নাবলির কারণেই গ্রন্থের নামকরণ হয়েছে ‘মিলিন্দ প্রশ্ন’। পালি ভাষায় উপলব্ধ ‘মিলিন্দ-প্রশ্ন’-তে ছয়টি পরিচ্ছেদ আছে যার মধ্যে তিনটিকে প্রাচীন মনে করা হয়। চিনা ভাষাতেও এই তিনটির অনুবাদই পাওয়া যায়। মিনান্দার প্রথম দিন মঠে গিয়ে নাগসেনকে প্রশ্ন করেছিলেন। দ্বিতীয় দিন তিনি নাগসেনকে প্রাসাদে আমন্ত্রণ জানান এবং প্রশ্ন করেন।

দার্শনিক বিচার

মিনান্দারের প্রশ্নের উত্তরে নাগসেন বুদ্ধ দর্শনের অনাত্মবাদ, কর্ম এবং পুনর্জন্ম নামরূপ (= মন এবং মৌলিক বস্তু), নির্বাণ ইত্যাদিকে বিশেষ ভাবে ব্যাখ্যা করেন।

(১) অনাত্মবাদ—মিনান্দার প্রথমে বুদ্ধের অনাত্মবাদকে পরীক্ষা করেন। তিনি প্রশ্ন করেন (‘মিলিন্দ প্রশ্ন’ ২।১; অনু, পৃ. ৩০-৩৪)—

(ক) ‘ভন্তে, (স্বামীন্) আপনি কোন নামে পরিচিত?’

‘নাগসেন নামে লোকে আমাকে ডাকে। কিন্তু সেটা কেবল ব্যবহারিক সংজ্ঞা মাত্র, কারণ প্রকৃতপক্ষে এরকম কোনো পুরুষের (আত্মার) অস্তিত্ব নেই।’

‘ভন্তে! যদি প্রকৃতই কোনো পুরুষ না থাকে, তাহলে কে আপনাকে আহাৰ্য, পরিধেয় যোগায়? কে শীল (সদাচার) রক্ষা করে? কে ধ্যান অভ্যাস করে? কে আৰ্যমার্গের ফল, নির্বাণের সম্মুখীন হয়? যদি এরকমই হয় তাহলে তো পাপ বলেও কিছু নেই, পুণ্য বলেও কিছু নেই। পাপ করার জন্যও কেউ নেই পুণ্য করার জন্যও কেউ নেই। পাপেরও কোনো ফল নেই পুণ্যেরও কোনো ফল হয় না? যদি কেউ আপনাকে হত্যা করে তাহলে সেটা কাউকে হত্যা করা হয় না। (পুনরায়) তবে নাগসেন কী? এই কেশরাশিই কি নাগসেন?’

‘না মহারাজ।’

‘এই নখ, দন্ত, ত্বক, মাংস, স্নায়ু, অস্থি, মজ্জা, বৃক্ক, হৃদয়, যকৃৎ, প্লিহা, ফুসফুস, অন্ত্র, পাকস্থলি, উদ্বর, মল, মূত্র, পিত্ত, কফ, রক্ত, স্বেদ, মেদ, অশ্রু, নাসামল, কর্ণমল, মস্তিষ্কই কি নাগসেন?’

‘না মহারাজ!’

‘তবে কী আপনার রূপ? (ভৌতিক তত্ত্ব) ..বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার কিংবা বিজ্ঞানই নাগসেন?’

‘না মহারাজ!’

‘তবে কি রূপ, বিজ্ঞান (= পঞ্চস্কন্ধ) সব মিলেই কি নাগসেন?’

‘না মহারাজ!’

‘...তবে কী—রূপ আদি ভিন্ন কিছু নাগসেন?’

‘না মহারাজ!’

‘ভন্তে! আমি আপনাকে প্রশ্ন করতে করতে ক্লান্ত কিন্তু এখনও জানতে পারিনি যে নাগসেন কী? তাহলে কি নাগসেন নিছক এক শব্দমাত্র? আসলে নাগসেন কে?’

‘মহারাজ! আপনি কি এখানে পদব্রজে এসেছেন না কোনো বাহনের সাহায্যে!’

‘ভন্তে! আমি রথারূঢ় হয়ে এখানে এসেছি।’

‘মহারাজ! তাহলে আমাকে বলুন আপনার রথ কোথায়? তবে কি হরিসই (= ঈশ্বর) রথ?’

‘না ভন্তে।’

‘তবে কি অশ্বই রথ?’

‘না ভন্তে।’

‘তবে কি চক্রদ্বয় রথ?’

‘না ভন্তে।’

‘রথের সাজসজ্জা, লাগাম, দড়িদড়া, চাবুক কি রথ?’

‘না ভন্তে!’

‘তাহলে কি মহারাজ ওই ঈশ্বর ইত্যাদি একত্রে রথ?’

‘না ভন্তে!’

‘তাহলে এগুলির বাইরের কোনো বস্তু রথ?’

‘না ভন্তে।’

‘মহারাজ! আমি প্রশ্ন করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি কিন্তু এখনও জানতে পারিনি যে রথ কী? তবে কি রথ একটি শব্দমাত্র? এই রথ আদতে কী? আপনি মিথ্যা বলছেন যে এগুলির কোনোটি রথ নয়। মহারাজ সমগ্র জম্বুদ্বীপের (ভারতবর্ষ) সম্রাট আপনি, কার ভয়ে আপনি মিথ্যা বলছেন?’

‘ভন্তে নাগসেন! আমি মিথ্যা বলছি না। ওই সমস্ত বস্তুর সম্মিলিত রূপকে ব্যবহারিক প্রয়োজনে রথ নামে আখ্যায়িত করা হয়।’

‘মহারাজ! অত্যন্ত ঠিক আপনি, জেনেছেন রথ কী? ঠিক ওইরকমই আমার কেশ ইত্যাদি বিভিন্ন সম্মিলিত রূপকে ব্যবহারের জন্য নাগসেন নামে ডাকা হয়। কিন্তু পরম অর্থে নাগসেন নামে কোনো পুরুষ বিদ্যমান নেই। ভিক্ষুণী বজ্রা ভগবানের সামনে এজন্যই বলেছিলেন—যেমন অবয়বের ভিত্তিতে ‘রথ’ সংজ্ঞা হয় তেমনই (রূপ ইত্যাদি) স্বাক্ষের ভিত্তিতে এক সত্ত্ব (= জীব) মনে করা হয়।’ (সংযুক্তনিকায়, ৪।১০।৬)

(খ)—‘মহারাজ!’ ‘প্রাণ নেওয়া’ বিজ্ঞানের পরিচয় ‘ঠিকমতো বুঝে নেওয়া’ প্রজ্ঞার পরিচায়ক। আর ‘জীব’ সেরূপ কোনো বস্তু নয়।’

‘ভন্তে! যদি জীব কোনো বস্তু নাই হয়, তবে এটা আমাদের মধ্যে কী? যা চক্ষু দিয়ে রূপদর্শন করে, কর্ণ দিয়ে শব্দ শোনে, নাসিকা দিয়ে আত্মাণ নেয়, জিহ্বা দিয়ে আত্মদ গ্রহণ করে, শরীর দ্বারা স্পর্শ করে, এবং মন দিয়ে ধর্মকে জানে।’

‘মহারাজ! যদি শরীর থেকে ভিন্ন কোনো জীব আমাদের অভ্যন্তরে থাকে যে চক্ষুর সাহায্যে রূপদর্শন করে; তাহলে শরীর থেকে অক্ষিগোলক বের করে নিলে অক্ষিগোলকের ছিদ্র দিয়ে সে নিশ্চয়ই আরও ভালোভাবে রূপদর্শন করতে পারবে? কর্ণচ্ছেদন করে দিলে তার বৃহৎ ছিদ্র দিয়ে আরও ভালোভাবে শুনতে পারা উচিত,

নাসিকা ছেদন করলে আরও ভালোভাবে আঘাণ নিতে পারা উচিত। জিহ্বা কেটে নিলে ভালোভাবে আশ্বাদ নিতে পারবে আর শরীর কেটে নিলে স্পর্শসুখ আরও ভালোভাবে অনুভূত হওয়া উচিত।’

‘না ভণ্ডে! এমন কথা নয়।’

‘মহারাজ! তাহলে আমাদের অভ্যন্তরে কোনো জীবও নেই।’

(২) কর্ম অথবা পুনর্জন্ম—আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করার পর সং-অসং কর্মের দায়িত্বভার এবং তদনুসারে পরলোকে সুখদুঃখ কী ভাবে ভোগ্য হবে, এই বিষয়ের অবতারণা করে মিনাদার প্রশ্ন করেন—

‘ভণ্ডে! কে জন্মগ্রহণ করে?’

‘মহারাজ! নাম (বিজ্ঞান) এবং রূপ।’

‘তবে কি সেই নাম-রূপই জন্মগ্রহণ করে?’

‘মহারাজ! সেই নাম-রূপ জন্মগ্রহণ করে না। মানুষ এই নাম-রূপের দ্বারা পাপ অথবা পুণ্য করে এবং সেই কর্মের কারণে অন্য নাম-রূপ জন্মগ্রহণ করে।’

‘ভণ্ডে! তবে তো প্রথম নাম-রূপ তার নিজের কর্ম থেকে মুক্ত হয়ে যায়।’

‘মহারাজ! যদি আবার জন্মগ্রহণ না করে, তাহলে মুক্ত হয়ে যায়, কিন্তু যেহেতু আবার জন্মগ্রহণ করে, সেজন্যই মুক্ত হয় না।’

‘...উপমা দিয়ে বলুন...!’

(ক) আম চুরি—কোনো ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তির আম চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ল। আমগাছের মালিক ধৃত ব্যক্তিকে রাজসকাশে নিয়ে গেল। —‘রাজেন! এই ব্যক্তি আমার আম চুরি করেছে।’ এরপর আম চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তি বলল— ‘না রাজন! আমি ওর আম চুরি করিনি। এই ব্যক্তি যে আম লাগিয়েছিল আর আমি যে আম নিয়েছি তা সম্পূর্ণ ভাবে ভিন্ন...।’ ‘মহারাজ! উক্ত ব্যক্তির শাস্তি হওয়া উচিত কি অনুচিত?’ (সংযুক্তনিকায় অনু. পৃ. ৫৭-৬০)।

‘...শাস্তি হওয়া উচিত।’

‘কী কারণে?’

‘ভণ্ডে! উক্ত ব্যক্তি যাই বলুক না কেন অপরের আম চুরির জন্য তার শাস্তি অবশ্যই হওয়া উচিত।’

‘মহারাজ! এ ভাবেই মানুষ তার নাম ও রূপের মাধ্যমে পাপ কিংবা পুণ্য করে। ওই কর্ম থেকেই দ্বিতীয় নাম-রূপের জন্ম। সেজন্যই সে নিজ কর্ম থেকে মুক্ত হয় না।’

(খ) অগ্নির প্রসার—‘মহারাজ!...কোনো ব্যক্তি শীতের রাত্রিতে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে শরীরে উত্তাপ গ্রহণ করে এবং পরে সেই অগ্নিকে নির্বাপিত না করেই স্থানান্তরে চলে যায়। সেই অগ্নি প্রসারিত হয়ে অপর এক ব্যক্তির খেত ধ্বংস করে। অগ্নি প্রজ্জ্বলনকারী ব্যক্তিকে ধরে রাজসকাশে নিয়ে আসা হলে, সে আত্মপক্ষ সমর্থন করে বলে, ‘আমি যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করেছিলাম সেই অগ্নি আর এই খেত দাহনকারী অগ্নি এক নয়, ভিন্ন। অতএব আমার কোনো শাস্তি হওয়া উচিত নয়। এবার মহারাজ বলুন? ওই ব্যক্তির শাস্তি প্রাপ্য কি নয়?’

‘নিশ্চয়ই শান্তি হওয়া উচিত। তারই প্রজ্বলিত অগ্নি প্রসারিত হয়ে অপরের খেত ধ্বংস করেছে।’

(গ) প্রদীপ থেকে আগুন লাগা—‘মহারাজ! কোনো ব্যক্তি জ্বলন্ত প্রদীপ নিয়ে তার বসতবাটার ছাদে উঠে ভোজনে প্রবৃত্ত হয়। জ্বলন্ত প্রদীপ থেকে কয়েকটি তৃণখণ্ডে আগুন লাগে। সেই তৃণখণ্ডের আগুন সারা গৃহময় ছড়িয়ে যায় এবং অবশেষে সমস্ত গ্রাম অগ্নিদগ্ধ হয়। গ্রামবাসীরা প্রথমোক্ত ব্যক্তিকে ধরে জিজ্ঞাসা করে, তুমি সমস্ত গ্রামে আগুন লাগালে কেন? উত্তরে সেই ব্যক্তি বলে গ্রামের অগ্নিকাণ্ডের জন্য আমি দায়ী নই। আমার প্রদীপের আলো ছিল ভিনু, যার আলোকে আমি ভোজন করেছি আর গ্রাম জ্বলেছে অন্য আগুনে। এরপর ধরুন তারা এ বিষয়ে বিতর্ক করতে করতে আপনার কাছে গেল, তখন আপনি কী বিচার করবেন মহারাজ?’

‘ভন্তে! আমার বিচার হবে গ্রামবাসীদের পক্ষে।’

‘মহারাজ! ঠিক এ ভাবেই, যদিও মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে একটি নাম ও রূপের বিলয় হয় কিন্তু আবার জন্মের পর অন্য নাম-রূপে প্রকাশিত হয়। যদিও তার উৎস তার পূর্বের নাম-রূপ, সেজন্যই সে আপন কর্ম থেকে মুক্ত হয় না।’

(ঘ) বিবাহিতা কন্যা—‘মহারাজ! কোনো ব্যক্তি কিছু অর্থ ব্যয় করে একটি বালিকাকে বিবাহ করে এবং তাকে রেখে দূর দেশে চলে যায়। সময়ের ব্যবধানে বালিকা যৌবনে পদার্পণ করে। এমতাবস্থায় অপর এক ব্যক্তি এসে কিছু অর্থব্যয়ে সেই কন্যাকে বিবাহ করল। এরপর প্রথম ব্যক্তি দেশান্তর থেকে ফিরে এসে বলল, ‘কেন তুমি আমার বিবাহিতা স্ত্রীকে গৃহের বাইরে এনেছ?’ উত্তরে দ্বিতীয় ব্যক্তি জানাল যে, সে (প্রথম ব্যক্তি) যাকে অর্থব্যয় করে বিবাহ করেছিল সে ছিল বালিকা আর দ্বিতীয় ব্যক্তি যাকে বিবাহ করেছে সে এখন যুবতী নারী। উভয়ে কখনও এক নয়। এখন মহারাজ উভয়পক্ষ যদি এই বিবাদ নিয়ে আপনার সমীপে উপস্থিত হয় তাহলে আপনি কীরকম ন্যায় বিধান করবেন?’

‘...অবশ্যই প্রথম ব্যক্তির পক্ষে? কারণ সেই বালিকাই সময়ের নিয়মে যুবতী হয়েছে।’

(ঙ)—‘ভন্তে! যা উৎপন্ন হয়েছে তা কি সেই ব্যক্তি না অন্য কেউ?’ (সংযুক্তনিকায়, ২।২।৯; অনুঃ পৃ. ৪৯)।

‘না, সে, না দ্বিতীয়। যখন আপনি অত্যন্ত শিশু অবস্থায় ছিলেন, বিছানায় চিত হয়ে শয়ান থাকতেন, আর এখন পরিণত বয়সের আপনি মহারাজ, সেই একই আছেন কি?’

‘না ভন্তে! বর্তমানের আমি তখনকার অবস্থা থেকে পরিবর্তিত হয়েছে।’

‘মহারাজ! যদি আপনি সেই শিশু না হন, তাহলে এখন আপনার কোনো পিতামাতা নেই, কোনো গুরুও নেই।...কারণ সেই অর্থে গর্ভের ভিনু ভিনু অবস্থায় ভিনু ভিনু মা হবে। বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে মাও ভিনু হয়ে যাবে। বিদ্যার্থী ছাত্র এবং শিক্ষান্তের পর ছাত্র, উভয়ে ভিনু। অপরাধী কেউ হবে আর তার জন্য অন্য কোনো ব্যক্তির হাত পা খণ্ডিত হবে।’

‘ভন্তে! এর দ্বারা আপনি কি বোঝাতে চাইছেন?’

‘মহারাজ! আমি শৈশবে এক ছিলাম আর বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে আর-এক হয়েছি। কিন্তু পরিবর্তনের সমস্ত অবস্থা এই শরীরেই সংঘটিত হয়েছে এবং সেজন্যই সমস্ত বিষয়টিকে এক করে নেওয়া হয়।’

‘যদি কোনো ব্যক্তি প্রদীপ জ্বালে, তাহলে সেই প্রদীপ সমস্ত রাত্রি ধরে জ্বলবে তো?’

‘...নিশ্চয়ই সারারাত জ্বলবে।’

‘মহারাজ রাত্রির প্রথম প্রহরে যে শিক্ষা থাকবে, সেই শিক্ষাই কি দ্বিতীয়, তৃতীয় প্রহরেও বর্তমান থাকবে?’

‘না ভন্তে।’

‘মহারাজ? তাহলে কি সেই প্রদীপ প্রথম প্রহরে ভিন্, দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রহরে ভিন্‌তর হয়ে যাবে।’

‘না ভন্তে! সেই এক প্রদীপই সারারাত জ্বলবে।’

‘মহারাজ! তেমনই কোনো বস্তুর অস্তিত্ব উপলক্ষে এক অবস্থা উৎপন্ন হয়, একলয় উৎপন্ন হয়—আর এ ভাবেই প্রবাহ জারি থাকে। একটি প্রবাহের দুই অবস্থার (উৎপন্ন এবং লয়) মধ্যে এক মুহূর্তেরও ব্যবধান থাকে না। কারণ একটি লয় হওয়ার মুহূর্ত থেকেই আরেকটি উৎপন্ন হয়। এর কারণ না ওই জীব, না দ্বিতীয় কোনো জীব। এক জনের অস্তিম বিজ্ঞানের (= চেতনা) লয় হওয়া মাত্রই দ্বিতীয় জনের প্রথম বিজ্ঞান উঠে দাঁড়ায়।’

(চ) ...‘ভন্তে! যখন এক নাম-রূপ থেকে কোনো সৎ কিংবা অসৎ কর্ম করা হয়, তখন কর্ম কোথায় অবস্থান করে?’

‘মহারাজ যেমন জীবকে তার প্রতিচ্ছবি (ছায়া) সর্বদা অনুসরণ করে, কর্মও তেমন অনুসরণ করে।’

‘ভন্তে! এই কর্মকে কি দেখানো যায়, কোথায় তার অবস্থান।’

‘মহারাজ! একে সে ভাবে দেখানো যায় না। কেউ কি বৃক্ষের সেই ফলটিকে দেখাতে পারে, যা এখনও ফলেনি।’

(৩) নাম ও রূপ—বুদ্ধ বিশ্বের মূল তত্ত্বকে বিজ্ঞান (=নাম) এবং বস্তু (=রূপ) এই দু’ভাগে ভাগ করেছেন। এ বিষয়ে মিনাম্দার প্রশ্ন করেন—

‘ভন্তে! নাম কী বস্তু এবং রূপ কী বস্তু?’

‘মহারাজ! যত স্থূল বস্তু আছে তা সমস্তই রূপ; আর যত সূক্ষ্ম মানসিক ধর্ম আছে, তা সবই নাম। উভয়ে উভয়ের আশ্রিত। একে অপরের সাহচর্য ব্যতিরেকে অবস্থান করতে পারে না। উভয়ে সর্বদাই একত্রে বর্তমান থাকে। যদি কুক্কুটের গর্ভে বীজরূপে কোনো কিছু না থাকে তাহলে সেখানে কোনো ডিম্বও জন্মাবে না। কারণ ওই বীজ ও ডিম্ব একে অপরের আশ্রিত। উভয়ে একই সঙ্গে অবস্থান করে এবং এই প্রবাহ প্রকৃতিতে প্রথম থেকেই চলে আসছে।’

(৪) নির্বাণ—(সংযুক্তনিকায়, ৩। ১। ৬; অনুঃ পৃ. ৫৮) নির্বাণ সম্বন্ধে মিনান্দার প্রশ্ন করেন, ‘ভন্তে! রুদ্ধ হয়ে যাওয়াই কি নির্বাণ?’

‘হ্যাঁ মহারাজ! রুদ্ধ (বদ্ধ) হওয়াই নির্বাণ। অজ্ঞানী বিষয় উপভোগে লিপ্ত থাকে এবং তা থেকে আনন্দ গ্রহণ করে ও তাতেই মগ্ন থাকে। আসক্তিতে লিপ্ত অজ্ঞানী এই ধারার মধ্যেই অবস্থান করে এবং বারবার জন্মগ্রহণ করে, বুদ্ধ হয়, মৃত্যুবরণ করে, শোক ভোগ করে, অশ্রুপাত করে। দুঃখ, কষ্ট, পরিশ্রান্তি কখনওই তাকে ত্যাগ করে না। সে দুঃখ থেকে ততোধিক দুঃখে পতিত থাকে। মহারাজ! জ্ঞানী ব্যক্তি কিন্তু বিষয় ভোগে লিপ্ত থাকে না; ফলে তার তৃষ্ণা রুদ্ধ হয়ে যায়। উপাদান (ভোগ) রুদ্ধ হয়ে গেলে গমনাগমনও রুদ্ধ হয়ে যায়। এরপর বার্ষক্যে পৌছানো, মৃত্যু ইত্যাদি সমস্ত দুঃখ রুদ্ধ হয়ে যায়। মহারাজ! এই রুদ্ধ হয়ে যাওয়াই নির্বাণ।’

‘ভন্তে! বুদ্ধ কোথায়?’

‘মহারাজ! ভগবান পরম নির্বাণ প্রাপ্ত হয়েছেন। যার পর তাঁর ব্যক্তিত্বকে বজায় রাখার জন্য আর কিছুই বর্তমান নেই।’

‘ভন্তে! যদি উপমা সহযোগে বর্ণনা করেন।’

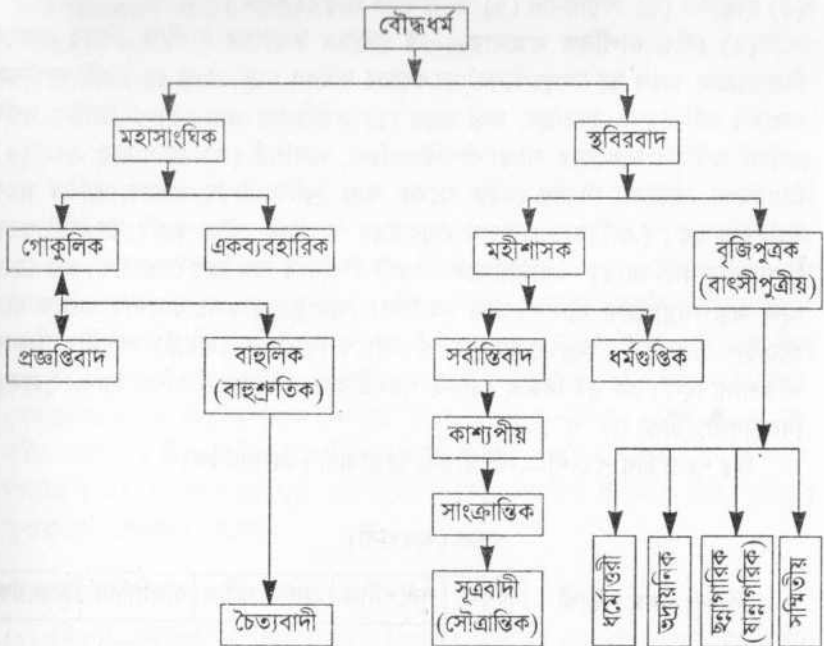
‘মহারাজ! একবার প্রজ্বলিত হয়ে নির্বাপিত হয়ে যাওয়া অগ্নিশিখা থেকে কি আবার অগ্নিবলক দেখা যায়?’

‘না ভন্তে! সেই শিখা তো নির্বাপিত।’

নাগসেন তাঁর প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বৌদ্ধ দর্শনে কোনো নতুন তথ্য যোগ করেননি, কিন্তু তাকে অত্যন্ত সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। এখানে আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে নাগসেনের জন্ম হয়েছিল ইন্দো-গ্রিক সাম্রাজ্য ও সভ্যতার কেন্দ্রস্থল শিয়ালকোটের (= সাকল) কাছে। যার ফলে ভারতীয় দর্শনের সম্যক জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে গ্রিক দর্শনের সঙ্গেও তাঁর যথেষ্ট পরিচয় ছিল। এবং এই উভয় দর্শনের জ্ঞান থাকার ফলেই মিনান্দারের মতো একজন জ্ঞানী তार्কিকের এ সকল প্রশ্নের সমাধান করতে পেরেছিলেন। মিনান্দার এবং নাগসেনের এই আলোচনা ইতিহাসের সেই বিস্তৃত ঘটনার সামান্য এক উদাহরণ মাত্র। যেখানে ভারতীয় এবং গ্রিক প্রতিভার সমন্বয়ে এক নতুন বিচারধারার সৃষ্টি হতে চলেছিল।

বৌদ্ধ সম্প্রদায়

(১) বৌদ্ধ ধার্মিক সম্প্রদায়—বুদ্ধ আত্মবাদের প্রবল বিরোধী ছিলেন, কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি বস্তুবাদেরও বিরোধী ছিলেন। মৌর্য শাসনের অন্ত পর্যন্ত মগধই ছিল বৌদ্ধধর্মের কেন্দ্র, কিন্তু মৌর্য সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে যাবার পর বৌদ্ধধর্মের কেন্দ্র বিশেষ করে তার প্রভাবশালী শাখা (নিকায়) পূর্ব থেকে পশ্চিমে সরে যায়। এই স্থান পরিবর্তনের মধ্যে সর্বাস্তিবাদ নিকায় মগধ থেকে উরুমুণ্ড পর্বত (গোবর্ধন-মথুরা) অঞ্চলে পৌঁছায়, এবং যবন শাসনকালে পাঞ্জাব অঞ্চলে শক্তিশালী হতে হতে, খ্রিষ্টজন্মের প্রথম শতাব্দীর মধ্যভাগে, কণিষ্কের রাজত্বকালে গান্ধার-কাশ্মীরে কেন্দ্রীভূত হয়। এখান থেকেই এই ধর্ম গ্রিক কলা, শিল্প, দর্শন ইত্যাদির সঙ্গে পরিচিত হয়। অশোকের (২৬৯ খ্রিঃ পূঃ) সময় পর্যন্ত বৌদ্ধধর্ম নিম্নে বর্ণিত সম্প্রদায়গুলির মধ্যে ভাগ হয়ে যায়। (পুরাতত্ত্ব-নিবন্ধাবলী—রচনা বর্তমান গ্রন্থকার)



অর্থাৎ—বুদ্ধ নির্বাণের (৪৮৩ খ্রিঃ পূঃ) একশো বছরের মধ্যে (৩৮০ খ্রিঃ পূঃ) স্থবিরবাদ (বুদ্ধের অনুসরণকারী) এবং মহাসাংঘিক নামে যে দুই নিকায় (সম্প্রদায়) উদ্ভূত হয়েছিল, তারা পরবর্তী সওয়াশো বছরের মধ্যেই মোট আঠারোটি নিকায়ে ভাগ হয়ে যায়—যার মধ্যে মহাসাংঘিক বিভক্ত হয় ছটি এবং স্থবিরবাদ বারোটি নিকায়ে। সর্বাস্তিবাদ স্থবিরবাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই আঠারোটি নিকায়ের পৃথক পৃথক পিটক (সূত্র, বিনয়, অভিধর্ম) ছিল। এই পিটকগুলির মধ্য সূত্র এবং বিনয় বিষয়ে বহুলাংশে মতত্র্যক্য ছিল, কিন্তু অভিধর্ম পিটকে মতভেদ তীব্র ছিল এবং সেজন্য তাদের গ্রন্থও পৃথক ছিল। স্থবিরবাদীরা প্রাচীন নিকায় থেকে নিম্নবর্ণিত আটটি মতের অনেকগুলিকে তাদের অভিধর্মীয় গ্রন্থ কথাবত্থু’-তে খণ্ডন করেছেন।—মহাসাংঘিক, গোকুলিক, কাশ্যপীয়, ভদ্রায়নিক, মহাশাসক, বাৎসীপুত্রীয়, সর্বাস্তিবাদ ও সম্মিতীয়।

কথাবত্থু-কে অশোকের গুরু মোগ্গলিপুত্ত তিস্যের কৃতি বলে মনে করা হয়, কিন্তু উক্ত গ্রন্থে বর্ণিত দুশো চোদ্দোটি কথাবস্তুর (বাদের বিষয়) মধ্যে মাত্র তিয়াত্তরটি পুরাতন নিকায়ের সঙ্গে সম্বন্ধ বজায় রেখেছিল এবং সেগুলিই মোগ্গলিপুত্ত তিস্যের সময়কাল পর্যন্ত বর্তমান ছিল— অর্থাৎ ওই পর্যন্ত কথাবস্তু মোগ্গলিপুত্ত কর্তৃক সৃষ্ট অনুমান করা যেতে পারে। অবশিষ্ট কথাবস্তু অশোকের পরবর্তীকালের আটটি নিকায়ের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। সেগুলি (১) অন্ধক (২) অপরিশৈলীয় (৩) পূর্বশৈলীয় (৪) রাজগিরিক (৫) সিদ্ধার্থক (৬) বৈপুল্যবাদ (৭) উত্তরাপথক (৮) হেতুবাদ।

(২) বৌদ্ধ দার্শনিক সম্প্রদায়—এই পুরাতন নিকায়ের দার্শনিক বিচার এখানে নিম্নয়োজন কারণ তা ‘দিগ্‌দর্শনের’ কলেবরের বহিঃস্থ। বৌদ্ধদের যে চারটি দার্শনিক সম্প্রদায় প্রসিদ্ধিলাভ করেছিল, তার মধ্যে (১) সর্বাস্তিবাদ এবং (২) সৌত্রান্তিক দর্শন প্রাচীন অষ্টাদশ নিকায়ের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল, অবশিষ্ট (৩) যোগাচার এবং (৪) মাধ্যমিক—অষ্টাদশ নিকায় থেকে অনেক পরে খ্রিস্টীয় প্রথম শতকে আদিম রূপে আবির্ভূত হয়। (এ বিষয়ে বর্তমান গ্রন্থকারের ‘মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের উৎপত্তি’ গ্রন্থে বিশদভাবে বলা আছে)। মহাসাংঘিকের একটি নিকায়ের নাম ছিল চৈত্যবাদ। এর কেন্দ্র ছিল অন্ধ সাম্রাজ্যের ধান্যকটকের মহাচৈত্য (মহাতূপ), এবং এজন্যই এদের নাম হয়েছিল চৈত্যবাদী। অন্ধ সাম্রাজ্যের পশ্চিমাংশে (বর্তমান মহারাষ্ট্র) সম্মিতীয় নিকায় শক্তিশালী ছিল। এই দুই নিকায় থেকেই পরবর্তীকালে মহাযান বিকশিত হয়। (পুরাতত্ত্ব নিবন্ধাবলী, ‘টীকা সহ’ পৃ. ১২৬)

খ্রিঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দী—সম্মিতীয় = চৈত্যবাদী (মহাসাংঘিক)

অন্ধক (অন্ধবাসী)

খ্রিঃ পূঃ প্রথম শতাব্দী

বৈপুল্য	পূর্বশৈলিক	অপরিশৈলীয়	রাজগিরিক	সিদ্ধার্থক
---------	------------	------------	----------	------------

খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দী

মহাযান

যোগাচারে প্রবল সমর্থক 'লংকাবতার-সূত্র' বৈপুল্যবাদী পিটকের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। নাগার্জুনের মাধ্যমিক (শূন্য) বাদের সমর্থনে প্রজ্ঞাপারমিতা সহ অন্যান্য সূত্র রচিত হয়েছিল কিন্তু নাগার্জুনের নিজের দর্শনের পুষ্টির জন্য এর প্রয়োজন ছিল না। তিনি তাঁর নিজের দর্শনের জন্য প্রতীত্য-সমুৎপাদ (= বিচ্ছিন্ন-প্রবাহ রূপে উৎপত্তি)-কেই ভিত্তি করেছিলেন।

কথারত্থ-র 'অর্বাচীন' নিকায়ের মধ্যে আমরা উত্তরাপথক এবং হেতুবাদের নাম জেনেছি। উত্তরাপথক গান্ধার-কাশ্মীর অঞ্চলের নিকায় ছিল এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু হেতুবাদের সঠিক স্থান সম্বন্ধে তেমন কিছু জানা যায়নি। প্লেটোর বিজ্ঞানবাদকে প্রতীত্য-সমুৎপাদের সঙ্গে যুক্ত করে তাকে অতি সহজে যোগাচার বিজ্ঞানে পরিণত করা হয়েছে। অনুমান এই দর্শনের জন্মদাতা অসঙ্গের জন্ম এবং কর্মস্থান ছিল গান্ধারের পেশোয়ার অঞ্চল। এ বিষয়ে এখনও আমাদের কাছে তেমন কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য নেই। নাগার্জুনের পরে বৌদ্ধধর্মের বিকাশে সবচেয়ে অগ্রণী ভূমিকা ছিল পাঠান জাতীয় অসঙ্গ ও বসুবন্ধুর। নাগার্জুনের এক শতাব্দী বৌদ্ধ বিচারক অশ্বঘোষকে যদি ধরা হয়, তাহলে তাঁরও কর্মক্ষেত্র মনে হয় গান্ধার অঞ্চলেই ছিল। এ সমস্ত কারণেই বৌদ্ধ দর্শনের উপরে অনিবার্য ভাবে গ্রিক প্রভাব পড়ে। অশ্বঘোষকে মহাযানপন্থীরা তাদের আচার্যদের মধ্যে शामिल করে নিয়েছিল। এজন্যই তারা 'মহাযান শ্রদ্ধোৎপাদ' গ্রন্থটিকে অশ্বঘোষের কৃতি হিসাবে প্রচার করে। কিন্তু যিনি 'বুদ্ধচরিত', 'সৌন্দরানন্দ', 'সারিপুত্তপ্রকরণ' প্রভৃতি কাব্যনাটক পাঠ করেছেন, তিব্বতি ভাষায় অনূদিত তাঁর সর্বাঙ্গিবাদী সূত্রের ব্যাখ্যার সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন কিংবা যারা সর্বাঙ্গিবাদ আচার্যদের পরিষদের আহ্বায়ক সম্রাট কবিশ্ব সম্বন্ধে গবেষণা করছেন, তাঁরা অশ্বঘোষকে সর্বাঙ্গিবাদ স্থবির ভিন্ন অন্য কোনো আখ্যায় আখ্যায়িত করবে না। (পোই-খণ্ড, [তিব্বত] সুরক্ষিত সংস্কৃত ভাষায় রচিত এক তালপাতার পুঁথিতে অশ্বঘোষকে সর্বাঙ্গিবাদী ভিক্ষু বলা হয়েছে) অতঃপর, গ্রিক তথা শত যুগের প্রাচীন বৌদ্ধ নিকায়গুলি সম্বন্ধে যদি আমরা আরও বিশদ ভাবে অনুসন্ধান করি, তাহলে শুধুমাত্র বৌদ্ধ দর্শন সম্বন্ধেই নয়, ভারতীয় দর্শনের বিকাশের ইতিহাসকেও বিশেষ ভাবে জানতে পারব। চিনা এবং তিব্বতি ভাষায় অনুবাদ এবং গোবি মরুভূমি এ বিষয়ে আমাদের কতটা সাহায্য করতে পারবে তা আগামী দিনের গবেষণার বিষয়। কিন্তু বর্তমানে আমাদের এর বেশি কিছু বলা উচিত নয় যে ভারতীয় এবং গ্রিক বিচারধারার যে সমাগম গান্ধার অঞ্চলে হয়েছিল, সেখানে অশ্বঘোষ তাঁর আধুনিক শৈলীতে রচিত কাব্য ও নাটকের মাধ্যমেই শুধু নয়, নবীন দর্শনকেও গ্রিক শৈলীর সঙ্গে মিলিত করার প্রধান যোগসূত্র ছিলেন। পরবর্তীকালে নাগার্জুন এই সূত্রের সঙ্গে যুক্ত হন এবং তিনিই ভারতীয় দর্শনকে এক অভিনব সুব্যবস্থিত রূপ প্রদান করেন।

নাগার্জুনের শূন্যবাদ (১৭৫ খ্রিঃ)

(১) জীবনী—নাগার্জুনের জন্ম হয়েছিল বিদর্ভের (বেরার) এক ব্রাহ্মণ পরিবারে। তাঁর বাল্যকাল সম্বন্ধে অনুমান করা হয় যে তিনি এক প্রতিভাবান ছাত্র ছিলেন এবং 'ব্রাহ্মণের'

গ্রন্থসমূহকে সম্যক অধ্যয়ন করেছিলেন। তারপর তিনি শ্রীপর্বতকে (নাগজুনীকোণ্ডা—গুপ্তুর) আপন নিবাসস্থল নির্বাচন করেন, যে স্থান পরবর্তীকালে তাঁরই কারণে খ্যাতির শীর্ষে আরোহণ করে। তাঁকে 'বৈদ্যক' এবং 'রসায়ন' এই দুই শাস্ত্রেরও প্রমুখ আচার্য জ্ঞান করা হয়। তাঁর রচিত 'অষ্টাঙ্গ হৃদয়' এখনও তিব্বতি বৈদ্যদের কাছে সর্বাধিক প্রামাণিক গ্রন্থরূপে স্বীকৃত। তবে নাগার্জুনের সিদ্ধাই, তন্ত্র-মন্ত্র ইত্যাদিকে বর্ষিত কলেবরে প্রদর্শন করা যার উদাহরণ আমরা পরবর্তী যুগের বৌদ্ধ সাহিত্যে পাই, তার সঙ্গে আমাদের আলোচ্য দার্শনিক নাগার্জুন কোনো ভাবে সম্পর্কিত নন।

নাগার্জুন অন্ধুরাজ গৌতমীপুত্র যজ্ঞশ্রীর (১৬৬-১৯৬ খ্রিঃ) সমসাময়িক ছিলেন, উইন্টারনিসের এই মত যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়। (*History of Indian Literature*, Vol. II, pp. 346-48)

সাধারণ ভাবে নাগার্জুনের নাম অনেক গ্রন্থের সঙ্গেই জড়িত; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁর রচনা—(১) মাধ্যমিক কারিকা (২) যুক্তিপট্টিকা (৩) প্রমাণ বিধ্বংসন (৪) উপায় কৌশল্য (৫) বিগ্রহ ব্যবর্তনী। এর মধ্যে প্রথম এবং পঞ্চমটিই কেবলমাত্র সংস্কৃত ভাষায় উপলব্ধ। ('Journal of Bihar & Orissa Research Society', Vol. XXIII, গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত)

(২) দার্শনিক বিচার—নাগার্জুন তাঁর 'বিগ্রহ ব্যবর্তনী' গ্রন্থে বিরোধী তত্ত্বকে খণ্ডন করে কান্টের বস্তুসারের বিপরীত বস্তুশূন্যতা—বস্তুর অভ্যন্তরে কোনো স্থির তত্ত্ব নেই, তা বিচ্ছিন্ন প্রবাহ মাত্র—তত্ত্বকে সিদ্ধ করেছেন।

(ক) শূন্যতা—নাগার্জুনকে কারিকাকৌশলীর প্রবর্তক বলা হয়। কারিকার পদ্য শৈলীতে অল্প কথায় অধিক বাক্যকে প্রকাশ করা যায়। অন্ততপক্ষে তাঁর তিনটি গ্রন্থ (১, ২, ৫) কারিকাকৌশলীতে রচিত। বিগ্রহ ব্যবর্তনীতে বাহ্যন্তরটি কারিকা আছে যার মধ্যে শেষ দুটি 'মাহাত্ম্য' এবং 'নমস্কার' হচ্ছে শ্লোক, এজন্য মূল গ্রন্থকে সত্তরটি কারিকার সমষ্টি বলতে হয়। এই গ্রন্থটি শূন্যতা বিষয়ে রচিত কারণ বিগ্রহ ব্যবর্তনীর আরেক নাম 'শূন্যতা সপ্ততি'। এই কারিকার বিষয়ে স্বয়ং আচার্যের সরল ব্যাখ্যা রয়েছে। গ্রন্থের প্রথমে তিনি প্রণাম শ্লোক এবং গ্রন্থ-প্রয়োজন উল্লেখ করেননি যা পরবর্তীকালে প্রায় সমস্ত বৌদ্ধ-অবৌদ্ধ গ্রন্থে পরিপাটি রূপে দেওয়াটা সর্বমান্য ছিল। নাগার্জুন একান্তরতম কারিকাতে শূন্যতার মাহাত্ম্য বর্ণনা করে লিখেছেন—

'যে এই শূন্যতাকে অনুধাবন করতে সক্ষম, সে সমস্ত অর্থকেই হৃদয়ঙ্গম করতে সমর্থ।'

'যে শূন্যতা বুঝতে অক্ষম সে কোনো কিছু বুঝতেই অক্ষম।'

'প্রভবতি চ শূন্যতেয়ং যস্য প্রভবন্তি তস্য সর্বাৰ্থাঃ।

প্রভবতি ন তস্য কিঞ্চিৎ ন ভবতি শূন্যতা যস্য।'

অতঃপর এর ব্যাখ্যা করে আচার্য বলেছেন, যে শূন্যতাকে বিশদ ভাবে জেনেছে, সে প্রতীত্য-সমুৎপাদকেও (বিচ্ছিন্ন প্রবাহ রূপে উৎপত্তি) জেনেছে, যে প্রতীত্য-সমুৎপাদকে জেনেছে, সে চারটি আৰ্যসত্যকে উপলব্ধি করতে সক্ষম। প্রতীত্য-সমুৎপাদ

হৃদয়ঙ্গমকারী ব্যক্তি জানেন ধর্ম কী, ধর্মের হেতু কী, অধর্মের ফল কী, ক্রেশ (চিন্তন), ক্রেশহেতু, ক্রেশ বস্তু কী। যিনি এই সমস্ত জ্ঞান লাভ করেছেন তিনি জানেন, সুগতি বা দুর্গতি কী বস্তু সুগতি বা দুর্গতিতে যাওয়ার অর্থ কী, সুগতি বা দুর্গতিতে যাওয়ার পথ কী, কোন উপায়ে সুগতি বা দুর্গতি থেকে বাইরে আসা যায়।

নাগার্জুন শূন্যতার যে অর্থ করেছেন তা হল (বিগ্রহ ব্যবর্তনী ২২— 'ইহ হিয়ঃ প্রতীত্য ভাবানাং সা শূন্যতা। কস্মাৎ নিঃস্বভাবত্বাৎ। যেহি প্রতীত্য সমুৎপাদা ভাবান্তে না সস্বভাবা ভবন্তি স্বভাবাভাবাৎ। কস্মাৎ হেতুপ্রত্যয়্যাপেক্ষাত্বাত। যদি হি স্বভাবতো ভাবা ভবেয়ুঃ। প্রত্যাখ্যায়াপি হেতুপ্রত্যয়ং ভবেয়ুঃ।') প্রতীত্য-সমুৎপাদ বিশ্ব এবং তার সমস্ত জড় চেতনা বস্তু কোনো স্থির, অচল তত্ত্ব (আত্মা, দ্রব্য ইত্যাদি) থেকে পূর্ণরূপে শূন্য, অর্থাৎ বিশ্ব ঘটনা-সমূহ বর্তমান কিন্তু বস্তুসমূহ নয়। আচার্য তাঁর গ্রন্থের প্রথম কুড়িটি কারিকাতে পূর্বপক্ষের আক্ষেপ বর্ণনা করেছেন এবং গ্রন্থের অপসার্যে তার উত্তর দিতে গিয়ে শূন্যতাকে সমর্থন করেছেন। সংক্ষেপে তাঁর তর্ক প্রণালি এরকম—

পূর্বপক্ষ (১) বস্তু সারকে অস্বীকার—অর্থাৎ শূন্যবাদ সঠিক নয় কারণ (i) যে শব্দ যুক্তি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। তাও শূন্য—অসার হবে; (ii) যদি না হয়, তাহলে প্রথম বক্তব্য—সমস্ত বস্তুই শূন্য-মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়; (iii) শূন্যতা সিদ্ধ করার পক্ষে কোনো প্রমাণ নেই।

(২) সমস্ত ভাব (বস্তুরাশি) বাস্তব; কারণ (i) ভালোমন্দের পার্থক্য অনস্বীকার্য; (ii) যা বস্তু নয় তার নামও পাওয়া যায় না; (iii) বাস্তবিকতার প্রতিষেধ যুক্তি সিদ্ধ নয়; (iv) প্রতিষেধকেও সিদ্ধ করা যায় না।

উত্তরপক্ষ—(১) সমস্ত ভাবের (সত্তার) শূন্যতা কিংবা প্রতীত্য-সমুৎপাদ (বিচ্ছিন্ন প্রবাহ রূপে উৎপত্তি) সিদ্ধ, কারণ (i) বিশ্বের অবাস্তবিকতাকে স্বীকার শূন্যতা সিদ্ধান্তের বিরোধী নয় (ii) সেজন্যই তা আমাদের প্রতীজ্ঞারও বিরোধী নয় (iii) যে প্রমাণের সাহায্যে ভাবের বাস্তবিকতা সিদ্ধ করা যায়, তাকেই সিদ্ধ করা যায় না—(ক) প্রমাণের না হওয়া অন্য প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ করা যায় কারণ সেই অবস্থায় ওটি প্রমাণ নয় প্রমেয় (যাকে প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ করতে হবে)। হয়ে যাবে। (খ) সে অগ্নির মতো নিজেকে সিদ্ধ করতে পারে; (গ) প্রমেয় দ্বারা তাকে সিদ্ধ করা যায় না, কারণ প্রমেয় নিজেই সিদ্ধ নয় সাধ্য, (ঘ) ওটিকে সংযোগ (হঠাৎ ঘটে যাওয়া) দ্বারাও সিদ্ধ করা যায় না, কারণ সংযোগ কোনো প্রমাণ নয়।

(২) ভাব (সত্তা) রাশির শূন্যতা সত্য; কারণ (i) তা ভালোমন্দের প্রভেদের বিরুদ্ধে নয়; সেই ভেদ প্রতীত্য-সমুৎপাদের কারণেই ঘটে। যদি প্রতীত্য-সমুৎপাদের ভিত্তিতে না হয়ে ভালোমন্দের ভেদ স্বতঃরূপেই হয়ে থাকে। তাহলে তা এমন এক অবস্থা যাকে ব্রহ্মচর্য ইত্যাদি অনুষ্ঠানের দ্বারা ইচ্ছামতো পরিবর্তিত করা যায় না; (ii) শূন্যতা থাকলেও নাম থাকতে পারে না, এই ধারণাও ভ্রান্ত কারণ নামকে আমরা সদভূত নয় অসদভূত মনে করি। সৎ-এরই (স্থির, অবিকারী, বস্তু সার) নাম হয়, অ-সত্তার নয়, এটা কোনো নিয়ম নয়, (iii) প্রতিষেধ সিদ্ধ করা যায় না, এ কথা বলা ভুল, কারণ

অপ্রতিষেধকে সিদ্ধি করার জন্য প্রমাণ ইত্যাদির প্রয়োজন হয়। অক্ষপাদের ন্যায় সূত্রের প্রমাণ সিদ্ধি প্রকরণ তথা বিগ্রহ ব্যবর্তনী একই বিষয়ের পক্ষ এবং প্রতিপক্ষের মধ্যেই বর্তমান। আমরা অন্যত্র বর্ণনা করেছি যে অক্ষপাদ তাঁর ন্যায়সূত্রে নাগার্জুনের উপরোক্ত মতের খণ্ডন করেছেন। (বিগ্রহ ব্যবর্তনীর ভূমিকায় [Preface] বলা হয়েছে যে অক্ষপাদ নাগার্জুনের এই মত খণ্ডন করেছিলেন)।

গ্রন্থ সমাপ্ত করতে গিয়ে নাগার্জুন বলেছেন—‘যিনি শূন্যতা প্রতীত্য-সমুৎপাদ এবং অনেকার্থ মধ্যমা প্রতিপদ (মধ্যমপথ) নির্দেশ করেছেন। সেই অপ্রতিম বুদ্ধকে প্রণাম জানাই। (বিগ্রহ ব্যবর্তনী—‘যঃ শূন্যতাং প্রতীত্য-সমুৎপাদং মধ্যমাং প্রতি-পদমনেকার্থাৎ। নিজগাদ প্রণমামি তমপ্রতিমসংবুদ্ধম্।’)

(ক) প্রণাম-বিধ্বংসন গ্রন্থে নাগার্জুন প্রমাণবাদকে খণ্ডন করেছেন। তিনি প্রমাণের খণ্ডন করতে গিয়ে পরমার্থের অর্থেই তার খণ্ডন করেছেন, এবং ব্যবহার সত্যরূপে তাকে অস্বীকার করেননি। কিন্তু যে প্রবল ভাবে তিনি প্রমাণকে খণ্ডন করেছেন, তার ফলে মাধ্যমিক দর্শন ব্যবহারে-সত্যবাদী, বস্তুস্থিতি পোষক দর্শন হয়ে ওঠার পরিবর্তে সর্বধ্বংসক নাস্তিবাদে পরিণত হয়েছে, ‘প্রমাণ বিধ্বংসন’ গ্রন্থে অক্ষপাদের মতোই প্রমাণ প্রমেয় ইত্যাদি অষ্টাদশ পদার্থের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে। এভাবেই উপায়-কৌশল্যতেও শাস্ত্রার্থ সম্বন্ধীয় আলোচনা—নিগ্রহস্থান, জাতি ইত্যাদি বিষয়ে বলা হয়েছে যা অক্ষপাদের সূত্রের মধ্যেও পাওয়া যায়। উপায়-কৌশল্যের চিনা ভাষায় অনুবাদ হয়েছিল ৪৭২ খ্রিষ্টাব্দে। এ বিষয়ে আমরা এইটুকু বলতে পারি যে পরবর্তীকালে অন্যান্য আচার্যদের গ্রন্থ থেকে বহু কিছু আলোচ্য, আচার্যের গ্রন্থে তাঁর অনুগামীরা সন্নিবেশ করে দেন। (সর্বদর্শন সংগ্রহ, বৌদ্ধ দর্শন) ('Nanjio'; 1257)

(খ) মাধ্যমিক কারিকার বিচার—দার্শনিক বিচার নাগার্জুনের শূন্যতার অভিপ্রায়—প্রতীত্য-সমুৎপাদ, যা বিগ্রহ ব্যবর্তনীতে ব্যক্ত হয়েছে। নাগার্জুন প্রতীত্য-সমুৎপাদকে দুটি অর্থে ব্যবহার করেছেন—(১) প্রত্যয় (হেতু কিংবা কারণ) থেকে উৎপত্তি, ‘সমস্ত বস্তুই প্রতীত্য সমুৎপন্ন’ অর্থাৎ সমস্ত বস্তুই আপন উৎপত্তিতে, আপন সত্তাকে পাবার জন্য অন্য হেতু বা কারণের উপরে নির্ভরশীল (পরিশ্রিত); (২) প্রতীত্য-সমুৎপাদের অন্য অর্থ ক্ষণিকতা। সমস্ত বস্তুই ক্ষণ পরে বিনষ্ট হয়ে যায় এবং দ্বিতীয় নতুন বস্তু বা ঘটনা ক্ষণের জন্য আবর্তিত হয় অর্থাৎ উৎপত্তি বিচ্ছিন্ন প্রবাহ। প্রতীত্য-সমুৎপাদকে মধ্যম পথ বলা হয়। আগেই বলা হয়েছে যে বুদ্ধ আত্মবাদী ছিলেন না আবার বস্তুবাদীও ছিলেন না। বস্তুতপক্ষে তাঁর পথ ছিল এই উভয় বাদের মধ্যবর্তী এক পথ (মধ্যমপথ)। তিনি উৎপত্তি-বিচ্ছিন্ন প্রবাহকে স্বীকার করতেন। আত্মবাদীদের ‘সত্যত বিদ্যাবান’ তত্ত্বের বিরুদ্ধে, বিচ্ছিন্ন কিংবা প্রতীত্যকে রেখেছিলেন, আবার বস্তুবাদীদের সর্বদা উচ্ছেদ (বিনাশ) তত্ত্বের প্রবাহকে রেখেছিলেন।

পরিশ্রিত উৎপাদনের অর্থ নিয়ে নাগার্জুন প্রমাণ করতে চেয়েছেন, যার উৎপত্তি, স্থিতি এবং বিনাশ আছে তার পরমার্থ সত্তাকে কখনোই মানা যায় না।

মাধ্যমিক দর্শন বস্তু সত্তার পরমার্থ রূপ সম্বন্ধে বিচার করতে গিয়ে বলছে—‘না সৎ, না অ-সৎ, সৎ-অ-সৎ দুইও নয়, সৎ অ-সৎ দুইই নয়ও নয়।’

‘কারক আছে তা কর্মের নিমিত্ত (প্রত্যয়) দ্বারা বলা যায় এবং কর্ম আছে তা কারকের নিমিত্তের দ্বারা, এ দুটি ছাড়া অন্য সত্তার সিদ্ধির কোনো কারণ আমরা দেখি না।’

এ ভাবে কারক এবং কর্মের সত্যতা একে অপরের আশ্রিত, অর্থাৎ স্বতন্ত্র রূপে এ দুটির একটির সত্তা সিদ্ধ নয়। অতএব স্বয়ং অসিদ্ধ বস্তু কী ভাবে অন্যকে সিদ্ধ করবে? এই ন্যায়কে নিয়েই নাগার্জুন বলেছেন—কোনো কিছুই সত্তাকেই সিদ্ধ করা যায় না। সত্তা এবং অ-সত্তাও এ ভাবে একে অপরের আশ্রিত, অতএব তাদেরও পৃথক কিংবা মিলিত ভাবে সিদ্ধ করা যায় না। কর্তা এবং কর্মের নিষেধ করতে গিয়ে নাগার্জুন আবার বলেছেন, ‘সৎ-রূপী কারক সৎ-রূপী কর্ম করে না, কারণ সৎ-রূপে কর্ম হয় না, অতএব কর্মের জন্য কোনো কর্তার প্রয়োজন নেই।’

‘সৎ রূপের জন্য ক্রিয়া নেই অতএব কর্তারও কর্মের প্রয়োজন নেই।’ (মাধ্যমিক কারিকা, ৬২)

এ ভাবে পরস্পরাশ্রিত সত্তার বস্তুতে কর্তা, কর্ম, কারণ ক্রিয়াকে সিদ্ধ করা যায় না। ‘কোথাও কোনো সত্তা স্বতঃ নয়; পরতঃও নয়—ন-স্বতঃ, পরতঃ উভয়েই কোনো কারণ ব্যতিরেকে।’ (মাধ্যমিক কারিকা, ৫৮—৫৯)

কার্য-কারণ সম্বন্ধ খণ্ডন করে নাগার্জুন বলেছেন—

‘যদি পদার্থ সৎ হয়, তাহলে তার জন্য প্রত্যয়ের (কারণ) প্রয়োজন নেই? যদি অ-সৎ হয় তাহলেও তার জন্য প্রত্যয়ের প্রয়োজন নেই?’

‘গর্দভের শিং-এর মতো অ-সৎ পদার্থের জন্য প্রত্যয়ের কী প্রয়োজন? সৎ পদার্থের (আপন সত্তার জন্য) প্রত্যয়ের কী প্রয়োজন?’ (মাধ্যমিক কারিকা, ৪)

উৎপত্তি, স্থিতি এবং বিনাশকে সিদ্ধ করার জন্য কার্য-কারণ, সত্তা, অ-সত্তা ইত্যাদির বিচারে আমাদের প্রত্যয় হয় যে এরা পরস্পরাশ্রিত; এমতাবস্থায় তাকে সিদ্ধ করা যায় না। বৌদ্ধ দর্শনে পদার্থকে সংস্কৃত (কৃত) এবং অসংস্কৃত (অ-কৃত) এই দুই ভাগে বিভক্ত করে সত্তাকে সংস্কৃত এবং নির্বাণকে অসংস্কৃত বলেছেন। নাগার্জুন এই বিভাজনের বিরোধিতা করে বলেছেন—।

‘উৎপত্তি—স্থিতি—বিনাশ সিদ্ধ হলে সংস্কৃত সিদ্ধ হবে না, সংস্কৃত সিদ্ধ, এটা প্রমাণিত না হলে অ-সংস্কৃত কী ভাবে সিদ্ধ হবে?’

বিশ্বজগৎ এবং তার সমস্ত পদার্থকে মরু মরীচিকা বর্ণনা করে নাগার্জুন বলেছেন— (মাধ্যমিক কারিকা, ২২)

‘মরুভূমির বাতাসের ঢেউকে জলাশয় মনে করে কেউ সেখানে যায়, অতঃপর ‘এটা জল নয়’ এই উপলব্ধিতে পৌঁছায় তবে সে মূঢ়। তেমনই মরীচিকাসম এই লোককে ‘বিদ্যমান’ মনে করা ব্যক্তির ‘না নেই’ এই মোহও মোহ থেকে মুক্ত নয়।’

যে ভাবে পরাশ্রিত উৎপাদ (প্রতীত্য-সমুৎপাদ) হওয়ার জন্য কোনো বস্তুকে সিদ্ধ, অসিদ্ধ, সিদ্ধ-অসিদ্ধ, না-সিদ্ধ না-অ-সিদ্ধ করা যায় না, সে ভাবেই প্রতীত্য-সমুৎপাদের অর্থ বিচ্ছিন্ন প্রবাহ রূপে উৎপাদ গ্রহণ করলেও, কার্য, কারণ, কর্ম, কর্তা ইত্যাদি ব্যবস্থা

হতে পারে না, কারণ তার অভ্যন্তরের এক বস্তু আর-এক বস্তু থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরেই অস্তিত্বে আসে।

(গ) শিক্ষা—অন্ধবাসী রাজাদের উপাধি ছিল সাতবাহন (শালিবাহন) (রাজপুতদের একটি অংশ নিজেদের শালিবাহন রাজাদের বংশধর এবং পৈঠন নগর থেকে আগত বলে থাকে। পৈঠন অর্থাৎ প্রতিষ্ঠান (হায়দ্রাবাদ রাজ্য, নগর সাতবাহন রাজবংশের রাজাধানী ছিল) তৎকালীন সাতবাহন রাজা (যজ্ঞশ্রী-গৌতমীপুত্র) নাগার্জুনের মিত্র ছিলেন। এই মিত্র রাজা, সাধারণ কোনো রাজা ছিলেন না, বেশ বড় রাজাই ছিলেন। এই তথ্য পাওয়া যায় নাগার্জুনের চার শতাব্দী পরে রচিত বাণের হর্ষচরিতে। ('...তামেকাবলীং... তস্মান্নাগরাজাং নাগার্জুনো নাম...ভিক্ষুরভিক্ষুং লেভে চ।...ত্রিসমুদ্রাধিপত্যে সাতবাহননাম্নে নরেন্দ্রায় সুহৃদে স দদৌ তাম্।'—হর্ষচরিত) সেখানে এক জায়গায় লেখা হয়েছে 'নাগার্জুন নামে এক ভিক্ষু সেই একাবলী (হার) নাগরাজের কাছে প্রার্থনা করেন এবং নাগরাজ তাঁর প্রার্থনা পূরণ করেন। অতঃপর ভিক্ষু সেই একাবলী তাঁর মিত্র, তিন সাগরের অধিপতি স্বামী সাতবাহন নামক নরেন্দ্রকে দেন।'

সেখানে রাজা সাতবাহনকে তিন সমুদ্রের (আরব সাগর, দক্ষিণ ভারত সাগর, বঙ্গোপসাগর) স্বামী এবং নাগার্জুনের সুহৃদ বলা হয়েছে। নাগার্জুনের মতো প্রতিভাশালী পণ্ডিত, যিনি বিদর্ভ অঞ্চলে জন্মেছিলেন, স্বাভাবিক ভাবেই সকলের শ্রদ্ধা, সৌহার্দ্য তাঁর প্রাপ্য ছিল। নাগার্জুন তাঁর মিত্র, রাজা সাতবাহনকে এক শিক্ষাপ্রদ পত্র (সুহৃদলেখ) লিখেছিলেন, যা তিব্বতি ও চীনা উভয় ভাষাতেই অনূদিত হয়েছে এবং আজও তা উভয় দেশে সুরক্ষিত অবস্থায় আছে। এই পত্রের মাধ্যমে নাগার্জুন তাঁর সুহৃদকে যে পরামর্শ দিয়েছিলেন, তার কয়েকটি—

৬. 'ধনকে চঞ্চল এবং অসার মনে করে, ধর্মানুসারে তাকে ভিক্ষু, ব্রাহ্মণ, দরিদ্র ও মিত্রগণের মধ্যে দান করো, দানের চেয়ে বড় কোনো মিত্র নেই।'

৭. 'নির্দোষ, অমিশ্রিত, নিষ্কলঙ্ক, উত্তম, শীল (সদাচার)-কে কার্যরূপে ঘোষণা করো; সমস্ত প্রভুত্বের ভিত্তি শীল, যেমন চরাচরের ভিত্তি পৃথিবী।'

২১. 'পরস্ত্রীর দিকে দৃষ্টি দিয়ো না, যদি দাও তাহলে তার বয়স অনুযায়ী তাকে মাতা, ভগ্নী কিংবা কন্যা রূপে জ্ঞান করো।'

২৯. 'তুমি বিশ্বকে জানো; সংসারের আটটি স্থিতির—লাভ-অলাভ, সুখ-দুঃখ, মান-অপমান, স্তুতি-নিন্দা—এ সকলের মধ্যে স্বাভাবিক থাকো, কারণ উক্ত বিষয়গুলি তোমার বিচার্য নয়।'

৩৭. 'কিন্তু সেই এক জীকে (পত্নী) পরিবারের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর মতো সম্মান করো, যে ভগ্নীর মতো মাধুর্যময়ী, বন্ধুর মতো হৃদয় বিজয়িনী, মাতার মতো হিতৈষিনী, এবং সেবকের মতো আজ্ঞা পালনকারিণী।'

৪৯. 'যদি তুমি মনে করো 'আমি রূপ (বস্তুতত্ত্ব) নই' তাহলে তোমার প্রতীতি হবে যে, রূপ আত্মাতে বাস করে না। এ ভাবেই অন্যান্য চার স্বক (বেদনা ইত্যাদি) সম্বন্ধেও জানতে পারবে।'

৫০. 'যে সমস্ত স্বল্প ইচ্ছা, কাল, প্রকৃতি, স্বভাব ও ঈশ্বর থেকে অথবা বিনা হেতু থেকে সৃষ্টি হয় না, সেগুলি অবিদ্যা এবং তৃষ্ণা থেকে উৎপন্ন হয়, এ কথা বোঝা উচিত।'

৫১. 'মনে রেখো ধার্মিক ক্রিয়াকর্ম (শীল-ব্রত-পরামর্শ) ভ্রান্ত দর্শন (সংকায়দৃষ্টি) এবং সংশয় (বিচিকিৎসা) এই তিনটি বিষয়ে আসক্তিই প্রকৃত বন্ধন (সংযোজন) জানবে।' (সংগীতি-পরিষায় সূত্র, দীঘনিকায়, ৩।১০; 'বুদ্ধচর্যা' পৃ. ৫৯০)

নাগার্জুনের দর্শন—শূন্যবাদ—বাস্তবিকতাবাদকে অস্বীকার করে। পৃথিবীকে শূন্য মনে করে তার সমস্যার অস্তিত্বকে অস্বীকার করার জন্য এর অপেক্ষা উপযোগী দর্শন আর দ্বিতীয়টি নেই। এজন্য বিশ্বয়ের কিছু নেই, বিশেষত যখন আমরা তাঁকে (নাগার্জুনকে) সম্রাট যজ্ঞশ্রী গৌতমীপুত্রের সঙ্গে অন্তরঙ্গ মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ দেখতে পাই।

(৪) যোগাচার ও অন্যান্য বৌদ্ধ দর্শন—মাধ্যমিক এবং যোগাচার-দর্শন মহাযানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত দর্শন। আবার সর্বাস্তিবাদ এবং সৌত্রান্তিক হীনযানের (স্ববিবাদ) সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। যদি এই চারটি দর্শনকে আকাশ থেকে পৃথিবীতে নামিয়ে আনা হয় তাহলে তাকে নিম্ন প্রকারের বলে মনে হবে।

বাদ	নাম	আচার্যগণ
(১)	শূন্যবাদ	মাধ্যমিক নাগার্জুন, আর্যদেব, চন্দ্রাকীর্তি, ভাব্য, বুদ্ধপালিত।
(২)	বিজ্ঞানবাদ	যোগাচার অসঙ্গ, বসুবন্ধু, দিগ্‌নাগ, ধর্মকীর্তি, শান্তরক্ষিত।
(৩)	বাহ্য-অর্থবাদ	সৌত্রান্তিক।
(৪)	বাহ্য-অভ্যন্তর-সর্বাস্তিবাদ	সংঘভদ্র, বসুবন্ধু ('অভিধর্মকোষ')
	অর্থবাদ	

যোগাচার দর্শনের মূল বীজের সন্ধান পাওয়া যায় বৈপুল্যসূত্রের মধ্যে। তার লংকাবতার, সন্ধি-নির্মোচন, আদিসূত্র, বাহ্য জগতের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে বিজ্ঞানকে (ভাববাদী তত্ত্ব, মন) একমাত্র পদার্থরূপে স্বীকার করেছে। 'যা ক্ষণিক নয়, তা সৎই নয়' এই সূত্রের অপবাদ বৌদ্ধ দর্শনে আদপেই সম্ভব নয়, এজন্য যোগাচার বিজ্ঞানও ক্ষণিক। অন্যান্য অনেক বিচারধারার মতো যোগাচারের প্রথম প্রবর্তক সম্বন্ধেও আমাদের বিশেষ কিছু জানা নেই। খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত এই দর্শন ক্ষীণ ভাবে চলছিল। কিন্তু চতুর্থ শতাব্দীর শেষ ভাগে অসঙ্গ এবং বসুবন্ধু, এই দার্শনিক ভ্রাতৃত্বদ্বয় পেশোয়ারে জনগ্রহণ করেন, এবং তাঁদের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের জন্য এই দর্শন অত্যন্ত প্রবল ও প্রসিদ্ধ হয়ে উঠেছিল।

যোগাবচর (যোগী) শব্দ থেকেই যোগাচার শব্দের উদ্ভব। এই শব্দটির সাক্ষাৎ প্রাচীন পটিকেও মেলে, তবে এখানে শব্দটি কেবলমাত্র দার্শনিক সম্প্রদায় সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয়েছে। যোগাচার দর্শনের প্রতিপাদক আর্য অসঙ্গের মৌলিক মহান গ্রন্থ 'যোগাচার ভূমি' (অসঙ্গ : দর্শন-দিগদর্শন, হি-পৃ. ৭০৪-৩৭) থেকেও এই নামকরণ হয়েছে এমনও অনুমান করা হয়। অসঙ্গ সম্পর্কে পরে বিস্তারিত আলোচনা করা যাবে। এখানে নাগার্জুন

এবং তারও আগে বিজ্ঞানবাদ তত্ত্ব যে ভাবে প্রচলিত হয়েছিল এবং পরবর্তীকালে তার উপরে প্রবাসী গ্রিকদের সাহচর্যে প্রাপ্ত প্লেটোর দর্শনের প্রভাব পড়তে থাকে, সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা এখানে করা হয়েছে।

‘আলয়-বিজ্ঞান (সমুদ্র) থেকে প্রবৃত্তি-বিজ্ঞানের তরঙ্গ উৎপন্ন হয়।’ (লংকাবতার সূত্র, ৫১)

বিশ্বের মূল তত্ত্বকে এই দর্শনের পরিভাষায় ‘আলয়-বিজ্ঞান’ বলা হয়েছে। বিজ্ঞান-সমুদ্র থেকে যে পঞ্চেন্দ্রিয় এবং মন—এই ছটি বিজ্ঞান উৎপন্ন হয় তাদেরকেই প্রবৃত্তি-বিজ্ঞান বলে।

‘যেমন পবনরূপী প্রত্যয় (হেতু) দ্বারা প্রেরিত হয়ে সমুদ্রে নৃত্যরতা তরঙ্গের সৃষ্টি হয় এবং তার প্রবাহের বিচ্ছেদ হয় না, ঠিক তেমনই বিষয়রূপী প্রত্যয় দ্বারা প্রেরিত চিত্র-বিচিত্র নৃত্যরত বিজ্ঞান তরঙ্গের সঙ্গে আলয় সমুদ্র সর্বদা ক্রিয়াপরায়ণ থাকে।’

অর্থাৎ অভ্যন্তরীণ জ্যেয় পদার্থই পদার্থ (তিন ভৌতিক বিজ্ঞান), তাকে বাহ্যিক পদার্থের মতো মনে হয়। প্রত্যয় (হেতু), অণু, বস্তুতত্ত্ব সব কিছুই বিজ্ঞান। এই আলয়-বিজ্ঞান ও প্রতীত্য-সমুৎপন্ন (বিচ্ছিন্ন প্রবাহ শীর্ষে উৎপন্ন), এবং ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তনশীল। এই ক্ষণিকতার কারণেই তাকে প্রতি ক্ষণে ক্ষণে নতুন রূপ পরিগ্রহ করতে হয় এবং সেই কারণেই এই জগৎ বৈচিত্রময়।

সর্বাস্তিবাদেরও একই সিদ্ধান্ত, যা আমরা বুদ্ধের দর্শনে আলোচনা করেছি। এঁরা যা বাহ্যরূপ ও আন্তরিক বিজ্ঞান, উভয়ের প্রতীত্য-সমুৎপন্ন সত্তাকে স্বীকার করেন।

সৌত্রান্তিক নিজেদের বুদ্ধের সূত্রান্তের (সূত্র বা উপদেশ) অনুগামী বলে বর্ণনা করেন। এঁরা বাহ্য-বিজ্ঞানবাদের বিপরীত বাহ্যার্থবাদী অর্থাৎ মৌলিক তত্ত্ব ক্ষণিকরূপেই স্বীকার করেন।

বৌদ্ধ দর্শনের চরম বিকাশ

(৬০০ খ্রিঃ)

অসঙ্গ (৩৫০ খ্রিঃ)

ভারতীয় দর্শনকে তার বিকাশের চরম স্তরে পৌঁছে দেবার প্রথম সার্থক প্রচেষ্টা করেছিলেন অসঙ্গ ও বসুবন্ধু নামের দুই পেশোয়ারি পাঠান ভ্রাতৃদ্বয়। বড়ো ভাই অসঙ্গ যোগাচার ভূমি, উত্তরতন্ত্র ইত্যাদি গ্রন্থ লিখে বিজ্ঞানবাদকে সমর্থন করেছেন। ছোট ভাই বসুবন্ধুর প্রতিভা ছিল অধিকতর বহুমুখী। তিনি একদিকে বৈভাষিকসম্মত তথা বৌদ্ধ দর্শনের বহুসম্মত সর্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থ ‘অভিধর্মকোষ’ এবং তার সম্বন্ধে এক বিশাল ভাষ্য রচনা করেছিলেন; অন্যদিকে বিজ্ঞানবাদ সম্বন্ধে ‘বিজ্ঞপ্তি মাত্রতাসিদ্ধির’ বিংশিকা (কুড়িটি কারিকা) এবং ত্রিংশিকা (ত্রিশটি কারিকা) লিখে আপন অগ্রজের কর্মকাণ্ডকে সুব্যবস্থিতরূপে দার্শনিকদের সামনে উপস্থিত করেছেন। তাঁর তৃতীয় মহত্তম কর্মকাণ্ড ছিল ‘বাদবিধান’ নামের এক ন্যায়গ্রন্থের রচনা। যেখানে তিনি ভারতীয় ন্যায়শাস্ত্রকে নাগার্জুনের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থেকে প্রাপ্ত প্রেরণা দ্বারা আরও শৃঙ্খলাবদ্ধ করেছেন। সবচেয়ে বড়ো বিষয় ছিল, মধ্যযুগীয় ভারতের ন্যায়শাস্ত্রের জনক দিণ্ডিমাগের মতো শিষ্যদেরকে শিক্ষাদান করে প্রচলিত প্রযুক্তিকে এক বিশাল প্রবাহরূপে নিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত করা।

বৌদ্ধদের বিজ্ঞানবাদ—ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদের কাছে শংকরাচার্য এবং তাঁর অগ্রজ গুরু গৌড়পাদ কতরকম ভাবে ঋণী ছিলেন, সেই আলোচনা আমরা পরবর্তী পর্যায়ে করব। বস্তু গৌড়পাদের ‘মাণ্ডুক্য-কারিকা’ ‘অলাত শান্তি প্রকরণ’ প্রচ্ছন্ন কোনো রূপে নয় প্রকাশ্য ভাবেই একটি বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদী গ্রন্থ। বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদ এবং অসঙ্গ, এরা একে অপরের সঙ্গে এত গভীর সম্বন্ধযুক্ত ছিল যে বিজ্ঞানবাদ তার স্বনামের চেয়ে ‘যোগাচার দর্শন’ নামেই বেশি প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। আর ‘যোগাচার’ শব্দটিকেও নেয়া হয়েছে অসঙ্গের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ ‘যোগাচার ভূমি’ থেকে।

জীবনী

অসঙ্গের জন্ম হয়েছিল পেশোয়ারে এক ব্রাহ্মণ (পাঠান) বংশে। তাঁর অনুজ বসুবন্ধুও বৌদ্ধ জগতের একজন খ্যাতনামা দার্শনিক। তাঁর রচিত ‘অভিধর্মকোষ’ একটি বিশিষ্ট প্রাচীন গ্রন্থ তবে তাকে সর্বাঙ্গবাদ দর্শনের এক সুশৃঙ্খল বিচার মাত্র বলা যায়। কিন্তু বসুবন্ধু তাঁর অভিধর্মকোষের বিষয়ে সংস্কৃত ভাষায় যে বিস্তৃত টীকাভাষ্য লিখেছিলেন, সেই গ্রন্থের প্রতিলিপি বর্তমান গ্রন্থকার তাঁর তিব্বত যাত্রাকালে সংগ্রহ করেছেন এবং

সেটি এখন প্রকাশের প্রতীক্ষায়। বসুবন্ধুর অগ্রজ অসঙ্গের বিজ্ঞানবাদের উপরে 'বিজ্ঞপ্তিমাত্রতা সিদ্ধি' নামের 'বিংশিকা' ও 'ত্রিংশিকা' অর্থাৎ বিশ এবং ত্রিশ কারিকা সংবলিত দুই প্রকরণ ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছিল। বসুবন্ধু 'মধ্যকালীন ন্যায় শাস্ত্রের' জনক দিঙ্নাগের গুরু ছিলেন, এবং তিনি নিজেও 'বাদবিধান' নামে একটি ন্যায়গ্রন্থ লিখেছিলেন; কিন্তু শিষ্যের প্রতিভার সামনে গুরুর কৃতিত্ব অনেকটাই ম্লান হয়ে গিয়েছিল। বসুবন্ধু সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের পুত্র চন্দ্রগুপ্তের (বিক্রমাদিত্য) শিক্ষক ছিলেন। খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর উত্তরার্ধ পর্যন্ত আচার্য বসুবন্ধুর কার্যকাল পরিব্যাপ্ত ছিল। এই প্রসঙ্গে বর্তমান লেখকের 'বাদন্যায়' এবং 'অভিধর্মকোষ'-এর ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

অসঙ্গের গ্রন্থাবলি

'মহাযানোত্তর তন্ত্র', 'সূত্রালংকার', 'যোগাচার-ভূমি-বস্তুসংগ্রহণী', 'বোধিসত্ত্ব' ও 'পিটকাবাদ' এই পাঁচটি গ্রন্থকে অসঙ্গের দার্শনিক কৃতি বলে মনে করা হয়। এর মধ্যে শেষ দুটি সম্বন্ধে আমরা 'যোগাচার ভূমি' থেকেই জানতে পারি। প্রথম তিনটি গ্রন্থের চিনা অথবা তিব্বতি ভাষায় অনুবাদ আগেই পাওয়া গিয়েছে।

যোগাচার ভূমি—অসঙ্গের এই বিশাল গ্রন্থ নিম্নে বর্ণিত সতেরোটি ভূমিতে বিভক্ত :

১. ...বিজ্ঞান ভূমি
২. মন ভূমি
৩. সবিতর্ক-সবিচার ভূমি
৪. অবিতর্ক-বিচারমাত্রা ভূমি
৫. অবিতর্ক-অবিচার ভূমি
৬. সমাহিত ভূমি
৭. অসমাহিত ভূমি
৮. সচিন্তক ভূমি
৯. অচিন্তক ভূমি
১০. শ্রুতময়ী ভূমি
১১. চিন্তাময়ী ভূমি
১২. ভাবনাময়ী ভূমি
১৩. শ্রাবক ভূমি
১৪. প্রত্যেক বুদ্ধ ভূমি
১৫. বোধিসত্ত্ব ভূমি
১৬. সোপাধিক ভূমি
১৭. নিরূপাধিক ভূমি

('শ্রাবক ভূমি' এবং 'বোধিসত্ত্ব ভূমি' তিব্বতে গ্রাণ্ড ভালপাতার পুঁথির মধ্যে (খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দী) পাওয়া যায় না। অধ্যাপক ড. বোগিহারা (জাপান ১৯৩০ খ্রিঃ) 'বোধিসত্ত্ব ভূমি' গ্রন্থটি প্রকাশ করেছেন। তাছাড়া পৃথকভাবেও গ্রন্থটিকে পাওয়া গিয়েছে।

‘যোগাচার ভূমি’-তে আচার্য কোন কোন বিষয়ের উপরে বিস্তৃত বিচার করেছেন, তা নিম্নের বিষয়সূচি থেকে জানা যায় :

ভূমি ১

১. পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের বিজ্ঞানের ভূমিসমূহ
২. পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের বিজ্ঞান (= জ্ঞান)
১. চক্ষু বিজ্ঞান
- (১) বিজ্ঞানের স্বভাব
- (২) তার আশ্রয় (সহভূ, সমান্তর, বীজ)
- (৩) তার আলম্বন (Objects) বর্ণ, সংস্থান, বিজ্ঞপ্তি (ক্রিয়া)
- (৪) তার সহায় (সহযোগী)
- (৫) কর্ম
- ক. নিজ বিষয়ের আলম্বনের ক্রিয়া (বিজ্ঞপ্তি)
- খ. আপন স্বরূপের (স্বলক্ষণ) বিজ্ঞপ্তি
- গ. বর্তমানকালের বিজ্ঞপ্তি
- ঘ. একটি ক্ষণের বিজ্ঞপ্তি
- ঙ. মনন বিজ্ঞানের অনুবৃত্তি (পশ্চাদ্গমন)
- চ. ভালোমন্দের অনুবৃত্তি
২. শ্রোত্র বিজ্ঞান (স্বভাব ইত্যাদি সহ)
৩. ঘ্রাণ বিজ্ঞান (স্বভাব ইত্যাদি সহ)
৪. জিহ্বা বিজ্ঞান (স্বভাব ইত্যাদি সহ)
৫. কায় (ত্বক, ইন্দ্রিয়) বিজ্ঞান "
৬. পঞ্চ বিজ্ঞানের উৎপত্তি
৭. পঞ্চ বিজ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কিত
৮. চিত্ত
৮. পঞ্চ বিজ্ঞানের সহায়ক ইত্যাদি 'একই নৌকার যাত্রী' সদৃশ উপমা

১. মনের স্বভাব আদি

১. মনের স্বভাব
২. মনের আশ্রয়
৩. মনের আলম্বন (বিষয়)
৪. মনের সহায় (সহযোগী)
৫. মনের বিশেষ ধর্ম
১. আলম্বন বিজ্ঞপ্তি
২. বিশেষ কর্ম
- ক. বিষয়ের বিকল্পনা
- খ. উপনিধান
- গ. মত্ত হওয়া
- ঘ. উন্মত্ত হওয়া
- ঙ. শয়ন
- চ. জাগরণ
- ছ. মূর্ছিত হওয়া
- জ. মূর্ছা ভঙ্গ
- ঝ. কায়িক, বাচনিক কর্ম করা
- ঞ. বিরক্ত হওয়া
- ট. বিরক্তির অবসান
- ঠ. শুভ অবস্থার মূল ছিন্ন হওয়া
- ড. শুভ অবস্থার মূল যুক্ত হওয়া
১. শরীর থেকে মনের চ্যুতি ও উৎপত্তি
২. শরীর থেকে চ্যুতি (মৃত, পরিত্যক্ত)
২. এক শরীর থেকে অন্য শরীরের মধ্যকার অবস্থার সূক্ষ্ম কায়িক মন (অন্তরাভাব)
২. অন্য শরীরে উৎপত্তি
১. উৎপত্তিস্থানে যাওয়ার অভিপ্রায়
২. গর্ভে বিকাশ

ভূমি ২.

মনোভূমি

- অ. যোনি দোষ
 আ. বীজ দোষ
 ই. পূর্ব কর্মের দোষ
 গ. অন্তরাভবের দৃষ্টিতে পরিবর্তন
 ঘ. পাপী এবং পুণ্যাত্মার জন্মকুল
 ঙ. গর্ভাশয়ে আলয়-বিজ্ঞান
 (প্রবাহ) সংযোগের পদ্ধতি
 চ. গর্ভের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা
 (i) কলম অবস্থা (ii) অর্বদ অবস্থা
 (iii) পেশি অবস্থা (iv) ঘন অবস্থা
 (v) প্রশাখা অবস্থা (vi) কেশ,
 রোম, নখের অবস্থা (vii) ইন্দ্রিয়ের
 গঠন (viii) স্ত্রী-পুরুষ লিঙ্গ প্রকাশ
 ছ. শারীরিক বিকার
 (i) বর্ণে বিকার
 (ii) চর্মে বিকার
 (iii) অঙ্গে বিকার
 জ. গর্ভে স্ত্রী অথবা পুরুষ সৃষ্টির লক্ষণ
 ৩. গর্ভের বাইরে আসা
 ৪. শিশু পালন
 ৩. জগতের প্রলয় এবং প্রাদুর্ভাব
 (১) প্রলয়-ক্রম (সংবর্ধন)
 ক. দেবতাদের আয়ু
 খ. কল্পের পরিণাম
 ২. প্রাদুর্ভাব (বিবর্তন)
 (১) বিভিন্ন লোকের প্রাদুর্ভাব
 ক. ব্রহ্মলোক ইত্যাদির প্রাদুর্ভাব
 খ. পৃথিবীর প্রাদুর্ভাব
 (i) সুমেরু ইত্যাদির প্রাদুর্ভাব
 (ii) নরকের প্রাদুর্ভাব
 (iii) দ্বীপগুলির প্রাদুর্ভাব
 (vi) নাগলোকের প্রাদুর্ভাব
 (v) যক্ষলোকের প্রাদুর্ভাব

- ক. গর্ভাধানে সহায়ক
 খ. গর্ভাধানে বাধক
 (vi) বৈশ্রবণ ইত্যাদি চার
 মহারাজের প্রাদুর্ভাব
 (vii) হিমালয়ের প্রাদুর্ভাব
 (vii) অনবতগুসর (মানস সরোবর)
 প্রাদুর্ভাব
 (ix) সুমেরু পার্শ্বের প্রাদুর্ভাব
 ৫. ভূতের সঙ্গে অথবা পৃথক থাকা
 § ৭. চিত্ত
 § ৮. চিত্ত সম্বন্ধীয় চৈতন্য তত্ত্ব
 (বিজ্ঞানের উৎপত্তি)
 § ৪. স্বভূতের প্রাদুর্ভাব
 ১. প্রথম কল্পের সত্ত্ব মানব
 (i) তার আহাৰ
 (ii) মনোবিকারের ফলে আহাৰ ভ্রাস
 (iii) প্রথম রাজা নির্বাচন
 ২. গ্রহ, নক্ষত্র ইত্যাদির প্রাদুর্ভাব
 (i) সত্ত্বদের জ্যোতি অস্তর্ধান সূর্য,
 চন্দ্র, নক্ষত্র ইত্যাদির
 প্রাদুর্ভাব
 (ii) সূর্য ও চন্দ্রের গতি
 (iii) ঋতুর পরিবর্তন
 (vi) চন্দ্রের ভ্রাস কলা বৃদ্ধি
 § ৫. সহস্র শিখর সংবলিত লোক
 (Local Universe) বুদ্ধের
 ক্ষেত্র
 § ৬. রূপ (জড় তত্ত্ব)
 (i) রূপের বীজ (মূল রূপ)
 (ii) মহাভূত
 (iii) পরমাণু (অবয়ব)
 ১. চৈতন্যিক মনস্কারাদি
 (i) তার স্বভাব (ii) তার কর্ম
 § ৯. তিন কাল (জন্ম, জরা
 ইত্যাদি)

১০. ছয় প্রকারের বিজ্ঞানরূপ)

- (ক) বিজ্ঞানের চার প্রত্যয়
- (i) প্রত্যয় (ii) প্রত্যয়ের ভেদ
- (খ) আয়তনের ছয় প্রকার ভেদ
- (i) ইন্দ্রিয়ের ভেদ
- (ক) দৃষ্টি ভেদ (খ) শ্রোত্র ভেদ
- (গ) ঘ্রাণ ভেদ (ঘ) রসনা ভেদ
- (ঙ) কায় ভেদ (চ) মন ভেদ
- (ii) আলম্বনের ছয় ভেদ
- (ক) রূপ ভেদ (খ) শব্দ ভেদ
- (গ) গন্ধ ভেদ (ঘ) রস ভেদ
- (ঙ) স্পর্শ ভেদ (চ) ধর্ম ভেদ

১১. নববস্তুর বিশিষ্ট বুদ্ধবচন

ভূমি ৩. ৪. ৫.

(সবিতর্ক-সবিচার ভূমি, অবিতর্ক-

অবিচার মাত্রা ভূমি)

সবিতর্ক-সবিচার ভূমি

১. ধাতুর বিজ্ঞপ্তি থেকে

১. ধাতুর প্রজ্ঞাপন দ্বারা

(i) কর্ম (স্থূল) ধাতু (লোক)

(ii) রূপ ধাতু

(iii) অরূপা ধাতু

২. পরিমাণের প্রজ্ঞাপন দ্বারা

(i) শরীরের পরিমাণ

(ii) আয়ুর পরিমাণ

৩. ভোগের প্রজ্ঞাপন দ্বারা

(ii) দুঃখ ভোগ

(ক) নরক

(অ) মহানরক (আট)

(আ) ছোট (সামন্ত) নরক (চার)

(ই) শীতল নরক (আট)

(ঈ) প্রত্যেক নরক

(ক) তির্যক যোনি

(খ) প্রেত যোনি

(ঙ) বিনিশ্চয়

(গ) মনুষ্য যোনি (ঘ) দেব যোনি

(ii) সুখভোগ

(ক) নরক যোনিতে

(খ) তির্যক যোনিতে (পশুপক্ষী)

(গ) মনুষ্য যোনিতে (চক্রবর্তী
হয়ে)

(ঘ) দেব যোনিতে

(অ) স্বর্গে ইন্দ্র এবং দেবপুত্র

উত্তরকুরু ও অসুর

(আ) রূপলোকের দেবতা

(ই) অরূপলোকের দেবতা

(৩) বিশেষ সুখ দুঃখ

(৪) আহার ভোগ

(৫) পরিভোগ

৪. উপপত্তি (জন্ম) প্রজ্ঞাপন দ্বারা

৫. আত্মভাব

৬. হেতু ও ফলের অবস্থা

(১) হেতু এবং ফলের (কর্ম) লক্ষণ

(২) হেতু-প্রত্যয়ের অধিষ্ঠান

(৩) হেতু-প্রত্যয়ের ভেদ

(ক) হেতুর ভেদ (খ) প্রত্যয়ের ভেদ

(গ) ফলের ভেদ

৭. হেতু = প্রত্যয় = ফলব্যবস্থা

(ক) হেতু প্রজ্ঞাপন

(খ) প্রত্যয় প্রজ্ঞাপন

(গ) ফল প্রজ্ঞাপন

(ঘ) হেতু = ব্যবস্থা

১২. লক্ষণ প্রজ্ঞপ্তি থেকে

১. শরীর ইত্যাদি

(১) শরীর

(২) আলম্বন (বিষয়)

(৩) আকার

(৪) সমুত্থান

(৫) প্রভেদ

(১৬) জ্যোতিষ শকুন (কৌতুক

- (৭) প্রবৃত্তি
২. বিতর্ক-বিচার গতিভেদ থেকে
(১) নারকীদের গতি
(২) প্রেত এবং তির্যকদের গতি
(৩) দেবদের গতি
(ক) কামলোকের দেবতা
(খ) প্রথম ধ্যানের ভূমিবাসীর দেবতা
[৩. যোনি শোমনস্কার-এর প্রজ্ঞপ্তি থেকে
(১) অধিষ্ঠান, (২) বস্তু (৩) এষণা
(৪) পরিভোগ (৫) প্রতিপত্তি
[৪. অয়োনিশোমনস্কার প্রজ্ঞপ্তি থেকে
১. অপরের বাদ (মত)
(১) সন্দ্বাদ (সাংখ্য)
(২) অনভিব্যক্তি-বাদ (সাংখ্য ও ব্যাকরণ)
(৩) দ্রব্যসন্দ্বাদ (সর্বাভিব্যক্তিবাদী)
(৪) আত্মবাদ (উপনিষদ)
(৫) শাস্ত্রবাদ (কাত্যায়ন)
(৬) পূর্বকৃত হেতুবাদ (জৈন)
(৭) ঈশ্বরাদি-কর্তাবাদ (নৈয়ায়িক)
(৮) হিংসা ধর্মবাদ (যাজ্ঞিক ও মীমাংসক)
(৯) অন্তানন্তিক বাদ
(১) অমর বিক্ষেপবাদ (বেলটিটু-পুত্ত)
(১১) অহেতুকবাদ (গোশাল)
(১২) উচ্ছেদবাদ (লোকায়ত)
(১৩) নাস্তিক্যবাদ (কেশকম্বল)
(১৪) অগ্রবাদ (ব্রাহ্মণ)
(১৫) শুদ্ধিবাদ (ব্রাহ্মণ)
২। সংজ্ঞা ভেদ প্রজ্ঞপ্তি
(১) পদ (২) ভ্রান্তি (৩) প্রপঞ্চ

মঙ্গল বাদ)

[৫. সংক্লেশ প্রজ্ঞপ্তি থেকে

১. ক্লেশ (চিহ্নের মল)

(১) ক্লেশের স্বভাব

(২) ক্লেশ ভেদ

(৩) ক্লেশের হেতু

(৪) ক্লেশাবস্থা

(৫) ক্লেশের মুখ

(৬) ক্লেশের অতিশয়তা

(৭) ক্লেশের বিপর্যয়

(৮) ক্লেশের পর্যায

(৯) ক্লেশের রকমভেদ

২. কর্ম

৩. জন্ম

(১) কর্মের ভেদ (২) কর্মের প্রবৃত্তি

৬. প্রতীত্য সমুৎপাদ

ভূমি ৬

(সমাহিত ভূমি)

[১. ধ্যান

২. নাম গণনা

ভূমি ৭

(অসমাহিতা ভূমি)

ভূমি ৮, ৯

(অচিহ্নকা ভূমি)

ভূমি ১০

(সচিহ্নকা ভূমি)

(শ্রুতময়ী ভূমি) পঞ্চবিদ্যা

[১. অধ্যাত্ম চিন্তা

১. বস্তু প্রজ্ঞপ্তি

(১) সূত্র বস্তু

(২) বিনয় বস্তু

(৩) মাতৃকা বস্তু

(প্রত্যক্ষের ভেদ—ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ,

মন, প্রত্যক্ষ, লোক, প্রত্যক্ষ, শুদ্ধ

- (৪) স্থিতি (৫) তত্ত্ব (৬) শুভ
 (৭) বর (৮) প্রশম (৯) প্রকৃতি
 (১০) যুক্তি (১১) সংকেত
 (১২) অভিসময়
 ৩. বুদ্ধ শাসনের অর্থ প্রজ্ঞাপ্তি
 ৪. বুদ্ধবচনে জ্ঞেয়র অধিষ্ঠান
 ২. চিকিৎসা বিদ্যা
 ৩. হেতু (বাদ) বিদ্যা
 ১. বাদ
 (১) বাদ (২) প্রতিবাদ (৩) বিবাদ
 (৪) অপবাদ (৫) অনুবাদ
 (৬) অববাদ
 ২. বাদের অধিকরণ ৩. বাদের অধিষ্ঠান (দশ)
 (১) দুই প্রকারের সাধ্য
 (২) আট প্রকারের সাধন
 (ক) প্রতিজ্ঞা (খ) হেতু
 (গ) উদাহরণ (ঘ) সারূপ্য
 (অ) লিঙ্গ সাদৃশ্য
 (আ) স্বভাব সাদৃশ্য
 (ই) কর্ম সাদৃশ্য
 (ঈ) ধর্ম সাদৃশ্য
 (উ) হেতু ফলে (কার্য-কারণ) সাদৃশ্য
 (উ) বৈরূপ্য
 (ঝ) প্রত্যক্ষ
 (৯) অ-পরোক্ষ
 (এ) অণুভূয়িত, অনুভূয়িত, অনভূয়
 (ঐ) অভ্রান্ত
 (ভ্রান্তিসমূহ—সংজ্ঞা, সংখ্যা, সংস্থান বর্ণ, কর্ম, চিত্ত, দৃষ্টি দ্বারা সম্বন্ধ রক্ষাকারী)
 (২) পরিবৎ পরীক্ষা
 (৩) কৌশল্য (নৈপুণ্য) পরীক্ষা
 ৭. বাদে উপকারী বচন

- (যোগী)-প্রত্যক্ষ)
 (৩) অনুমান
 (i) লিঙ্গ দ্বারা (ii) স্বভাব দ্বারা
 (iii) কর্ম দ্বারা (iv) ধর্ম দ্বারা
 (iv) হেতুফল (কার্য-কারণ) দ্বারা
 (vi) আগাগম (শব্দ)
 ৪. বাদের অলংকার
 (১) নিজের ও অপরের বাদের অভিজ্ঞতা
 (২) বাক্কর্ম সম্পন্নতা (ভাষণপটুতা)
 (ক) অগ্রাহ্য ভাষণ (খ) লঘু (মিত্র) ভাষণ (গ) ওজস্বী ভাষণ
 (ঘ) পূর্বাপর সম্বন্ধ ভাষণ
 (ঙ) সদর্থক ভাষণ
 (৩) বিশারদ হওয়া
 (৪) স্থিরতা
 (৫) দাক্ষিণ্য (উদারতা)
 ৫. বাদের নিগ্রহ
 (১) কথাত্যাগ (২) কথাভাব
 (৩) কথা দোষ
 (ক) অসত্য কথন
 (খ) সংবদ্ধ (কুপিত) বচন
 (গ) অগমক বচন
 (ঘ) অমিতি বচন
 (ঙ) অনর্থ যুক্ত বচন
 (চ) অকাল বচন
 (ছ) অ-স্থির বচন
 (জ) অ-দীপ্ত বচন
 (ঝ) অ-প্রবুদ্ধ বচন
 ৬. বাদ নিঃসরণ
 (১) গুণ দোষ পরীক্ষা
 (৩) নির্মাণ প্রমুখতা
 (৪) চিত্ত-মুক্তিকে পরিপক্ব করার প্রজ্ঞার পরিপাক

৪. শব্দ বিদ্যা
 ১. ধর্ম-প্রজ্ঞপ্তি
 ২. অর্থ-প্রজ্ঞপ্তি
 ৩. পুদ্গল-প্রজ্ঞপ্তি
 ৪. কাল-প্রজ্ঞপ্তি
 ৫. সংখ্যা-প্রজ্ঞপ্তি
 ৬. অধিকরণ-প্রজ্ঞপ্তি
 ৫. শিল্প-কর্মস্থান বিদ্যা

ভূমি ১১

(চিন্তাময়ী ভূমি)

১. স্বভাব শুদ্ধি
 ২. জ্ঞেয়র (প্রেমের) সংচয়
 ১. সৎ (বস্তু)
 (১) স্বলক্ষণ সৎ
 (২) সামান্য লক্ষণ সৎ
 (৩) সংকেত লক্ষণ সৎ
 (৪) হেতুলক্ষণ সৎ
 (৫) ফল কার্যলক্ষণ সৎ
 ২. অসৎ (বস্তু)
 (১) অনুৎপন্ন অসৎ
 (২) নিরুদ্ধ অসৎ
 (৩) অন্যান্য অসৎ
 (৪) পরমার্থ অসৎ
 ৩. অস্তিত্ব
 ৪. নাস্তিত্ব
 ৩. ধর্মের সঞ্চয়
 ২. অঙ্গতঃ সংগ্রহ
 ১. অভিনিবৃত্তি সংপদ
 ২. সদ্ধর্ম শ্রবণ-সংপদ
 (১) যথার্থ উপদেশ
 (২) যথার্থ শ্রবণ
 ১. ভূমি-প্রজ্ঞপ্তি
 ২. উপশম-প্রজ্ঞপ্তি
 ৩. উপাধি-প্রজ্ঞপ্তি
 (১) প্রজ্ঞপ্তি-উপাধি

(৫) প্রতিপক্ষ ভাবনা

ভূমি ১২

(ভাবনাময়ী ভূমি)

১. স্থানতা সংগ্রহ
 ১. ভাবনার পদ
 ২. ভাবনা-উপনিষদ
 ৩. যোগ-ভাবনা
 ৪. ভাবনা-ফল

ভূমি ১৩

(শ্রাবক ভূমি)

ভূমি ১৪

(প্রত্যেকবুদ্ধ ভূমি)

১. গোত্র
 ১. মন্দরজের গোত্র
 (১) সূত্রের সঞ্চয়
 (২) গাঁথাসমূহের সঞ্চয় (এখানে ত্রিপিটকের শতাধিক গাঁথার সঞ্চয় বর্তমান)
 ২. মন্দ করুণার গোত্র
 ৩. মধ্য ইন্দ্রিয়ের গোত্র
 ২. মার্গ
 ৩. সমুদাগম
 ১. গণ্ডারের শিঙের মতো একাকী বিচরণকারী।
 ২. জমায়েতের সঙ্গে বিচরণকারী
 ৪. চার
 ভূমি ১৫
 (বোধিসত্ত্ব-ভূমি)
 ভূমি ১৬
 (স-উপাধি-ভূমি)
 তিন প্রজ্ঞপ্তি থেকে
 ভূমি ১৭
 উপাধি-রহিত ভূমি)
 ভূমি প্রবৃত্তি থেকে
 ২. নিবৃত্তি প্রবৃত্তি থেকে

- | | |
|--------------------------|------------------------------------|
| (২) পরিগ্রহ-উপাধি | (১) ব্যাপশমা নিবৃত্তি |
| (৩) স্থিতি-প্রজ্ঞপ্তি | (২) অব্যাবাধ নিবৃত্তি |
| (৪) প্রবৃত্তি-প্রজ্ঞপ্তি | ৩. নিবৃত্তি পর্যায় বিজ্ঞপ্তি থেকে |
| (৫) অন্তরায়-প্রজ্ঞপ্তি | ('যোগাচার ভূমি' (সংস্কৃত) |
| (৬) দুঃখ-প্রজ্ঞপ্তি | মহামহোপাধ্যায় বিধুশেখর |
| (৭) রতি-প্রজ্ঞপ্তি | ভট্টাচার্য কর্তৃক সম্পাদিত) |
| (৮) অন্য-প্রজ্ঞপ্তি | |

দার্শনিক বিচার

অসঙ্গ দ্ধণিক বিজ্ঞানবাদী ছিলেন। এই বিজ্ঞানবাদ অসঙ্গের আগেই 'লংকাবতার সূত্র', 'সন্ধি-নির্মোচন সূত্র' ইত্যাদি মহাযানী সূত্রগুলির মধ্যে আগেই সঞ্চিত ছিল। এই সূত্রগুলিকে বুদ্ধবচন বলা হয়; কিন্তু অধিকাংশ মহাযানী সূত্রের মতো এগুলিও বুদ্ধের নামে রচিত পরবর্তীকালের সূত্র। লংকাবতার সূত্র—বুদ্ধ দক্ষিণের লংকা দ্বীপের (সামন্তকূট?) পর্বতে উপদেশ দিয়েছিলেন। বস্তুতপক্ষে এই সূত্রকে দক্ষিণে নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা থেকে উত্তর পশ্চিমে গান্ধার অঞ্চলের পার্বত্য উপত্যকায় নিয়ে যাওয়া অধিকতর যুক্তি-যুক্ত। বৌদ্ধদের বিজ্ঞানবাদ, 'সবং অনিচ্ছং' (সবই অনিত্য) অথবা দ্ধণিক বাদের সঙ্গে প্লেটোর (স্থির) বিজ্ঞানবাদের এক মিশ্রণ মাত্র, আর এই মিশ্রণ সেই গান্ধারেই সংঘটিত হয়েছিল, যেখানে গ্রিক ভাস্কর্যের প্রভাবে ভারতীয় ভাস্কর্য শিল্প জন্ম নিয়েছিল। বিজ্ঞানবাদ একমাত্র বিজ্ঞানকেই পরমার্থ তত্ত্ব স্বীকার করে, এই তথ্য আগেই বলা হয়েছে। এছাড়া তারা পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের পঞ্চ বিজ্ঞান এবং ষষ্ঠ মন-বিজ্ঞান-এর অতিরিক্ত আরও একটি বিজ্ঞানকে স্বীকার করে যার নাম আলয়-বিজ্ঞান। এই আলয়-বিজ্ঞান সেই তরঙ্গায়িত সমুদ্র, যেখানে তরঙ্গের মতো বিশ্বের সমস্ত জড় চেতন বস্তুরাশি প্রকট এবং বিলীন হতে থাকে।

আমরা অসঙ্গের দার্শনিক বিচারকে তাঁর যোগাচার ভূমির ভিত্তিতেই করে থাকি। এখানে স্বত্ব্য যে 'যোগাচার ভূমি' কোনো সুসংবদ্ধ দার্শনিক গ্রন্থ নয়। এই গ্রন্থ বুদ্ধঘোষের 'বিশুদ্ধি মগ্গ' (বিশুদ্ধি মার্গ)-এর মতো অধিকাংশই বৌদ্ধ সদাচার, যোগ এবং ধর্মতত্ত্বের বিস্তৃত বিবরণ মাত্র। অসঙ্গ তাঁর সমকালীন তরুণদের মতো বুদ্ধের কোনো একটি গাঁথাকে ভিত্তি করে গ্রন্থ রচনা করেননি। 'গাথার্থ-পরিচয়'-এ (যোগাচার ভূমি, স্তম্ভময়ী ভূমি ১০) অবশ্য ১৭৮টি গাঁথা রয়েছে যেগুলি মহাযান এবং হীনযান এই দুই পিটক থেকেই নেওয়া এবং এর ফলে এই গ্রন্থে দুটি ভিন্নমত অন্তত একবার একত্রিত হয়েছে। বুদ্ধঘোষের মতো অসঙ্গও সূত্রের ভাষাশৈলীকে বিশেষ ভাবে অনুকরণ করেছেন, যার ফলে আজ আমাদের অনেক সময় ভুল হয়ে যায় যে, আমরা পরিমার্জিত সংস্কৃতের কালের কোনো গ্রন্থ পড়ছি, না কি পিটককালের কোনো গ্রন্থের সংস্কৃতে অনুবাদ পাঠ করছি। বুদ্ধঘোষ তাঁর গ্রন্থটি পালি ভাষায় রচনা করেছিলেন, কারণ তাঁর সময় বসুবন্ধু, কালিদাসের সময়ের সুললিত সংস্কৃত ভাষার ব্যবহার আরম্ভ হয়নি। বাধ্য

হয়েই বুদ্ধঘোষকে পালি ভাষার শৈলী অনুসরণ করতে হয়েছিল। কিন্তু অসঙ্গের এরকম কোনো বাধ্যবাধকতা ছিল না এবং তিনি তাঁর কীর্তিকে সম্পূর্ণ ভাবে বুদ্ধঘোষের নামের সঙ্গে মিলিয়ে দিতেও আগ্রহী ছিলেন না, তা সত্ত্বেও তিনি কেন সেই ভাষাশৈলী অনুসরণ করেছিলেন, যাতে কোনো বক্তব্যকে সংক্ষেপে প্রকাশই করা যায় না? এর কারণ সম্ভবত তৎকালীন পাঠক সমাজ। তারা যে সূত্রশৈলীর সঙ্গে পরিচিত ছিল, যাতে তাদের পক্ষে সহজবোধ্য হয় সেজন্য তিনি তাঁর গ্রন্থে সেই শৈলীকেই অনুসরণ করেছিলেন।

আমরা এখানে সম্পূর্ণ 'যোগাচার ভূমি' গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে চাই না, আমরা কেবলমাত্র অসঙ্গের জ্যে (= প্রমেয়), বিজ্ঞানবাদ, প্রতীত্য-সমুৎপাদ, হেতু (বাদ) বিদ্যা, পরবাদ খণ্ডন এবং দ্রব্য পরমাণু সম্বন্ধীয় বিচার-বিশ্লেষণ নিয়েই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখছি।

জ্যে (প্রমেয়) বিষয়

পরীক্ষণীয় পদার্থকেই জ্যে বলা হয়। (যোগাচার ভূমি, চিন্তাময়ী ভূমি ১১) এর চারটি প্রকারভেদ—সৎ অথবা ভাবরূপ, অসৎ অথবা অভাবরূপ, অস্তিত্ব এবং নাস্তিত্ব।

(ক) সৎ—পাঁচ প্রকারের। (১) স্বলক্ষণ (নিজস্বরূপে) সৎ; (২) সামান্য (জাতি ইত্যাদি রূপে) সৎ; (৩) সংকেত লক্ষণ (সংকেতের রূপে) সৎ; (৪) হেতুলক্ষণ (ইষ্ট-অনিষ্ট হেতুরূপে) সৎ; (৫) ফললক্ষণ (পরিণাম) সৎ।

(খ) অসৎ—এও পাঁচ প্রকারের। (১) অনুৎপন্ন (যে পদার্থ উৎপন্ন হয়নি, অতএব) অসৎ; (২) নিরুদ্ধ (যা উৎপন্ন হওয়ার পর নিরুদ্ধ হয়ে গেছে, বা নষ্ট হয়ে গেছে, অতএব) অসৎ; (৩) অন্যান্য (গরু, ঘোড়া ন, ঘোড়াও গরু নয়। এ ভাবে একে অন্যের রূপে) অসৎ; (৪) পরমার্থ (মূলেগমন) অসৎ; (৫) অত্যন্ত (বন্ধা পুত্রের মতো) অসৎ।

(গ) অস্তিত্ব—একটি পাঁচ প্রকারের। (১) পরিনিপ্পনলক্ষণ—যে অস্তিত্ব পরমার্থত আছে (যেমন অসঙ্গের মতে বিজ্ঞান আর বস্তুবাদীদের মতে মূল বস্তুবাদ); (২) পরতত্ত্বলক্ষণ অস্তিত্ব—প্রতীত্য সমুৎপন্ন ('অমুকের আবির্ভাবের পরই অমুক অস্তিত্বে আসে'); (৩) পরিকল্পিতলক্ষণ অস্তিত্ব, যাকে সংকেত (convention) অস্তিত্বও বলা হয়; (৪) বিশেষলক্ষণ অস্তিত্ব (কাল, জন্ম, মৃত্যু ইত্যাদি সম্বন্ধীয়), (৫) অব্যক্তলক্ষণ অস্তিত্ব; যাকে ইয়া বা না এই দুই ভাগে ভাগ করা যায় না, যেমন বৌদ্ধধর্মে পুংগল = চেতনাকে স্বল্প থেকে পৃথক বলা যায় না আবার একীভূতও বলা যায় না।

(ঘ) নাস্তিত্ব—এও পাঁচ প্রকারের। (১) পরমার্থরূপে নাস্তিত্ব; (২) স্বতন্ত্ররূপে নাস্তিত্ব; (৩) সর্বসর্বরূপে নাস্তিত্ব; (৪) অবিশেষরূপে নাস্তিত্ব এবং (৫) অবক্তব্য রূপে নাস্তিত্ব; (৩) সর্বসর্বরূপে নাস্তিত্ব; (৪) অবিশেষরূপে নাস্তিত্ব এবং (৫) অবক্তব্য রূপে নাস্তিত্ব।

পরমার্থত সৎ, অসৎ অস্তিত্ব অথবা নাস্তিত্বকে বর্ণনা করতে গিয়ে অসঙ্গ 'পরমার্থ-গাঁথা' নামে মহাযান সূত্রের অনেক গাঁথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এর মধ্যে বস্তুর অভ্যন্তরে

কোনো স্থির তত্ত্বের সত্তাকে অস্বীকার করে তাকে শূন্য (সারশূন্য) বলা হয়েছে; বাহ্য এবং মানসতত্ত্বকে সারশূন্য প্রমাণ করতে গিয়ে তিনি ক্ষণিক (ক্ষণে ক্ষণে বিনাশী) বলেছেন; এবং কোনো ঈশ্বর জাতীয় জনক অথবা নাশকের অস্তিত্ব অস্বীকার করে সমস্ত জাগতিক বস্তুকেই স্বরস অর্থাৎ স্বভাবভঙ্গুর বলেছেন। রূপ (matter), বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার এবং বিজ্ঞান এই পঞ্চস্কন্ধে স্থিরতার আভাস বা উক্তি ভ্রমমাত্র, বস্তুত এ হল বুদ্ধবুদ্ধ কিংবা মরীচিকার মতোই অসার।

‘আধ্যাত্মিক (মানস জগৎ) শূন্য, বাহ্যজগৎও শূন্য’। এমন কোনো আত্মা নেই যা শূন্যতাকে অনুভব করতে পারে। ॥৩॥

‘কোনো আত্মার অস্তিত্ব নেই, সবই বিপরীত কল্পনা। সমস্ত পদার্থ নিজ কারণেই উৎপন্ন।’ ॥৪॥

‘সমস্ত সংস্কারই (উৎপন্ন পদার্থ) ক্ষণিক।’ ॥৫॥

‘তাকে দ্বিতীয় কেউ উৎপন্ন করে না এবং সে নিজেও উৎপন্ন হয় না। প্রত্যয়ের কারণে পদার্থ (ভাব) কখনও পুরোনো হয় না, প্রতি মুহূর্তে নব নব রূপে জন্ম নেয়।’ ॥৮॥

‘তাকে দ্বিতীয় কেউ বিনষ্ট করে না, সে স্বয়ং বিনষ্ট হয় না। প্রত্যয়ের (পূর্ব কারণ) কারণেই পদার্থ উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন পদার্থ মাত্রই স্বভাবভঙ্গুর।’ ॥৯॥

‘রূপ (বস্তু তত্ত্ব) বুদ্ধবুদ্ধের মতো, বেদনাও (ক্ষণিক) বুদ্ধবুদ্ধের ন্যায়।’ ॥১৭॥

‘সংজ্ঞা মরীচিকা সদৃশ। সংস্কার এবং বিজ্ঞানকেও সূর্যবংশজ বুদ্ধ মায়ী মরীচিকারূপে ব্যক্ত করেছেন।’ ॥১৮॥

বিজ্ঞানবাদ

(ক) আলয়-বিজ্ঞান—বাহ্য-অভ্যন্তরীণ জগৎ এবং জড়-চেতন জগৎ, যা কিছু জগতে আছে তা সমস্তই বিজ্ঞানের পরিণাম। বিজ্ঞান সমষ্টিকে আলয়-বিজ্ঞান বলা হয়—এ থেকেই তরঙ্গায়িতরূপে জগৎ এবং সমস্ত জাগতিক বস্তু উৎপন্ন হয়েছে। এই আলয়-বিজ্ঞান থেকে যেমন জড়-জগৎ উৎপন্ন হয়েছে, তেমনই ব্যক্তি-বিজ্ঞান (প্রবৃত্তি বিজ্ঞান) পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের এবং ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের মনোবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে।

(খ) পঞ্চ ইন্দ্রিয় বিজ্ঞান—ইন্দ্রিয়ের আশ্রয় থেকে যে বিজ্ঞান (চেতনা) জন্ম নেয় তাকেই ইন্দ্রিয় বিজ্ঞান বলা হয়। আপন আশ্রয়, চক্ষু ইত্যাদি পঞ্চেন্দ্রিয়ের মতো ইন্দ্রিয়বিজ্ঞানও পাঁচ রকমের।

(a) চক্ষুবিজ্ঞান (যোগাচার ভূমি)—(i) স্বভাব—চক্ষুর আশ্রয়ের সাহায্যে যে বিজ্ঞান প্রাপ্ত হয় সেটাই চক্ষু বিজ্ঞান, এবং এটাই তার স্বরূপ।

(ii) আশ্রয়—চক্ষু বিজ্ঞানের আশ্রয় তিনটি, যা সঙ্গে সঙ্গে অস্তিত্বে আসে, এবং সঙ্গে সঙ্গেই বিলীন হয়ে যায়, অতএব একে সহজাত আশ্রয় বলা যায়। মন, এই বিজ্ঞানেরই উপজ, এবং সেও এই বিজ্ঞানকেই আশ্রয় করে; অতএব একে সমানান্তর আশ্রয় বলা যেতে পারে। রূপ-ইন্দ্রিয়, মন তথা সারা জগতের বীজ যেখানে সঞ্চিত

থাকে, সেই সর্বজীবের আশ্রয়ের অপর নাম আশ্রয়-বিজ্ঞান। এই তিন আশ্রয়ের মধ্যে চক্ষুরূপ বাস্তব হওয়ার জন্য তা রূপী আশ্রয় আর বাকি সব অরূপী আশ্রয়।

(iii) আলম্বন বা বিষয়—বর্ণ (রং), সংস্থান (আকৃতি) এবং বিজ্ঞপ্তি (ক্রিয়া)। (অ) বর্ণ—নীল, পীত, লাল, সাদা, ছায়া, রৌদ্র, প্রকাশ, অন্ধকার, মন্দ, ধূম, রজ, পৃথিবী এবং আকাশ। (আ) সংস্থান—দীর্ঘ, ত্রুষ্ণ, বৃত্ত, পরিমণ্ডল, অণু, স্থূল, উন্নত এবং অবনত। (ই) বিজ্ঞপ্তি—গ্রহণ, বর্জন, সংকোচন, প্রসারণ, অবস্থান, উপবেশন, দণ্ডায়মান, শয়ন, গমন ইত্যাদি।

(iv) সহায় চক্ষুবিজ্ঞানের সঙ্গে উৎপন্ন হওয়া একই আলম্বনের চৈতসিক ধর্ম, যেমন, সংজ্ঞা, বেদনা ইত্যাদি ইত্যাদি।

(v) কর্ম—ছয় প্রকারের—(১) স্ববিশ্ব অবলম্বী; (২) স্বলক্ষণ; (৩) বর্তমানকাল; (৪) এ মুহূর্ত; (৫) শুদ্ধ (কুশল), অশুদ্ধ—মনোবিজ্ঞান কর্মের উত্থান, এই দুই আকারের অনুবৃত্তি; (৬) ইষ্ট অথবা অনিষ্ট ফল গ্রহণ।

(d-c) শ্রোত্র ইত্যাদি বিজ্ঞান—এই ভাবেই শ্রোত্র (কর্ণ), ঘ্রাণ, জিহ্বা এবং কায় (ত্বক) ইন্দ্রিয় বিজ্ঞান।

(গ) মনোবিজ্ঞান—এটি ষষ্ঠ বিজ্ঞান। এর স্বভাব ইত্যাদি বিদ্যমান। (অ) স্বভাব—চিন্তা, বিজ্ঞান এবং মনের স্বরূপ অথবা স্বভাব। সমস্ত বীজের (মুখ্য কারণ) আশ্রয় স্বরূপ হল আশ্রয়-বিজ্ঞান অথবা চিন্তা। (২) মন সর্বদা অবিদ্যা ‘আমিই আত্মা’ এই ভ্রান্ত দৃষ্টি, অস্মিমান এবং তৃষ্ণা—এই চারটি ক্রেশে (চিন্তামল) ভরা থাকে; (৩) বিজ্ঞান যা আলম্বন অর্থাৎ বিষয় ক্রিয়াতে উপস্থিত থাকে।

(আ) আশ্রয়—মন সমানান্তর আশ্রয়, অর্থাৎ চক্ষু ইত্যাদি ইন্দ্রিয় বিজ্ঞানের উৎপত্তি হওয়ার পরে সেটাই আবার এই বিজ্ঞানগুলির আশ্রয় হয়ে দাঁড়ায়। সমস্ত বীজের রক্ষক আশ্রয়-বিজ্ঞানই সমস্ত বীজের আশ্রয়স্থল।

(ই) আলম্বন—মনের আলম্বন (বিষয়) পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের পঞ্চ বিজ্ঞান—যাঁকে ধর্মও বলা হয়।

(ঈ) সহায়—মনের সহায় (সঙ্গী) প্রচুর, যার মধ্যে কয়েকটি হল স্পর্শ (Contact), বেদনা, সংজ্ঞা, চেতনা, স্মৃতি, প্রজ্ঞা, শ্রদ্ধা, লজ্জা, নির্লজ্জতা, লোভ, অলোভ, দ্বেষ, মোহ, অদ্বেষ, অমোহ, পরাক্রম, উপেক্ষা, হিংসা, অহিংসা, রাগ, সন্দেহ, ক্রোধ, ঈর্ষা, শঠতা ইত্যাদি চৈতসিক ধর্ম।

(উ) কর্ম—আপন পর বিষয়ক কর্ম যা ক্রমান্বয়ে ছয় আকারে প্রকট হয়—(১) মনের প্রাথমিক ক্রিয়া-বিষয়ের সাধারণ স্বরূপের বিজ্ঞপ্তি; (২) অতঃপর তার তিন কালের বিজ্ঞপ্তি; (৩) অতঃপর ক্ষণক্রমের বিজ্ঞপ্তি; (৪) অতঃপর প্রবৃত্তি অথবা অনুবৃত্তি, শুদ্ধ-অশুদ্ধ ধর্ম কর্মের বিজ্ঞপ্তি; (৫) অতঃপর ইষ্ট-অনিষ্টের ফল গ্রহণ; (৬) অন্য সমস্ত বিজ্ঞান সমুদয়ের উত্থাপন ও অন্যরূপে গ্রহণ করলে মনের বিশেষ (বৈশেষিক) কর্ম হয়ে থাকে—(১) বিষয়ের বিকল্পনা, (২) বিষয়ের চিন্তন, (৩) মন্তাবস্থা, (৪) উন্মত্তাবস্থা, (৫) নিদ্রাবস্থা, (৬) জাগ্রতাবস্থা, (৭) মূর্ছিত হওয়া, (৮) মূর্ছাভঙ্গ, (৯) কায়িক, বাচনিক

কর্ম সম্পাদন, (১০) বৈরাগ্য সাধন, (১১) বৈরাগ্য ত্যাগ, (১২) ইষ্টের মূলোচ্ছেদ, (১৩) ইষ্টের উচ্ছেদিত মূলের পূর্ণ সংযোজন, (১৪) দেহত্যাগ (চ্যুতি) এবং (১৫) শরীরে আগমন (উৎপত্তি)।

এই কর্মসমূহের কয়েকটি সম্বন্ধে অসঙ্গ বলেছেন—পূর্বকর্ম শরীররূপী ধাতুর বিষমতা, ভয়, মর্মস্থলে আঘাত এবং ভূত প্রেতের আবেশের ফলে উন্মত্ততার সৃষ্টি হয়। শারীরিক দুর্বলতা, পরিশ্রমজনিত ক্লান্তি, গুরুভোজন ইত্যাদি কারণে নিদ্রার আগমন হয়। বাত পিণ্ডের বিকার, অত্যধিক মলত্যাগ, রক্ত নিঃসরণে মূর্ছা হয়ে থাকে।

মনের চ্যুতি ও উৎপত্তি—বৌদ্ধ দর্শন ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তনশীল মন ব্যতীত অন্য কোনো নিত্য জীবাত্মাকে স্বীকার করে না। মৃত্যুর অর্থ এক শরীরপ্রবাহ থেকে মনপ্রবাহের (মন সন্ততি) বিচ্যুতি হওয়া। শরীরও ক্ষণ পরিবর্তনশীল হওয়ার কারণে কোনো বস্তু নয় প্রবাহ। ঠিক এরকম ভাবেই উৎপত্তির অর্থ, একটি মনপ্রবাহের অন্য শরীরপ্রবাহে উৎপত্তি।

(ক) চ্যুতি (মৃত্যু)—মৃত্যুর কারণ তিনটি। আয়ু শেষ হয়ে যাওয়া, পুণ্যের নিঃশেষ হয়ে যাওয়া এবং শারীরিক বিষমতা অর্থাৎ অসুস্থতা। যেমন মাত্রাতিরিক্ত ভোজন, পথ্যাপথ্য সম্বন্ধে উদাসীনতা, ঔষধপথ্যের অনিয়মিত সেবন, অকালচারী ও ব্রহ্মচর্যহীন জীবনযাপন।

মৃত্যুকালীন সময়ে পাপীদের শরীরে হৃদয়ের উপরিভাগ প্রথমে শীতল হয়, আর পুণ্যাত্মাদের প্রথমে শরীরের নিম্নভাগ পরে সমগ্র শরীরই শীতল হয়।

এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীরে উৎপন্ন হওয়ার মধ্যবর্তীকালে মন যে অবস্থায় থাকে, তাকে অন্তরাভব, গন্ধর্ব ও মনোময় বলে। অন্তরাভবকে যেমন ভাবে শরীরে উৎপন্ন হতে হয়, তেমনই তার আকৃতিও হয়ে থাকে। এই মধ্যবর্তীকালীন সময়ের ব্যবধান সাত দ্বিন পর্যন্ত হতে পারে।

• (খ) উৎপত্তি (জন্ম)—মরণকালে মন আপন সৎ-অসৎ কর্মের স্বরূপ দর্শন করে এবং সেই মতোই অন্তরাভব রূপ ধারণ করে। অন্য শরীরে উৎপন্ন হওয়ার জন্য মনের তিনটি অবস্থার প্রয়োজন হয়—মাতা ঋতুমতী হওয়া, পিতৃবীজ সংযুক্ত হওয়া ও গন্ধর্ব (অন্তরাভব) উপস্থিত থাকা। সেই সঙ্গে যোনি, বীজ এবং কর্মের দোষ যেন কোনো বাধা হিসেবে উপস্থিত না হয়।

গর্ভে—লিঙ্গভেদ—অন্তরাভব মাতা পিতার মৈথুন ক্রিয়াকে লক্ষ করে, সে সময় তার যদি পুরুষের প্রতি আসক্তি জন্মে তাহলে কন্যা জন্ম নেবে, আর যদি স্ত্রীর প্রতি আসক্তি জন্মে তাহলে পুরুষের জন্ম হবে।

(i) গর্ভাধান—মৈথুনের অব্যবহিত পরে ঘনবীজ ও রক্তবিন্দু উৎপন্ন হয়। বীজ ও শোণিত কণা উভয়ে মাতার গর্ভাশয়ে মিশ্রিত হয়ে এক পিণ্ডাকারে পরিণত হয়, পরে ঠাণ্ডা দুধের মতো পিণ্ডরূপে অবস্থান করে। এই পিণ্ডের মধ্যেই সমস্ত বীজের ধারক ও রক্ষক আলয়-বিজ্ঞান প্রবেশ করে। অতঃপর অন্তরাভবও এখানে এসে যুক্ত হয়। একে গর্ভের কলল অবস্থা বলা হয়। কললের যে জায়গায় বিজ্ঞান যুক্ত হয় সেটাই হয় তার

হৃদয়স্থান। কল্লের পরবর্তীক্রম স্ত্রীত গর্ভ সাতটি পর্যায় অতিক্রম করে—(১) অর্বুদ, (২) পেশি, (৩) ঘন, (৪) প্রশাখ, (৫) কেশ-লোম-নখ বিশিষ্ট অবস্থা, (৬) ইন্দ্রিয়াবস্থা এবং (৭) লিঙ্গভেদাবস্থা। এর মধ্যে অর্বুদাবস্থায় গর্ভ দধিরূপ ধারণ করে এবং তা মাংসাবস্থায় না পৌঁছানো পর্যন্ত অর্বুদাবস্থা। এই অবস্থা ক্রমশ ঘন হতে থাকে এবং পেশি, মাংস সৃষ্টি হয়। শাখাপ্রশাখার মতো হাত, পা, অঙ্গুলির সৃষ্টি হয়।

(ii) বর্ণ ইত্যাদি—মন্দ কর্মের ফলে, অথবা মাতার অত্যধিক ক্ষার, লবণ যুক্ত রসালো আহাৰ্য-পানীয় গ্রহণের ফলে শিশুর কেশ নানা বর্ণের হয়। শিশুর কেশ কৃষ্ণ অথবা শুক্ল বর্ণের হওয়ার কারণ তার পূর্বজন্মের কর্মফল এছাড়া নিম্নলিখিত কারণগুলিও কারণ হয়ে থাকে, যদি মাতা অধিক গরম ও তাপ সহ্য করে থাকে, তাহলে শিশু কৃষ্ণবর্ণের হয়। যদি মাতা অধিকতর শীতল প্রকোষ্ঠে বাস করে তাহলে শিশু গৌর বর্ণের হবে। অত্যন্ত উত্তপ্ত আহাৰ্য গ্রহণকারী মাতার সন্তান রক্তবর্ণের হয়। যদি মাতার অত্যধিক মৈথুনাসক্তি থাকে তবে তার সন্তানের দেহে চর্মরোগ, কুষ্ঠ ইত্যাদি রোগ দেখা দেয়। মাতার অত্যধিক দৌড়ঝাঁপের কারণে বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম হয়। কন্যা হলে গর্ভ মাতার শরীরের বামদিকে আশ্রয় নেয় এবং পুত্র হলে ডানদিকে। প্রসবকালে মাতার উদরে অসহ্য যন্ত্রণাদায়ী বায়ুর উদ্ভব হয়, যা গর্ভস্থ শিশুর মস্তককে নিচে এবং পদযুগলকে উপরের দিকে স্থাপন করে দেয়।

অনিত্যবাদ ও প্রতীত্য সমুৎপাদ

এ ভাবে অন্য কেউ উৎপন্ন করে না এবং সেও স্বয়ং উৎপন্ন হয় না। প্রত্যয়ের কারণে ভাব (বস্তু) পুরোনো নয়। প্রতিক্ষণে নব নব রূপে জন্ম নেয়। প্রত্যয়ের উৎপত্তিতে ভাব উৎপন্ন হয় এবং উৎপন্ন হওয়ার পর তার স্বতঃ ভঙ্গুর হওয়ার কারণেই সে ক্ষণভঙ্গুর হয়।

মহাযান সূত্রের এই গাঁথাসমূহের দ্বারা আচার্য অসঙ্গ বৌদ্ধ দর্শনের মূল সিদ্ধান্ত অনিত্যবাদ বা ক্ষণিকবাদকে বর্ণনা করেছেন। ‘ক্ষণিকার্থে প্রতীত্য সমুৎপাদ’ (‘যোগাচার ভূমি’, ৩, ৪, ৫) বলতে গিয়ে তিনি ক্ষণিকবাদ শব্দ দ্বারা প্রতীত্য সমুৎপাদকে স্বীকার করেছেন।

প্রতীত্য সমুৎপাদ—প্রতীত্য সমুৎপাদকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আচার্য বলেছেন—(‘প্রত্যয়, ইতু রাত্যয়সংগত উৎপাদঃ প্রতীত্য-সমুৎপাদঃ ক্ষণিকার্থে মধিকৃত্য’) প্রতিগমন করে প্রত্যয় (এক বস্তুর বিনাশের পর দ্বিতীয় বস্তুর উৎপত্তি—প্রতীত্য সমুৎপাদ) প্রত্যয় অর্থাৎ গতিশীল বিনাশের সঙ্গে উৎপত্তির নামই প্রতীত্য সমুৎপাদ, যা ক্ষণিকের অর্থে প্রয়োগ হয়ে থাকে, অথবা প্রত্যয় অর্থাৎ অতীত (বিনষ্ট হওয়া বস্তু) থেকে আপন প্রবাহের মধ্যে উৎপন্ন। ‘এ হওয়ার ফলেও হয়’; এর উৎপন্ন হওয়ার ফলেও হয়’—অন্য স্থানে নয়; পূর্বাবস্থা বিনাশ হওয়ার ফলে উৎপন্ন, এই অর্থে প্রতীত্য সমুৎপাদ। অথবা অতীতের প্রত্যয় বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, সেই প্রবাহের মধ্যেই উৎপত্তির নাম প্রতীত্য সমুৎপাদ।

প্রতীত্য সমুৎপাদ কী? নিঃসত্ত্বের (অনাত্মা) অর্থে। নিঃসত্ত্ব হওয়ার ফলে অনিত্য হয় এই অর্থে। অনিত্য হওয়ার কারণে গতিশীল হয় এই অর্থে। গতিশীল হওয়ার ফলে পরতত্ত্বতার অর্থে। পরতত্ত্ব হওয়ার ফলে নিরীহের অর্থে। নিরীহ হওয়ার ফলে কার্যকারণ (হেতুফল) ব্যবস্থা খণ্ডিত হওয়ার অর্থে। কার্যকারণ ব্যবস্থা খণ্ডিত হলে অনুকূল কার্যকারণের প্রবৃত্তির অর্থে। অনুরূপ কার্যকারণের প্রবৃত্তি হলে কর্মের স্বাভাবিক অর্থে।

অনিত্য, দুঃখ, শূন্য এবং নৈরাশ্র্যের (নিত্য আশ্রয় সত্তাকে অস্বীকার) অর্থে ভগবান বুদ্ধ প্রতীত্য সমুৎপাদ সম্বন্ধে বলেছেন—‘প্রতীত্য সমুৎপাদ এক গুরুগম্ভীর বিষয়।’ (সংযুক্তনিকায়, ২।৯২; বোধিনিকায়, ২।৫৫)

‘বস্তু, প্রতিক্ষণ নব নব রূপে জীবনযাত্রা করে। প্রতীত্য সমুৎপাদ ক্ষণভঙ্গুর’ (‘প্রতিক্ষণং চ নব লক্ষণানিপ্রবর্তন্তে। ক্ষণভঙ্গুরশ্চ প্রতীত্য সমুৎপাদঃ’।)

হেতুবিদ্যা

অসঙ্গ বিদ্যাকে পাঁচপ্রকার বলেছেন (‘যোগাচার ভূমি’—শ্রুতময়ী ভূমি, ১০)—(১) অধ্যাত্মবিদ্যা, যেখানে বুদ্ধোক্ত সূত্র, বিনয় এবং অভিধর্ম অর্থাৎ ত্রিপিটক তথা সেখানে বর্ণিত বিষয় সম্মিলিত রয়েছে; (২) চিকিৎসাবিদ্যা বা বৈদ্যকশাস্ত্র; (৩) হেতুবিদ্যা বা তর্কশাস্ত্র; (৪) শব্দবিদ্যা যা থেকে ধর্ম, অর্থ, পুদ্গল (জীব), কাল, সংখ্যা এবং ব্যাকরণ শাস্ত্রের জ্ঞান জন্মে; (৫) শিল্প-কর্মস্থান বিদ্যা (শিল্পশাস্ত্র)।

হেতুবিদ্যাকে কিছুটা বিস্তারপূর্বক ব্যাখ্যা করে অসঙ্গ তাকে ছয় ভাগে ভাগ করেছেন। (১) বাদ; (২) বাদ অধিকরণ; (৩) বাদ অধিষ্ঠান; (৪) বাদ-অলংকার; (৫) বাদ নিগ্রহ এবং (৬) বাদ উপযোগী।

(১) বাদ—বাদ, বিতর্ক অথবা সংলাপ ছয় প্রকার—(ক) বাদ—কিছু মৌখিক বলা হয় তাকেই বাদ বলা হয়। (খ) প্রবাদ—লোকশ্রুতি বা জনশ্রুতিকে বলা হয় প্রবাদ। (গ) বিবাদ—ভোগের রক্ষণ অথবা বলপূর্বক অধিকার সম্বন্ধীয় দৃষ্টিভঙ্গি কিংবা বিচারধারা বিষয়ে পরস্পর বিরোধী নানা বাদই বিবাদ বা বাগ্যুদ্ধ। (‘কোমেসু তদ্যথা নট-নর্তক-লাসক-হাসকাদ্যুপসংহিতেষু বা বৈশ্য জনোপসংহিতেষু বা পুনঃ সংদর্শনায় বা উপভোগায় বা...বিগৃহীতানাং...নানাবাদঃ।...দৃষ্টেবা পুনঃ আরম্ভ তদ্যথা সৎকায়দৃষ্টিং, উচ্ছেদদৃষ্টিং বিষম হেতুদৃষ্টিং, শাস্ত্বতদৃষ্টিং, বার্ষগণ্যদৃষ্টিং, মিথ্যা দৃষ্টি মিতি বা...নানাবাদঃ।’ (ঘ) অপবাদ—নিন্দা, (ঙ) অনুবাদ—ধর্ম সম্বন্ধে সন্দেহ নিরসনের জন্য যে বাক্য বলা হয়। (চ) অববাদ—তত্ত্বজ্ঞান উপলব্ধির জন্য যা বলা হয়। এর মধ্যে বিবাদ এবং অপবাদ সর্বদা ত্যাজ্য এবং অনুবাদ ও অববাদ সর্বদা কাম্য।

(২) বাদ অধিকরণ—বাদের উপযুক্ত অধিকরণ বা স্থান দুটি। রাজা অথবা যোগ্যকুলের পরিষদ এবং ধর্মার্থে নিপুণ, ব্রাহ্মণ কিংবা শ্রমণদের সভা।

(৩) বাদ অধিষ্ঠান—বাদের অধিষ্ঠান (মুখ্য বিষয়) দুই প্রকার। (১) সাধ্য এবং (২) সাধ্যকে সিদ্ধ করার জন্য উপযুক্ত বিবেচিত আট প্রকারের সাধন। এর মধ্যে সৎ-অসৎ-এর স্বভাব (স্বরূপ) তথা নিত্য-অনিত্য, বাস্তব-অবাস্তব ইত্যাদি বিশেষকে নিয়ে সাধ্যের স্বরূপ এবং বিশেষ, এই দুই ভেদ হয়ে থাকে। একেই বাদ অধিষ্ঠান বলা হয়।

(অষ্ট সাধন) সাধ্যবস্তুকে সিদ্ধ করার সাধন নিম্নে বর্ণিত আট প্রকার।

(ক) প্রতিজ্ঞা—স্বভাব এবং বিশেষত্ব সম্পন্ন দুই প্রকার সাধ্যকে নিয়ে (বাদী-প্রতিবাদী) যা পরিগ্রহ করে, সেটাই প্রতিজ্ঞা। এই পক্ষ-পরিগ্রহ শাস্ত্রের (মতের) স্বীকৃতির দ্বারাই হতে পারে, যা আপন প্রতিভা, কিংবা অপরের তিরস্কারের কারণে অথবা অন্যান্য শাস্ত্রীয় মত (অভিজ্ঞতা) দ্বারা কিংবা তত্ত্ব অথবা সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে, অথবা আপন পক্ষকে প্রতিষ্ঠিত এবং অপর পক্ষকে খণ্ডন করে কিংবা ভিন্নমতকে পরাজিত করে কিংবা কারও প্রতি অনুকম্পা বর্ষণ করে সম্ভব হতে পারে।

(খ) হেতু—সেই প্রতিজ্ঞার সিদ্ধির জন্য সারূপ্য (সাদৃশ্য) কিংবা বৈরূপ্য উদাহরণের সাহায্যে অথবা প্রত্যক্ষ অনুমান বা আগু-আগম (শব্দপ্রমাণ, গ্রন্থপ্রমাণ) ইত্যাদির দ্বারা যুক্তির অবতারণাই হেতু।

(গ) উদাহরণ—সেই প্রতিজ্ঞাকে সিদ্ধ করার জন্য হেতু-আশ্রিত বিশ্বের সময়োপযোগী বস্তুকে নিয়ে আলোচনা করাই উদাহরণ।

(ঘ) সারূপ্য—কোনো বস্তুর সঙ্গে অন্য কোনো বস্তুর সাদৃশ্যকে সারূপ্য বলা হয়। এই সারূপ্য পাঁচপ্রকার। (১) বর্তমান কিংবা অতীতে দৃষ্ট হেতু চিহ্নকে নিয়ে একের সঙ্গে অপরের সাদৃশ্য—যাকে লিঙ্গ সাদৃশ্য বলা হয়; (২) পরস্পর (স্বরূপ লক্ষণ) সাদৃশ্যকে স্বভাব-সাদৃশ্য বলা হয়; (৩) পরস্পর ক্রিয়াশীল সাদৃশ্যকে বলা হয় কর্ম সাদৃশ্য; (৪) ধর্মতা (গুণ) সাদৃশ্যকে বলা হয় ধর্ম-সাদৃশ্য, যেমন অনিত্যের মধ্যে দুঃখ ধর্মতার সাদৃশ্য, দুঃখের সাদৃশ্য নৈরাশ্র্যধর্মতা, নৈরাশ্র্য ধর্মতার মধ্যে জন্ম ধর্মতার সাদৃশ্য ইত্যাদি; (৫) হেতুফল-সাদৃশ্য পরস্পর কার্য-কারণ সম্পর্কের সাদৃশ্য।

(ঙ) বৈরূপ্য—কোনো বস্তুর সঙ্গে কোনো বস্তুর অ-সদৃশ্য হওয়াই বৈরূপ্য। বৈরূপ্য পাঁচ প্রকার। লিঙ্গ, স্বভাব, কর্ম, ধর্ম এবং হেতুফল বৈরূপ্য।

(চ) প্রত্যক্ষ—প্রত্যক্ষ তাকে বলা যায় যা অ-পরোক্ষ (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য) অনুভূত-অনভূত এবং অভ্রান্ত। ('প্রত্যক্ষং কল্পনাপোড়মভ্রান্তং', 'ধর্মকীর্তি', পৃ. ৭৬৫। অসঙ্গের অনুজ বসুবন্ধুর শিষ্য দিগ্‌নাগেরও অভিমত অনুরূপ।) এখানে কল্পনা নয় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার দ্বারাই কেবল সিদ্ধ হয় এবং যা একান্ত ভাবে বস্তু বা বিষয়ের উপরে আধারিত, তাকেই অনভূত অনভূত বলা হয়। ('যো গ্রহণমাত্রপ্রসিদ্ধোপলব্ধ্যাশ্রয়ো বিষয়ঃ যশ্চ বিষয়প্রতিষ্ঠালব্ধ্যাশ্রয়ো বিষয়ঃ' 'যোগাচার ভূমি')। অভ্রান্ত তাকে বলা হয় যা নিম্নোক্ত পাঁচটি ভ্রান্তি থেকে মুক্ত।

(i) সংজ্ঞাভ্রান্তি—যেমন মরুভূমিতে মরীচিকার মধ্যে জল পাবার ধারণা।

(ii) সংখ্যাভ্রান্তি—যেমন দৃষ্টিক্ষীণতার কারণে একটি চন্দ্রের মধ্যে দুই চন্দ্র দর্শন।

(iii) সংস্থানভ্রান্তি—যেমন বনেঠির (অলাত) মধ্যে আলোর স্থিরচক্র দর্শনের ভ্রান্তি।

(iv) বর্ণভ্রান্তি—যেমন পাণ্ডুরোগগ্রস্ত ব্যক্তি পীতবর্ণের নয় এমন বস্তুকেও পীতবর্ণের দর্শন করে, তেমন ধরনের ভ্রান্তি।

(v) কর্মভ্রান্তি—যেমন বৃক্ষাদিকে দৃঢ় মৃষ্টিবদ্ধ ধাবমান ব্যক্তির পিছনে চলে যেতে দেখা যায়, সেই ধরনের ভ্রান্তি।

চিত্তভ্রান্তি—উপরোক্ত ভ্রান্তিসমূহের কারণে ভ্রমপূর্ণ বিষয়ে চিত্তের রতিই চিত্তভ্রান্তি।

দৃষ্টিভ্রান্তি—উপরোক্ত ভ্রান্তির কারণে ভ্রমপূর্ণ বিষয়ে যে রুচি, স্থিতি, মঙ্গলচিন্তা ও আসক্তি সৃষ্টি হয়, তাকেই দৃষ্টিভ্রান্তি বলা হয়।

প্রত্যক্ষ চাররকম। রূপী (বাস্তব)-ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ, মন-অনুভব-প্রত্যক্ষ, লোক-প্রত্যক্ষ এবং শুদ্ধ-প্রত্যক্ষ। (শুদ্ধ-প্রত্যক্ষ এবং যোগী-প্রত্যক্ষ একই। 'যো লোকান্তরস্য জ্ঞানস্য বিষয়ঃ'।) ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ এবং মন-অনুভব-প্রত্যক্ষ এই দুই প্রত্যক্ষই লোক-প্রত্যক্ষ। অসঙ্গের এটাই অভিমত। 'তদুভয়মেকধ্য-মভিসংক্ষিপ্য লোকপ্রত্যক্ষ-মিত্যুচ্যতে।' ('যোগাচার ভূমি')। এ ভাবে প্রত্যক্ষ তিন ধরনের হয়, যাকে ধর্মকীর্তি (দিঙ্নাগ এবং সম্ভবত তাঁর গুরু বসুবন্ধুও) ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ, মানস-প্রত্যক্ষ এবং যোগী-প্রত্যক্ষ বলেছেন। তবে ধর্মকীর্তি লোক-প্রত্যক্ষের পরিবর্তে স্ব-সংবেদন-প্রত্যক্ষের কথা বলে প্রকৃতপক্ষে চারটি প্রত্যক্ষকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। এ ভাবেই প্রত্যক্ষের অপরোক্ষ, কল্পনা রহিত, অভ্রান্ত ইত্যাদি প্রত্যক্ষ-লক্ষণ এবং ইন্দ্রিয়, মানস ও যোগী-প্রত্যক্ষ এই তিন ভেদের জ্ঞানের পরম্পরা আমরা পরবর্তীকালের বৌদ্ধ নৈয়ায়িক গ্রন্থকার জ্ঞানশ্রী ইত্যাদি থেকে আরম্ভ করে অসঙ্গ পর্যন্ত দেখতে পাই। অসঙ্গের একশো পঁচাত্তর বছর আগের নাগার্জুন এবং তারও একশো বছর আগের অশ্বঘোষের সঙ্গে এই পরম্পরাকে যুক্ত করার কোনো উপযুক্ত প্রমাণ আমাদের কাছে নেই।

(ছ) অনুমান—তর্কের দ্বারা অভূহিত (তর্কিত) এবং তর্কনীয়তা যার বিষয়, তাই অনুমান। অনুমানের পাঁচটি ভেদ—(১) লিঙ্গ দ্বারা অনুমান যেমন ধ্বজা দ্বারা রথের অনুমান, ধূম থেকে অগ্নির, রাজা থেকে রাজ্যের, স্বামী থেকে স্ত্রীর, কোকুদ (কুঁজ), শিং থেকে বলিবর্দর (বদল) অনুমান। (২) স্বভাব অনুমান, যা এক দেশে (অংশ) থেকে সম্পূর্ণের অনুমান; একটি চাল টিপে হাঁড়ির সমস্ত চাল সিদ্ধ হওয়ার অনুমান। (৩) কর্ম অনুমান, যেমন অঙ্গ হেলনের দ্বারা ব্যক্তির অনুমান, পদচারণার দ্বারা হস্তীর অনুমান, শরীরের গতির দ্বারা সর্পের অনুমান, হেয়ারবে অশ্বের অনুমান, নাসিকা গর্জনে ঘণ্টার অনুমান, দৃষ্টির দ্বারা চক্ষু, শ্রবণের দ্বারা কর্ণ, ঘ্রাণের দ্বারা নাসিকা, আশ্বাদনের দ্বারা জিহ্বা, স্পর্শ দ্বারা ত্বক, জ্ঞানের দ্বারা মনের অনুমান, জলে দৃষ্টি অবরুদ্ধ হওয়ার কারণে প্রতিবিম্বিত বিশ্ব, স্বচ্ছ তরল হলে জল, দাহ্যভক্ষ্য থেকে অগ্নি বনস্পতির আন্দোলনে বাতাস। (৪) ধর্ম (গুণ) দ্বারা অনুমান, যেমন অনিত্যতার কারণে দুঃখের অনুমান, দুঃখের কারণে শূন্যতা ও অনাস্বার অনুমান। (৫) কার্যকারণ (হেতুফল) দ্বারা অনুমান, অর্থাৎ কার্য থেকে কারণের অনুমান এবং কারণ থেকে কার্যের অনুমান; যেমন রাজসেবার দ্বারা ঐশ্বর্য লাভের অনুমান, ঐশ্বর্য লাভের দ্বারা রাজসেবার অনুমান, অতিভোজনজনিত কারণে তৃপ্তি, আবার তৃপ্তির কারণে অতিভোজন, বিষম ভোজনের কারণে ব্যাধি, পুনরায় ব্যাধি থেকে বিষম ভোজনের অনুমান।

ধর্মকীর্তি তাদাত্ম্য এবং তদুৎপত্তির দ্বারা অনুমানের যেসব ভেদ বর্ণনা করেছেন, সেগুলি অসঙ্গের এই ভেদের মধ্যেও বর্তমান।

(জ) আগ্নাগম—এটি শব্দপ্রমাণ।

(৪) বাদ অলংকার—বক্তার পাঁচটি যোগ্যতা হল বাদের ভূষণ।

(১) স্ব-পর-সময়জ্ঞতা—আপন এবং পরমতের অভিজ্ঞতা; (২) বাক্কর্ম সম্পন্নতা—বাচনভঙ্গির নৈপুণ্য যা গ্রাম্যতা ও লঘু দোষ মুক্ত, সুবোধ, ওজস্বী, দৃঢ়সংবদ্ধ (পরস্পর বিরোধী ও শিথিল নয়) এবং সুঅর্থ বহনকারী শব্দ প্রয়োগকে বলা হয়; (৩) বৈশারদ্য—সভাস্থলে নির্ভীক, দীনতার অভাব সংশয়ে মুখমণ্ডল পাণ্ডুরবর্ণ না হওয়া, কণ্ঠে গদগদ ভাব না আনা, এবং অ-দীন বচনকে বলা হয়; (৪) স্থৈর্য—সময় নিয়ে ধীরে সুস্থে বলা, অপ্রয়োজনীয় তাড়াছড়ো না করা; (৫) দাক্ষিণ্য—সুহৃদের ন্যায় পরচিত্তের অনুকূল বাক্য বলা।

(৫) বাদ-নিগ্রহ—বাদে বিড়ম্বিত হওয়া, যার ফলে বাদী পরাজিত হয়। এটি তিন প্রকার। কথা ত্যাগ, কথা মাদ (বিষয়াস্তরিত কথা বলা) এবং কথা দোষ। অসত্য, অপরিমিত, অনর্থক বাক্য বলা, অসময়ে বলা, অস্থির, অদীপ্ত ও অসংবদ্ধ বাক্য বলা—এগুলিকে কথা দোষ বলে।

(ক) বাদ-নিঃসরণ—গুণ-দোষ, নৈপুণ্য ও সভায় পরীক্ষাপূর্বক আলাপ না করাই বাদ-নিঃসরণ।

(৬) বাদে বহুকের বাক্য—বাদের উপযোগী বাক্য বলা, স্বমত এবং পরমত সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা, বৈশারদ্য এবং প্রতিভাশ্রিত।

পরমত-খণ্ডন

অসঙ্গ তাঁর 'যোগাচার-ভূমি' গ্রন্থে ষোলো প্রকার পরবাদ (ভিন্নমত) খণ্ডন করেছেন। এই পরবাদগুলি—

(ক) হেতুফল-সদ্বাদ—হেতুর (কারণ) মধ্যে ফল (কার্য) সর্বদা বিদ্যমান থাকে, যেমন বার্ষগণ্য (সাংখ্য) স্বীকার করেছেন। তিনি তাঁর এই সদ্বাদকে (পরবর্তীকালে সংস্কারবাদ) আগমের (গ্রন্থ) ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এবং যুক্তিসম্মত মনে করেন। তিনি আরও বলেছেন, ফল (কার্য) যা থেকে উৎপন্ন হয়, সেটাই তার হেতু বা কারণ। এজন্য ব্যক্তি যে ফলের বাসনা করে, সেই অনুরূপ হেতুর (কারণ) উপযোগ বা আনুকূল্য করে, অন্য কোনো কিছুই নয়। যদি এরকম না হত, তাহলে যে কোনো কিছুই অন্য যে কোনো কিছুই (বস্তুর) উপযোগ করা হত। যেমন হয়তো তেলের জন্য বালির উপযোগ হত।

খণ্ডন—কিন্তু উপরোক্ত মত ভ্রান্ত। তারা হেতুকে (কারণ) ফল (কার্য) স্বরূপ মনে করেন, না কি অন্য কোনো স্বরূপ স্বীকার করেন? যদি হেতুফল স্বরূপই হয়ে থাকে, অর্থাৎ যদি উভয়ে অভিন্ন হয়ে থাকে, তবে হেতু এবং ফল, হেতুর কারণে ফল, এ কথা বলা ভুল। আবার যদি ভিন্ন স্বরূপ হয়ে থাকে, তাহলে প্রশ্ন ওঠে—সেই ভিন্ন স্বরূপ উৎপন্ন কি অনুৎপন্ন? উৎপন্ন স্বীকার করলে হেতুতে ফল আছে এ কথা বলা সঠিক নয়। অনুৎপন্ন স্বীকার করলে, যা অনুৎপন্ন তাকে হেতুর মধ্যে 'বর্তমান' কী ভাবে বলা যায়? এই জন্যই হেতুর মধ্যে ফলের সম্ভাব সম্ভব নয়, হেতুর উৎপত্তির পর ফল উৎপন্ন হয়। অতএব 'নিত্যকাল (সনাতনকাল) থেকে হেতুর মধ্যে ফল বিদ্যমান; এক কথা বলা সঠিক নয়। এই বাদ যুক্তি রহিত।

(খ) অভিব্যক্তিবাদ—অভিব্যক্তি বা অভিব্যঞ্জনাবাদ অনুসারে পদার্থ উৎপন্ন হয় না, বরং অভিব্যক্ত (প্রকাশিত) হয়। হেতু-ফল-সদ্বাদকে স্বীকার করেছেন এমন দার্শনিকদের মধ্যে সাংখ্য এবং শব্দ-লক্ষণবাদী বৈয়াকরণিকদেরও অভিমত অনুরূপ। হেতু-ফল-সদ্বাদ অনুসারে ফল (কার্য) যদি আগে থেকেই সঞ্চিত থাকে, তাহলে প্রযত্নের কী প্রয়োজন? অভিব্যক্তির জন্য প্রযত্নের প্রয়োজন অপরিহার্য।

খণ্ডন—তারা কি অনভিব্যক্তির মধ্যে আবরণ সৃষ্টিকারী কারণের হওয়াকে স্বীকার করেন অথবা তার না হওয়াকে? 'আবরণ কারণে না হওয়ার' কথা তো তাঁরা বলতেই পারেন না। 'হওয়ার' কথাও স্বীকার করতে পারেন না, কারণ যখন সে হেতুকে আবরণ করতেই পারে না, যা কিনা সর্বদাই ফল সংযুক্ত, তাহলে সে ফলকে আবরণযুক্ত করবে কী ভাবে? হেতু-ফল-সদ্বাদ বস্তুতপক্ষে এই ভ্রান্ত তত্ত্ব। বস্তুর অভিব্যক্ত না হওয়ার জন্য ছয়টি কারণ বর্তমান। (ঈশ্বরকৃষ্ণও সাংখ্য কারিকার এই হেতুকে গণনা করেছেন। ঈশ্বরকৃষ্ণের আর-এক নাম ছিল বিদ্যাবাসী। অসঙ্গের অনুজ বসুবন্ধুর সঙ্গে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল, যার কথা আমরা চৈনিক লেখা থেকে জানতে পারি। (১) অনেক দূরে অবস্থানের কারণে; (২) চারপ্রকার আবরণে আবৃত থাকার কারণে; (৩) সূক্ষ্ম হওয়ার কারণে; (৪) চিত্ত বিক্ষিপ্তের কারণে; (৫) ইন্দ্রিয়ের উপঘাতের কারণে; (৬) ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধীয় জ্ঞানকে সম্যাকরূপে না পাওয়ার কারণে।

যে ভাবে সাংখ্যর হেতুফল-অভিব্যক্তিবাদ ভ্রান্ত, সে ভাবেই বৈয়াকরণিক ও মীমাংসকদের শব্দ-অভিব্যক্তিবাদও ভ্রান্ত। 'শব্দ নিত্য' এ কথা বলা অযৌক্তিক।

(গ) ভূত-ভবিষ্যৎ দ্রব্যের সদ্বাদ—একটি বৌদ্ধ সর্বাস্তিবাদীদের মত। অশ্বঘোষ (৫০ খ্রিঃ) থেকে অসঙ্গের সময়কাল পর্যন্ত গান্ধারে (অসঙ্গর জন্মভূমি) সর্বাস্তিবাদীদের দৃঢ় ভিত্তি ছিল। অসঙ্গের অনুজ বসুবন্ধুর মহান গ্রন্থ 'অভিধর্মকোষ' এবং তার উপরে তাঁরই রচিত ভাষ্য প্রকৃতপক্ষে সর্বাস্তিবাদেরই (বৈভাষিক) গ্রন্থ। কিন্তু পরবর্তীকালে গান্ধার তথা সমগ্র ভারতবর্ষ থেকেই এই প্রাচীন (স্থবির) বৌদ্ধ সম্প্রদায় লুপ্ত হয়ে যেতে থাকে এবং তাঁদের শূন্যস্থান দখল করে মহাযান সম্প্রদায়। সর্বাস্তিবাদীরা বলেন, 'অতীত (ভূত) এবং অনাগত (ভবিষ্যৎ) উভয়েই সেই লক্ষণ-সম্পন্ন, যেমন কোনো বর্তমান দ্রব্য'।

খণ্ডন—অসঙ্গ এই মতের খণ্ডন করে বলেছেন—এই অতীত-অনাগত) কাল সম্বন্ধীয় বস্তুসমূহকে কী মানা হবে, নিত্য না অনিত্য? যদি নিত্য মনে করা হয়, তাহলে তা শুধুমাত্র ত্রিকাল সম্বন্ধীয় হয়ে থাকবে না, বস্তুত কালাতীত হবে। আবার যদি অনিত্য লক্ষণ মনে করা হয়, 'তিনকাল একই রূপে বিদ্যমান' বলাও সঠিক নয়।

(ঘ) আত্মবাদ—আত্মা, সত্ত্ব, জীব, পোষ অথবা পুদগল নামধারী এক স্থির সত্য তত্ত্বকে স্বীকার করার নামই আত্মবাদ। উপনিষদদেরও এটাই প্রধান মত। অসঙ্গ এই মতকে খণ্ডন করেছেন। যে দেখছে, সেই আত্মা, এ কথা বলা যুক্তযুক্ত নয়। আত্মার ধারণা প্রত্যক্ষ পদার্থে হয় না, কোনো অনুমানগম্য পদার্থ দ্বারা হয় না। যদি প্রচেষ্টাকে (শরীর ক্রিয়া) বুদ্ধি হেতু মানা হয়, 'তাহলে আত্মা চেষ্টা করছে' এ কথা বলা সঠিক নয়। নিত্য আত্মা চেষ্টা করতে পারে না। নিত্য আত্মা সুখদুঃখেও লিপ্ত হতে পারে না।

বস্তুত ধর্মের (জাগতিক বস্তু, ঘটনা) মধ্যে আত্মা এক কল্পনা মাত্র। সমস্ত ‘ধর্ম’ অনিত্য, অধ্বংস, অন্-আস্থাসিক, বিকারী এবং জন্ম-জরা ব্যাধিগ্ৰস্ত; দুঃখ তার স্বরূপ মাত্র। সে জন্য ভগবান বুদ্ধ বলেছেন—‘ভিক্ষুগণ! এই ধর্মই (বস্তু সমগ্র) আত্মা। ভিক্ষু! তোমার সেই আত্মা অধ্বংস, অন্-আস্থাসিক, বিপরিণামী (বিকারী)।’ এই সত্ত্বের কল্পনা, সংস্কার (কৃত বস্তু, ঘটনা) দ্বারাই অনুধাবনের চেষ্টা করা উচিত, সংসারে ব্যবহারিক জীবনে সহজতা আনার জন্যই এটার সৃষ্টি। (‘সুখ-সংব্যবহারার্থ’) প্রকৃতপক্ষে সত্ত্ব কিংবা আত্মা নামের কোনো বস্তুর অস্তিত্ব নেই। আত্মবাদ এক যুক্তিহীন মতবাদ।

(ঙ) শাস্ত্রবাদ (প্রজ্ঞাধ কাত্যায়ন, ‘দর্শন-দিগ্‌দর্শন’)—আত্মা এবং লোককে শাস্ত্রত, অকৃত, অকৃত-কৃত, অনির্মিত, অনির্মাণকৃত, অবধ্য, কূটস্থায়ী মনে করাই শাস্ত্রতবাদ। গ্রিক দার্শনিকদের অধিকাংশই পরমাণু নিত্যবাদী ও শাস্ত্রতবাদী। পরমাণুর নিত্যতা সম্বন্ধে পরবর্তী পর্যায়ে আলোচনা করা হবে।

(চ) পূর্বকৃতহেতুবাদ (মহাবীর, ‘দর্শন-দিগ্‌দর্শন’),—‘যা কিছু ভোগ মনুষ্যকে ভুগতে হয় তা সমস্তই তার পূর্বে করা কর্মের ফল’—জৈন মতে এটাই পূর্বকৃতহেতুবাদ। আমরা পৃথিবীতে সংকর্ম করা মানুষকে অনেক দুঃখভোগ এবং অসং কর্ম করা মানুষকে সুখভোগ করতে দেখি। যদি ব্যক্তি-মানুষ প্রযত্নের অধীন হত তাহলে এমনটি হত না। অতএব এই সমস্তই পূর্বকৃত-হেতুক এবং পূর্বকর্মের ফল।

অসঙ্গ উপরোক্ত মতকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেননি, কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি ব্যক্তির বর্তমানের প্রযত্নকেও ফলদায়ক স্বীকার করেছেন।

(ছ) ঈশ্বরাদিকর্তৃত্ববাদ—এই মতানুসারে ব্যক্তি যা কিছু অনুভব করে, সবই ঈশ্বরের ক্রিয়ার কারণে। মানুষ শুভকর্ম করতে চায়, কিন্তু পাপকর্ম করে বসে; স্বর্গলোক যাওয়ার বাসনা পোষণ করে, কিন্তু নরকে চলে যায়; সুখভোগের ইচ্ছা করে, কিন্তু দুঃখই ভোগ করে। এর দ্বারা এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, সমস্ত ভাবের কোনো কর্তা, স্রষ্টা, নির্মাতা, পিতৃসম ঈশ্বর বিদ্যমান।

খণ্ডন—ঈশ্বরের মধ্যে জগৎ সৃষ্টির শক্তি (জীবগণের) কর্মের কারণে হয় অথবা বিনা কারণে? কর্মের কারণে (হেতু) হলে, অবশ্যই সহেতুক, তাহলে সেখানে ঈশ্বরের ভূমিকা কোথায়? যদি কর্মের কারণে না হয়, তাহলে অহেতুক, অতএব এটাও ঠিক নয়। অতঃপর প্রশ্ন ওঠে, সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর জগতের অন্তর্ভূত কি না? যদি অন্তর্ভূত হয়ে থাকে, তাহলে জগতের সমধর্মী হয়েও তিনি জগৎ সৃষ্টি করেন, এটা সঠিক হতে পারে না। আবার যদি অন্তর্ভূত না হন তাহলে তিনি জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন একটি জগৎ সৃষ্টি করেন; সেটাও সঠিক নয়। অতঃপর প্রশ্ন তিনি কি প্রয়োজনে জগৎ সৃষ্টি করেন, না বিনা প্রয়োজনে? যদি প্রয়োজনে হয়ে থাকে তাহলে প্রয়োজনের কাছে তিনি বিবশ, অতএব সেমতাবস্থায় তিনি জগদীশ্বর হন কী ভাবে? যদি নিষ্প্রয়োজনে এই সৃষ্টি করে থাকেন, তাহলে সেটা তো মূর্খের চেষ্টার মতো বিষয় হবে। এ ভাবে যদি ঈশ্বরহেতুক সৃষ্টি হয়ে থাকে, তাহলে যখন ঈশ্বর আছে, তখন সৃষ্টি আছে, আবার যখন সৃষ্টি আছে, তখন ঈশ্বর আছে, এই তত্ত্বও সঠিক হতে পারে না, কারণ সেই অবস্থায় উভয়েই অনাদি হবে।

ঈশ্বরেচ্ছায় সৃষ্টি হয় এই বক্তব্যের মধ্যেও উপরোক্ত দোষ বর্তমান। এ ভাবে সামর্থ্য, জগতের অন্তর্ভূত-অনন্তর্ভূত হওয়া, সপ্রয়োজন-নিপ্রয়োজন এবং হেতুর উপস্থিতি বিচার করলে এই উপলব্ধিই হয় যে 'সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর' এই মত স্বীকার করা একেবারেই অযৌক্তিক।

(জ) হিংসাদর্মবাদ—যে অজ্ঞ মন্ত্রবিধি অনুসারে হিংসা (পশুবধ) করে, বলি দেয়; যাহা বলি হয় (পশু) এবং যারা এর সহায়ক হয়, সকলেই স্বর্গে যায়—যাজ্ঞিক এবং মীমাংসকদের এই মতই হিংসাদর্মবাদ, (বোধনিকায়, ১।১)। কলিযুগে ব্রাহ্মণেরা পুরাতন ব্রাহ্মণ্যধর্মকে পরিত্যাগ করে মাংস ভোজনের আকাঙ্ক্ষায় এই হিংসাদর্মের বিধান দেয়।

হেতু, দৃষ্টান্ত, ব্যভিচার, ফলশক্তির অভাব ইত্যাদি কারণ এবং মন্ত্রপ্রণেতাদের সম্বন্ধে বিচার করলে উপরোক্ত মতকে যুক্তিহীন মনে হয়।

(ঝ) অন্তানন্তিকবাদ—'লোক অন্তবান, লোক অনন্তবান' এই বাদকে অন্তানন্তিকবাদ বলা হয়। বুদ্ধের উপদেশাবলির মধ্যেও এর উল্লেখ আছে। ('দর্শন-দিগ্‌দর্শন')

(ঞ) অমরাবিক্ষেপবাদ—এই বাদের উল্লেখও বুদ্ধবচনের মধ্যে পাওয়া যায়। এই বিষয়ে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে।

(ট) অহেতুকবাদ—'আত্মা এবং লোক অহেতুক' এই মতই অহেতুকবাদ। অভাবের অনুস্মরণ, আত্মার অনুস্মরণ, বাহ্য-আভ্যন্তরিক জগতে অহেতুক বৈচিত্র্য ইত্যাদি বিষয়ে বিচার করলে এই বাদকে অযৌক্তিক মনে হয়। ('দর্শন-দিগ্‌দর্শন')

(ঠ) উচ্ছেদবাদ—আত্মারূপী, স্থূল চার মহাভূতের দ্বারা সৃষ্টি এবং রোগ-গণ্ড শল্য সহ বিদ্যমান। মৃত্যুর পর সে উচ্ছিন্ন হয়, নষ্ট হয়, তারপর আর সে থাকে না। যেমন ভগ্ন কপাল (বাসনের অংশ) জোড়া লাগিয়ে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা যায় না, যেমন ভাঙা পাথর অপ্রতিসন্ধিক হয়ে থাকে, আত্মা সম্বন্ধেও অনুরূপ অবস্থার কথাই বোঝা উচিত। ('দর্শন-দিগ্‌দর্শন')

খণ্ডন—যদি আত্মা পঞ্চক্কর হয়, তাহলে ক্কর তার স্বরূপেই বিনাশশীল হয়ে থাকে, এবং এই পরম্পরাই চলতে থাকে, আত্মা সম্বন্ধে এরকমই ভাবা উচিত। যদি আত্মা রূপী, ঔদারিক, চাতুর্মহাভূতিক, সরোগ, সগণ্ড, সশল্য হয়ে থাকে তবে দেবলোকে তাকে কী ভাবে ভিন্ন রূপে দেখা যেতে পারে? উচ্ছেদবাদ অর্থাৎ বস্তুবাদের বিরুদ্ধে এই পর্যন্ত যুক্তি দেখিয়ে অসঙ্গ মৌনতা অবলম্বন করেছেন।

(ড) নাস্তিকবাদ—দান-যজ্ঞ কিছুই নয়, ইহলোক-পরলোক কিছুই নয়, সুকৃতি-দুকৃতির কোনো ফল হয় না—এটাই নাস্তিকবাদ।

(ঢ) অগ্রবাদ—ব্রাহ্মণই অগ্র (বর্ণশ্রেষ্ঠ), অন্যরা বর্ণহীন, ব্রাহ্মণ গুহ্রবর্ণ, অন্যেরা কৃষ্ণবর্ণ, ব্রাহ্মণেরা শুদ্ধ, অন্যেরা অশুদ্ধ, ব্রাহ্মণ ব্রহ্মার ঔরসপুত্র, মুখসম্বৃত ব্রহ্মজ, ব্রহ্ম-নির্গত, ব্রহ্ম-পার্যদ, যেমন কলিযুগের এই সমস্ত ব্রাহ্মণ।

খণ্ডন—ব্রাহ্মণেরাও অন্য বর্ণের মতো প্রত্যক্ষ মাতৃযোনি সম্বৃত অতএব ব্রহ্মার ঔরসপুত্র বলা সঠিক নয়, অতএব 'ব্রাহ্মণ অগ্রবর্ণ' বলাও সঠিক নয়। যোনি থেকে

উৎপন্ন হওয়ার কারণেই কি ব্রাহ্মণকে অগ্র মানা হয়, না কি তার মধ্যে বিদ্যা এবং সদাচারের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়? যদি যোনি থেকে উৎপন্ন হয়ে থাকে, তাহলে যজ্ঞে শ্রুত-প্রধান, শীল-প্রধান ব্রাহ্মণকে নেবার কথা ওঠে কী করে? যদি শ্রুত (বিদ্যা) এবং শীলকে (সদাচার) গুরুত্ব দেওয়া হয়, তাহলে 'ব্রাহ্মণ অগ্রবর্ণ' বলা সঠিক নয়।

(৭) শুদ্ধিবাদ—যে ব্যক্তি সুন্দরিকা নদীতে স্নান করে; তার সমস্ত পাপ ধৌত হয়ে যায়; এ ভাবেই বাহুদা, গয়া, সরস্বতী, গঙ্গাতে স্নান করলেও পাপ মুক্ত হয়। কেউ কেউ উদক্‌স্নান মাত্রই শুদ্ধি মনে করেন। কেউ সারমেয়ব্রত, (সারমেয়র মতো হাতের প্রয়োগ না করে শুধু মুখ দিয়ে আহার্য গ্রহণ করে, চার হাত-পা একযোগে ব্যবহার করে চতুষ্পদের মতো চলে, বসে ইত্যাদি) গো-ব্রত, তৈলমসী-ব্রত, নগ্ন-ব্রত, ভস্ম-ব্রত, কাষ্ঠ-ব্রত, বিষ্ঠা-ব্রত ইত্যাদিতে শুদ্ধি মনে করে, তাকেই শুদ্ধিবাদ বলা হয়।

খণ্ডন—শুদ্ধি এক আধ্যাত্মিক বিষয়, সুতরাং বাহ্যিক তীর্থস্নান এবং বিষ্ঠা-ব্রত পালনের দ্বারা তাকে কী ভাবে পাওয়া যেতে পারে?

(৩) কৌতুকমঙ্গলবাদ—সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ, গ্রহ-নক্ষত্রের বিশেষ স্থিতির কারণে মানুষের মনস্কামনার সিদ্ধি কিংবা অসিদ্ধি হয়ে থাকে। এজন্য এই প্রকারের বিশ্বাসী (কৌতুকমঙ্গলবাদী) ব্যক্তির সূর্য পূজা করে, হোম, জপ, তর্পণ, কুস্ত, বেল (বিল্ব), শঙ্খ ইত্যাদিকে মানসিক করে, যেমন জ্যোতিষীরা (গাণিতিক) করে থাকে।

খণ্ডন—মানুষের সম্পত্তি বিপত্তির কারণ কি সূর্য বা চন্দ্রগ্রহণ না কি তার শুভ অশুভ কর্ম? যদি গ্রহণ ইত্যাদিই সঠিক কারণ হয়ে থাকে, তাহলে শুভ-অশুভ কর্মহীন অর্থহীন। আর যদি শুভ-অশুভ কর্মই প্রধান হয়, তাহলে গ্রহণ ইত্যাদি বিষয়গুলি মিথ্যা।

অন্যবিচার

আচার্য অসঙ্গ স্কন্ধ, পরমাণু ইত্যাদি সম্বন্ধেও তাঁর নিজস্ব বিচার ধারা ব্যক্ত করেছেন।

১. স্কন্ধ—

(ক) রূপ-স্কন্ধ বা দ্রব্য—রূপ-সমুদায় (রূপ-স্কন্ধ) চোদোটি দ্রব্যের সমষ্টি—পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু এই চার মহাভূত, রূপ-শব্দ-গন্ধ-রস-স্পর্শ এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয় এবং চক্ষু-শ্রোত্র-গ্রাণ-জিহ্বা-কায় (ত্বক) এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়।

এই সমস্ত দ্রব্য কোথাও কোথাও একক ভাবে দেখা যায়, যেমন হীরক-শঙ্খ-শিলা-মুক্তা ইত্যাদি রূপে একক পৃথিবী দ্রব্য; ঝরনা-সরোবর-স্রব-নদী-প্রপাত ইত্যাদি রূপে কেবলমাত্র একক জল; দীপ-উল্কা ইত্যাদি রূপে একক অগ্নি; পুরবাইয়া-পশ্চিমা বাতাস রূপে একক বায়ু। কোথাও কোথাও দুটি দ্রব্যকে একত্রে পাওয়া যায়, যেমন বরফ-পাতা-ফল-ফুল এবং মণি ইত্যাদিতে। কোনো কোনো স্থানে বৃক্ষাদি তণ্ডু হয়ে গেলে তিনটি দ্রব্যও পাওয়া যায়। এবং কোথাও কোথাও চারটি দ্রব্যও পাওয়া যায় যেমন শরীরভ্যন্তরে কেশ থেকে মলমূত্র পর্যন্ত। খটখটে (কঠিন) হওয়া পৃথিবীর সূচক, প্রবাহিত হওয়া জলের সূচক, প্রজ্জ্বলিত হয়ে উর্ধ্বে ওঠা অগ্নির সূচক এবং উর্ধ্বগতি বায়ুর সূচক। যেখানে যাকে পাওয়া যায় সেখানে সেই মহাভূতের প্রাধান্য স্বীকার করা উচিত।

সমস্ত রূপ সমুদয়ের মধ্যে সমস্ত মহাভূত অবস্থান করে; সে জন্যই সমস্ত গুরু কাষ্ঠ (পৃথিবী) ঘর্ষণে অগ্নির সৃষ্টি হয়; এবং অত্যধিক উত্তাপে লোহা-সোনা-রূপা তরল হয়।

(খ) বেদনা—অনুভব করার নাম।

(গ) সংজ্ঞা—জানার নাম।

(ঘ) সংস্কার—চিন্তা ভাবনার নাম।

(ঙ) বিজ্ঞান—এই বিষয়ে পূর্বেই আমরা আলোচনা করেছি।

২. পরমাণু—বীজের মতোই পরমাণু সমস্ত স্থূল রূপী দ্রব্যকে নির্মাণ করে এবং তা সূক্ষ্ম ও নিত্য। অসঙ্গ এই ধরনের পরমাণু সত্তার খণ্ডন করেছেন।

পরমাণুর সংঘর্ষের ফলে রূপ-সমুদয় সৃষ্টি হয় না, কারণ তা পরমাণুর পরিমাণ, অস্ত এবং কল্পনা নির্ভর; প্রত্যক্ষ নির্ভর নয়। পরমাণু নিরবয়ব, অতঃপর সে সাবয়ব বস্তু কী ভাবে নির্মাণ করতে পারে? পরমাণু অবয়ব সহিত এই কথাও বলা যায় না, কারণ পরমাণুই অবয়ব এবং দ্রব্যেরই অবয়ব থাকে, পরমাণুর নয়।

পরমাণু নিত্য, এ তত্ত্বও সঠিক নয়, এই নিত্যতাকে কোনো পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করা হয়নি। সূক্ষ্ম হওয়ার কারণে পরমাণু নিত্য, এ কথাও ঠিক নয়; কারণ সূক্ষ্ম হওয়ার জন্যই সে অধিক দুর্বল অতএব ভঙ্গুর হবে।

দিঙ্নাগ (৪২৫ খ্রিঃ)

বসুবন্ধুর মতো দিঙ্নাগকে বাদ দিয়ে অগ্রসর হওয়া উচিত নয় এ কথা অনস্বীকার্য, কিন্তু ধর্মকীর্তির দর্শন সম্পর্কে আলোচনা ধর্মকীর্তির লেখা 'প্রমাণবার্তিক' গ্রন্থের ভিত্তিতেই এই গ্রন্থে করা হয়েছে। 'প্রমাণবার্তিক' বস্তুত আচার্য দিঙ্নাগের প্রধান গ্রন্থ 'প্রমাণ-সমুচ্চয়ের' ব্যাখ্যা (বার্তিক)—যার মধ্যে ধর্মকীর্তি অনেক জায়গায় তাঁর মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি রেখে আচার্য দিঙ্নাগের সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করেছেন। সেই জন্যই দিঙ্নাগ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করতে গেলে পুনরাবৃত্তি ঘটান সঙ্গাবনা থাকবে এবং অকারণে বর্তমান গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি পাবে। দিঙ্নাগ সম্বন্ধে আমি আমার অন্য গ্রন্থে বিশদ আলোচনা করেছি। ('পুরাতত্ত্ব-নিবন্ধাবলী', পৃ. ২১৪-১৫)

'দিঙ্নাগ (৪২৫ খ্রিঃ) আচার্য বসুবন্ধুর শিষ্য ছিলেন। তিব্বতের বৌদ্ধ শাস্ত্র পরম্পরা থেকে এই তথ্য আমরা পেয়েছি। এই পরম্পরা অষ্টম শতাব্দীতে ভারত থেকে তিব্বতে গিয়েছিল, সেজন্য একদিক থেকে একে ভারতীয় পরম্পরাও আখ্যায়িত করা যায়। যদিও চীনা পরম্পরাতে দিঙ্নাগের বসুবন্ধুর শিষ্য হওয়ার কোনো উল্লেখ নেই, কিন্তু না হওয়া সম্বন্ধেও কোনো উল্লেখ নেই। দিঙ্নাগের সময়কাল, বসুবন্ধু ও কালিদাসের মধ্যবর্তী সময়ে এবং সেই মতো তাঁকে ৪২৫ খ্রিষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ের বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। 'ন্যায়মুখ' ব্যতিরেকে তাঁর প্রধান গ্রন্থ 'প্রমাণসমুচ্চয়' এখন একমাত্র তিব্বতি ভাষাতেই উপলব্ধ। ওই ভাষাতেই 'প্রমাণসমুচ্চয়ের' উপরে মহাবৈয়াকরণ কাশিকা-বিবরণপঞ্জিকার (ন্যাস) কর্তা জিনেন্দ্রবুদ্ধির (৭০০ খ্রিঃ) টীকাও পাওয়া যায়।'

দিঙ্নাগের জন্ম তামিল প্রদেশের কাঞ্চীর (কাজিভরম) কাছে 'সিংহবক্র' নামক এক গ্রামে, এক ব্রাহ্মণ পরিবারে হয়েছিল। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি বাৎসীপুত্রীয় বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের এক ভিক্ষু নাগদত্তের সম্পর্কে এসে ভিক্ষু হন। কিছুকাল অধ্যয়নের পর আত্মার প্রশ্নে তিনি তাঁর গুরুর সঙ্গে অন্যমত পোষণ করে মঠ ত্যাগ করেন। (বাৎসীপুত্রীয়, বৌদ্ধদের একটি প্রাচীন সম্প্রদায়ের নাম, যারা অনাত্মবাদের প্রকাশ্য বিরোধিতা না করেও পরোক্ষ ভাবে এক ধরনের আত্মবাদের সমর্থন করতে চেয়েছিল) এরপর দিঙ্নাগ উত্তরভারতে আচার্য বসুবন্ধুর শিষ্যমণ্ডলিতে সামিল হন এবং বিশেষ ভাবে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়নে ব্রতী হন। অধ্যয়নের পর তিনি শাস্ত্রার্থের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়ী হন এবং ন্যায়শাস্ত্রের গভীর আলোচনামূলক গ্রন্থ রচনায় আত্মনিয়োগ করেন।

দিঙ্ণাগের প্রধান গ্রন্থ প্রমাণসমুচ্চয়ে পরিচ্ছেদ ও শ্লোক (কারিকা)-এর সংখ্যা
এইরূপ—

পরিচ্ছেদ	বিষয়	শ্লোক সংখ্যা
১	প্রত্যক্ষ পরীক্ষা	৪৮
২	স্বার্থানুমান পরীক্ষা	৫১
৩	পরার্থানুমান পরীক্ষা	৫০
৪	দৃষ্টান্ত পরীক্ষা	২১
৫	অপোহ পরীক্ষা	৫২
৬	জাতি পরীক্ষা	২৫
সর্বমোট		২৪৭

প্রমাণসমুচ্চয়ের মূল সংস্কৃত ভাষায় গ্রন্থের এখনও কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। আমি নিজে আমার চারবারের ব্যক্তিগত তিব্বত ভ্রমণকালেও এই গ্রন্থটির যথেষ্ট অনুসন্ধান করেছি, কিন্তু আমার সেই চেষ্টা সফল হয়নি। তবে এখনও আমার স্থির বিশ্বাস গ্রন্থটি তিব্বতের কোনো মঠে, কোনো স্তূপ অথবা মূর্তির মধ্যেই আছে।

প্রমাণসমুচ্চয়ের প্রথম শ্লোকে দিঙ্ণাগ গ্রন্থটির রচনার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে লিখেছেন—‘জগতের হিতৈষী প্রমাণভূত উপদেষ্টা, পরিব্রাজা, সুগত বুদ্ধকে প্রণাম জানিয়ে যত্রতত্র ছড়ানো তাঁর সম্পর্কে মতামতকে প্রমাণ সিদ্ধির জন্য এই গ্রন্থে একত্রিত করা হবে।’

‘প্রমাণভূতায় জগদ্ধিতৈষিণে প্রণম্য শাস্ত্রে সুগতায় তায়িনে।

প্রমাণসিদ্ধয়ে স্বমতাত সমুচ্চঃ করিষ্যতে বিপ্রসিংতাদিহৈককঃ॥’

দিঙ্ণাগ তাঁর গ্রন্থে অন্যান্য দর্শন এবং বাৎস্যায়নের ন্যায়শাস্ত্রের ভাষ্যকে এমন যুক্তিযুক্ত ভাবে সমালোচনা করেছেন যে, বাৎস্যায়নের ভাষ্যের উপরে পাশ্চপতাচার্য উদ্যোতকর ভরদ্বাজকে কেবল তার উত্তর দেবার জন্যই ন্যায়বার্তিকের মতো গ্রন্থ লিখতে হয়েছিল।

‘যদক্ষপাদঃ প্রবরো মুনীনাং শমায় শাস্ত্রং জগতো জগাদ।

কুতর্কিকাজ্ঞাননিবৃত্তিহেতুঃ করিষ্যতে তস্য ময়া নিবন্ধঃ।’

‘ন্যায়বার্তিক’, ১।১।১।

ধর্মকীর্তি (৬০০ খ্রিঃ)

ডক্টর চেবাক্সির ভাষায় ধর্মকীর্তি ছিলেন ভারতের কান্ট। ধর্মকীর্তির প্রতিভার স্বীকৃতি তাঁর সময়কালের প্রতিদ্বন্দ্বীরাও দিতেন। উদ্যোতকরের 'ন্যায়বার্তিক' গ্রন্থকে (৫৫০ খ্রিঃ) ধর্মকীর্তি তাঁর তর্কবাণে এমন ভাবে ছিন্নভিন্ন করেছিলেন যে বাচস্পতি (৮৪১ খ্রিঃ) তার উপর টীকাভাষ্য লিখে ধর্মকীর্তির 'তর্কপক্ষে নিমজ্জিত উদ্যোতকরের বৃদ্ধা গাভীকে উদ্ধার করার' পুণ্য অর্জন করতে চেয়েছিলেন। ('ন্যায়বার্তিক, তাৎপর্যটীকা', ১।১।১), জয়ন্ত ভট্ট (১০০০ খ্রিঃ) ধর্মকীর্তির গ্রন্থের তীক্ষ্ণ সমালোচক হয়েও তাঁকে 'সুনিপুণ' বুদ্ধি এবং তাঁর প্রযত্নকে 'জগদভিভব-ধীর' স্বীকার করেছেন।

(ইতি সুনিপুণবুদ্ধির্লক্ষণং বজ্রকাম পদযুগলমপীদং নির্মমে নানবদ্যম

ভবতুম তিম হিমশ্চেটিতং দৃষ্টমেতজ্জগদভিভবধীরং ধীমতো ধর্মকীর্তেঃ॥

'ন্যায়মঞ্জরী', পৃ. ১০০)

নিজেকে যিনি অদ্বিতীয় কবি এবং দার্শনিক মনে করতেন সেই শ্রীহর্ষ (১১৯২ খ্রিঃ) ধর্মকীর্তির তর্কপথকে 'দুরাবাদ' আখ্যা দিয়ে তাঁর প্রতিভার স্বীকৃতি দিয়েছেন। (দুরাবাদ ইব চায়ং ধর্মকীর্তেঃ পস্থা ইত্যবহিতেন ভাব্যমিহেতি॥ 'খণ্ডনখণ্ডাদ্য', ১) প্রকৃতপক্ষে ধর্মকীর্তির প্রতিভার যথাযথ মূল্যায়ন আজকের বিদ্বজ্জনেরাই করতে পারেন, কারণ বর্তমান যুগের দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক প্রগতির পরিপ্রেক্ষিতেই তাঁর মতাদর্শের সঠিক ব্যাখ্যা সম্ভব।

জীবনী—ধর্মকীর্তির জন্ম হয়েছিল চোল (উত্তর তামিল) সীমান্তে তিরুমালাই নামক গ্রামে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে। তিব্বতি পরম্পরা অনুসারে তাঁর পিতার নাম পাওয়া যায় কারুনন্দ (?)। আবার কারও কারও মতে তিনি ছিলেন কুমারিল ভট্টের ভাগিনেয়। যদি দ্বিতীয় মতটি সঠিক হয়ে থাকে—যার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ—তাহলে মাতুলের বিচার বিশ্লেষণকে ভাগিনেয় যে ভাবে তাঁর প্রমাণবার্তিকে মর্মান্তিক পরিহাসের সঙ্গে খণ্ডন করেছেন, তার ফলে ধর্মকীর্তি আমাদের সামনে এক পরিহাসপ্রিয় সজীব ব্যক্তিরূপে উপস্থিত হন। ধর্মকীর্তি বাল্যকাল থেকেই অত্যন্ত প্রতিভাশালী ছিলেন। প্রথমে তিনি ব্রাহ্মণদের শাস্ত্রগ্রন্থ বেদ-বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করেন। সেই সময় বৌদ্ধধর্মের ধ্বজা ভারতবর্ষের দিকে দিকে উড়ছিল এবং নাগার্জুন, অসঙ্গ, বসুবন্ধু, দিঙ্ঘনাগের বৌদ্ধ দর্শন বিরুদ্ধবাদীদের মধ্যেও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। ধর্মকীর্তিও সেই দর্শন সম্বন্ধে জানবার সুযোগ পান এবং তিনি তার দ্বারা এতদূর প্রভাবিত হয়েছিলেন যে তিব্বতি

পরম্পরা অনুসারে তিনি বৌদ্ধ গ্রন্থের পোশাকেই গ্রন্থের বাইরে যাতায়াত করতেন (২)। তাঁর এইরকম আচরণের জন্য ব্রাহ্মণ অধ্যাপকেরা তাঁকে তাঁদের সংগঠন থেকে বহিস্কার করেন। সেই সময় নালন্দার খ্যাতি ভারতের দূরদূরান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল। ধর্মকীর্তি নালন্দায় চলে যান এবং তৎকালীন মহান বিজ্ঞানবাদী দার্শনিক এবং নালন্দার সংঘস্থবির (প্রধান) ধর্মপালের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এবং ভিক্ষুসংঘে शामिल হন।

ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যয়নেই তাঁর রুচি অধিকতর ছিল এবং তা তিনি দিগ্‌নাগের শিষ্য পরম্পরার আচার্য ঈশ্বর সেনের কাছে আয়ত্ত করেন। শিক্ষা সমাপ্তির পর, গ্রন্থ রচনায়, শাস্ত্রার্থ বিচার এবং অধ্যয়নে তিনি তাঁর জীবন অতিবাহিত করেন। ধর্মকীর্তির সময়কাল ৬০০ খ্রিঃ কারণ চৈনিক পর্যটক হিউ-এন-সাঙের সময় (৬৩৩ খ্রিঃ) আচার্য ধর্মপালের শিষ্য শীলভদ্র নালন্দার প্রধান আচার্য ছিলেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ১০৬ বছর। এরকম অবস্থায় ধর্মপালের শিষ্য ধর্মকীর্তি ৬৩৫ খ্রিষ্টাব্দে কোনোক্রমেই বালক হতে পারেন না।... ধর্মকীর্তি সম্বন্ধে হিউ-এন-সাঙের মৌনতার কারণ, সম্ভবত তিনি যখন নালন্দা বিহারে এসেছিলেন ধর্মকীর্তি তার আগেই মৃত্যুবরণ করেছিলেন। এইরকম বেশ কয়েকটি ঘটনা পরম্পরা বিচার করে ৬০০ খ্রিষ্টাব্দকেই ধর্মকীর্তির সঠিক সময়কাল বলে মনে হয়। (লেখকের 'পুরাতত্ত্ব-নিবন্ধাবলী', পৃ. ২১৫-১৭ দ্রষ্টব্য)

দার্শনিক গ্রন্থ—ধর্মকীর্তি মূলত প্রমাণসম্বন্ধ, বৌদ্ধ দর্শন এবং বৌদ্ধ প্রমাণশাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁর গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, যার মোট সংখ্যা নয়। এর মধ্যে সাতটি মূল গ্রন্থ এবং দুটি তাঁর রচিত গ্রন্থের টীকাভাষ্য।

গ্রন্থনাম	গ্রন্থ পরিমাণ (শ্লোক)	গদ্য বা পদ্য
১. প্রমাণবার্তিক	১৪৫৪.৫	পদ্য
২. প্রমাণবিনিশ্চয়	১৩৪০	গদ্য-পদ্য
৩. ন্যায়বিন্দু	১৭৭	গদ্য
৪. হেতুবিন্দু	৪৪৪	গদ্য
৫. সম্বন্ধ-পরীক্ষা	২৯	পদ্য
৬. বাদ-ন্যায়	৭৯৮	গদ্য-পদ্য
৭. সত্তাস্তর-সিদ্ধ	৭২	পদ্য
<hr/>		
৪৩১৪.৫		

টীকাসমূহ—

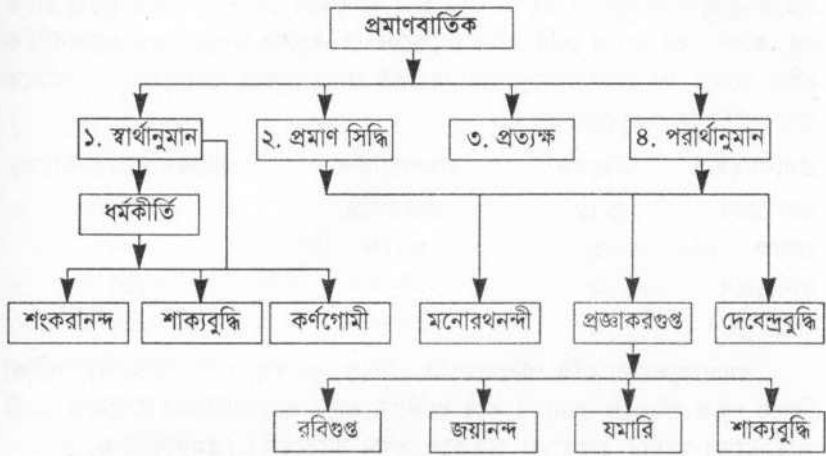
১. (৮) বৃত্তি—৩৫০০ গদ্য — প্রমাণবার্তিক, পরিচ্ছেদ-১
২. (৯) বৃত্তি— ১৪৭ গদ্য — সম্বন্ধপরীক্ষা বিষয়ক

ধর্মকীর্তি মূল এবং টীকা মিলিয়ে (৪৩১৪.৫ + ৩৬৪৭) = ৭৯৬১.৫ শ্লোকের গ্রন্থ রচনা করেছেন। (শ্লোকে ৩২টি অক্ষর থাকে)। ধর্মকীর্তির গ্রন্থসমূহকে কত মহত্বপূর্ণ জ্ঞান করা হয় তার প্রমাণস্বরূপ দেখা যায় যে তিব্বতি ভাষায় অনূদিত বৌদ্ধন্যায়ের সংস্কৃত গ্রন্থের মোট শ্লোকের সংখ্যা ১৭৫০০০ এবং এর মধ্যে ১৩৭০০০ শ্লোক শুধুমাত্র ধর্মকীর্তির গ্রন্থের টীকা ও অনুটীকা।

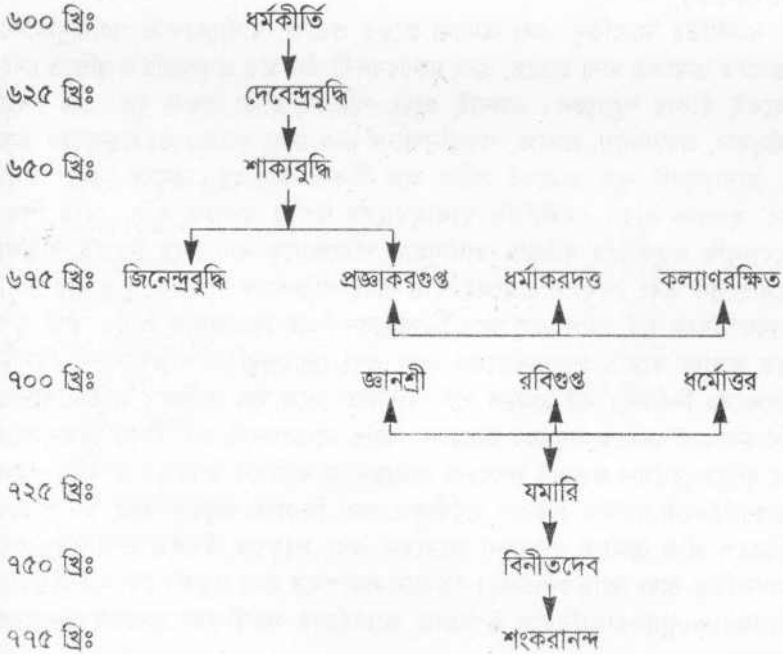
মূলগ্রন্থ	টীকাকার	কোন পরিচ্ছেদের	গ্রন্থ পরিমাণ
১. প্রমাণবার্তিক	১. দেবেন্দ্রবুদ্ধি (পঞ্জিকা) T	২-৪	৮,৭৪৮
	২. শাক্যবুদ্ধি (পঞ্জিকা টীকা) T	২-৪	১৭,০৪৬
	৩. প্রজ্ঞাকরগুপ্ত (ভাষ্য) TS	২-৪	১৬,২৭৬
	৪. জয়ানন্ত (ভাষ্যটীকা) T	২-৪	১৮,১৪৮
	৫. যমারি (ভাষ্যটীকা) T	২-৪	২৬,৫৫২
	৬. রবিগুপ্ত (ভাষ্যটীকা) T	২-৪	৭,৫৫২
	৭. মনোরথনন্দী (বৃত্তি) S	১-৪	৮,০০০
	৮. ধর্মকীর্তি (স্ববৃত্তি) TS	১	৩,৫০০
	৯. শংকরানন্দ (স্ববৃত্তি-টীকা) (অপূর্ণ) T	১	৭,৫৭৮
	১০. কর্ণকগোমী (স্ববৃত্তি-টীকা) S	১	১০,০০০
	১১. শাক্যবুদ্ধি (স্ববৃত্তি-টীকা) T	১	...
২. প্রমাণবিনিশ্চয়	১. ধর্মোত্তর (টীকা) T	১-৩	১২,৪৬৩
	২. জ্ঞানশ্রী (টীকা) T		৩,২৭১
৩. ন্যায়বিন্দু	১. বিনীতদেব (টীকা) T	১-৩	১,০৩০
	২. ধর্মোত্তর (টীকা) TS	১-৩	১,৪৭৭
	৩. দুর্বেকমিশ্র (অনুটীকা) S	১-৩	...
	৪. কমলশীল (টীকা) T		২২১
	৫. জিনমিশ্র (টীকা) T		৩১
৪. হেতুবিন্দু	১. বিনীতদেব (টীকা) T	১-৪	২,২৬৮
	২. অর্চট (বিবরণ) TS	১-৪	১,৭৬৮
	৩. দুর্বেকমিশ্র (অনুটীকা) T	১-৪	১,৭৬৮
৫. সম্বন্ধ পরীক্ষা	১. ধর্মকীর্তি (বৃত্তি) T		১৪৭
	২. বিনীতদেব (টীকা) T		৫৪৮
	৩. শংকরানন্দ (টীকা) T		৩৮৪
৬. বাদন্যায়	১. বিনীতদেব (টীকা) T		৬০৯
	২. শান্তরক্ষিত (টীকা) TS		২,৯০০
৭. সত্ত্বানান্তর সিদ্ধি	১. বিনীতদেব (টীকা) T		৪৭৪

I. (T. তিব্বতি ভাষায় অনুবাদ উপলব্ধ, S. সংস্কৃত মূল গ্রন্থ লভ্য।)

II. প্রমাণবার্তিকের টীকাকারদের ক্রম এই প্রকার—



III. কালের পর্যায়ে ধর্মকীর্তির শিষ্য পরম্পরা :



(প্রমাণবার্তিক)—এ কথা আগেই বলা হয়েছে যে ধর্মকীর্তির প্রমাণবার্তিক দিগুনাগের 'প্রমাণসমুচ্চয়' গ্রন্থের এক স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা। প্রমাণসমুচ্চয়ের ছয়টি পরিচ্ছেদ নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি। প্রমাণবার্তিকের চারটি পরিচ্ছেদের বিষয় প্রমাণসিদ্ধি,

প্রত্যক্ষ এবং পরার্থানুমান। এই ক্রম যে ভ্রান্ত তা বুঝতে কোনো অসুবিধা হওয়া উচিত নয়, কারণ যখন আমরা দেখি, প্রমাণসমুচ্চয়ের যে অংশের উপরে মূলত প্রমাণবার্তিক রচিত হয়েছে, তা কোন ক্রমানুসারে। এজন্যই প্রমাণসমুচ্চয়ে ভাগগুলির পরিপ্রেক্ষিতে প্রমাণবার্তিককে দেখা প্রয়োজন।

প্রমাণসমুচ্চয়	পরিচ্ছেদ	প্রমাণবার্তিক	পরিচ্ছেদ (হওয়া উচিত)
মঙ্গলাচরণ	১।১	প্রমাণসিদ্ধি	(১)
প্রত্যক্ষ	১	প্রত্যক্ষ	(২)
স্বার্থানুমান	২	স্বার্থানুমান	(৩)
পরার্থানুমান	৩	পরার্থানুমান	(৪)

প্রমাণসমুচ্চয়ের বাকি পরিচ্ছেদগুলি—দৃষ্টান্ত, অপোহ, জাতি (সামান্য), পরীক্ষা বিষয়ে পৃথক পরিচ্ছেদ রচনা না করে ধর্মকীর্তি তাকে প্রমাণবার্তিকের উপরোক্ত চারটি পরিচ্ছেদের মধ্যেই প্রকরণের অনুকূলে বন্টন করেছেন। (প্রমাণবার্তিক, ৩।৩৭, ৩।১৩৬, ২।১৬৩-৭৩, ২।৫-৫৫, ২।১৪৫-৬২, ৩।১৬১-৫৫, ৪।১৩৩-৪৮, ৪।১৭৬-৮৮)

ধর্মকীর্তির 'ন্যায়বিন্দু' এবং অন্যান্য গ্রন্থেও প্রত্যক্ষ, স্বার্থানুমান ও পরার্থানুমানের যুক্তিসঙ্গত ক্রমকেই মানা হয়েছে, এবং মনোরথনন্দী তাঁর গ্রন্থ প্রমাণবার্তিক বৃত্তিতে সেই ক্রমকেই স্বীকার করেছেন। এজন্যই ভাষ্য, পঞ্জিকা, টীকা অথবা মূল পাঠে সর্বত্র স্বার্থানুমান, প্রমাণসিদ্ধি, প্রত্যক্ষ, পরার্থানুমানের ক্রম দেখা গেলেও তা গ্রন্থকারের ক্রম নয়, মনোরথনন্দী কৃত ক্রমকেই সঠিক বলে স্বীকার করা হয়। ক্রমের মধ্যে 'আগে পরে' হওয়ার কারণ ধর্মকীর্তির স্বার্থানুমানের উপরে স্বরচিত বৃত্তি। তাঁর শিষ্য দেবেন্দ্রবুদ্ধি গ্রন্থকারের বৃত্তিযুক্ত স্বার্থানুমান পরিচ্ছেদকে বাদ দিয়ে নিজেই পঞ্জিকা লিখেছিলেন এবং সেখানে প্রথমেই বৃত্তি এবং পঞ্জিকাকে পৃথকরূপে রাখার জন্য প্রমাণবার্তিককে দুই ভাগে ভাগ করে দিয়েছিলেন। এই বিভাজনকে আরও স্থায়ী রূপ দিতে সাহায্য করেছে প্রজ্ঞাকরগুপ্তের ভাষ্য এবং দেবেন্দ্রবুদ্ধির পঞ্জিকাবিশিষ্ট তিনটি পরিচ্ছেদের নির্বাচন। এই ক্রমকে সর্বত্র প্রচলিত দেখে মূল কারিকার প্রতিলিপিতেও লেখকেরা সেই ক্রমকে অনুসরণ করেছেন। যদিও মনোরথনন্দী দ্বারা স্বীকৃত ক্রমানুসারে তাঁর বৃত্তিকে বর্তমান গ্রন্থকার সম্পাদনা করেছেন যা বর্তমানে উপলব্ধ। তা সত্ত্বেও মূল প্রমাণবার্তিককে বর্তমান গ্রন্থকার সর্বস্বীকৃত তথা তিব্বতি অনুবাদ এবং তালপাতার পুঁথিরূপে প্রাপ্ত ক্রমকে সম্পাদনা করেছেন এবং সংস্কৃতে উপলব্ধ প্রজ্ঞাকরগুপ্তের প্রমাণবার্তিক ভাষ্য (বার্তিকালংকার) বর্তমানে প্রকাশনার জন্য প্রস্তুত। সেজন্যই গ্রন্থকার পরিচ্ছেদ ও কারিকার বিষয়ে উপরোক্ত আচার্যদের সর্বস্বীকৃত ক্রমকেই অনুসরণ করেছেন।

ধর্মকীর্তির দার্শনিক বিচার সম্বন্ধে আলোচনাকালে প্রমাণবার্তিকের যে মুখ্য অংশগুলি আলোচিত হওয়া প্রয়োজন, আমরা সে বিষয়ে পরে প্রবেশ করব, বর্তমানে এখানে পরিচ্ছেদ ক্রমানুসারে মুখ্য বিষয়গুলির উল্লেখ করা হয়েছে।

বিষয়	পরিচ্ছেদ কারিকা
প্রথম পরিচ্ছেদ (স্বার্থানুমান)	
১. গ্রন্থ প্রয়োজন	১। ১১
২. হেতু বিচার	১। ১৩
৩. অভাব বিচার	১। ১৫
	(+ ৪। ১২৬)
৪. শব্দ বিচার	১। ১৮৬
৫. শব্দ প্রমাণ নয়	১। ২১৪
৬. অপৌরুষেয় বেদ প্রমাণ	১। ২২৫
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ (প্রমাণসিদ্ধি)	
১. প্রমাণ লক্ষণ	২। ১
২. বুদ্ধের বচন কেন মান্য	২। ২৯
তৃতীয় পরিচ্ছেদ (প্রত্যক্ষ প্রমাণ)	
১. প্রমাণ দুই প্রকার—প্রত্যক্ষ এবং অনুমান	৩। ১
২. পরমার্থ সত্য এবং ব্যবহার সত্য	৩। ৩
৩. কোনো বস্তু সামান্য নয়	৩। ৩ (+ ৪। ১৩১)
৪. অনুমান প্রমাণ	৩। ৫৫
৫. প্রত্যক্ষ প্রমাণ	৩। ১২৩
৬. প্রত্যক্ষ ভেদ	৩। ১৯১
৭. প্রত্যক্ষভাস কে?	৩। ২৮৮
৮. প্রমাণ ফল	৩। ৩০০
চতুর্থ পরিচ্ছেদ (পরার্থানুমান)	
১. পরার্থানুমান লক্ষণ	৪। ১
২. পক্ষস্বকীয় বিচার	৪। ১৫
৩. শব্দ প্রমাণ নয়	৪। ৪৮
৪. কোনো বস্তু সামান্য নয়	৪। ১৩১ (+ ৩। ৩)
৫. পক্ষদোষ	৪। ১৪১
৬. হেতু বিচার	৪। ১৮৯
৭. অভাব বিচার	৪। ১২৬ (+ ১। ৫)
৮. ভাব কী?	৪। ২৮

ধর্মকীর্তির দর্শন—ধর্মকীর্তি কেবল প্রমাণ (ন্যায়)-শাস্ত্র সম্বন্ধীয় সাতটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। দর্শন সম্বন্ধে তাঁর সমস্ত বক্তব্য উক্ত গ্রন্থের মধ্যে সন্নিবেশ করেছিলেন। এই সাতটি গ্রন্থের মধ্যে ‘প্রমাণবার্তিক’ (১৪৫৪.৫ শ্লোক) ‘প্রমাণ-বিনিশ্চয়’ (১৩৪০ শ্লোক), ‘হেতুবিন্দু’ (৪৪৪ শ্লোক) ও ‘ন্যায়বিন্দু’ (১৭৭ শ্লোক) এই চারটি গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় মূলত এক, এবং তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং সংক্ষেপে বিষয়ের প্রতি অধিকতর আলোকপাতকারী গ্রন্থ হল প্রমাণবার্তিক। বাদন্যায়তে আচার্য ধর্মকীর্তি অক্ষপাদের অষ্টাদশ নিগ্রহস্থানের অতি বিস্তৃত সূচিকে অত্যন্ত সাধারণ পর্যায়ের প্রতিপন্ন করে তাকে আধখানা শ্লোকেই ব্যাখ্যা করেছেন। (‘অংসাধনাংগবচনং অদোষোদ্ভাবনং দ্বয়োঃ।’ ‘বাদন্যায়’, পৃঃ ১)

‘নিগ্রহ (পরাজয়) স্থানের নাম, বাদের জন্য অ-সাধন, বাক্যের কখন এবং প্রতিবাদীর দোষ না ধরা।’

সম্বন্ধ পরীক্ষার ২৯ কারিকার মধ্যে ধর্মকীর্তি ক্ষণিকবাদ অনুসারে কার্যকারণ সম্বন্ধকে কী ভাবে স্বীকার করা যায় সে সম্বন্ধে বলেছেন। প্রমাণবার্তিকেও এই বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। সন্তানান্তর সিদ্ধির বাহান্তরটি সূত্রে ধর্মকীর্তি প্রথমে এক মন-সন্তান (মন এক বস্তু নয়, প্রতিক্ষণ উৎপন্ন হওয়া সন্তান বা ঘটনা) পরে আরও অনেক মন-সন্তান (সন্তানান্তর) উৎপন্ন হয়, এই তত্ত্বকে প্রমাণ করেছিলেন; এবং অবশেষে তিনি বলেছেন যে সমস্ত মন (বিজ্ঞান) সন্তান একত্রিত হয়ে কী ভাবে দৃশ্যজগৎকে (বিজ্ঞানবাদ অনুসারে) বহির্জগতে আরোপ করে। প্রমাণবার্তিকেও আচার্য ধর্মকীর্তি বিশেষ ভাবে বিজ্ঞানবাদ চর্চা করেছেন। ধর্মকীর্তির দর্শন জানার জন্য প্রমাণবার্তিকই যথেষ্ট।

(১) তৎকালীন দার্শনিক পরিস্থিতি—ধর্মকীর্তি দিঙ্ণনাগের মতোই অসঙ্গের যোগাচার (বিজ্ঞানবাদ) দার্শনিক সম্প্রদায়কে স্বীকার করতেন। বসুবন্ধু, দিঙ্ণনাগ, ধর্মকীর্তির মতো মহান নৈয়ায়িকদের শূন্যবাদ পরিত্যাগ করে, বিজ্ঞানবাদের সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ার ঘটনা এই বিষয়ের প্রতিই ইঙ্গিত করে যে পরবর্তীকালের হেগেলের মতো তাঁদেরও নিজস্ব তর্কসম্মত দার্শনিক বিচারের জন্য বিজ্ঞানবাদের খুবই প্রয়োজন ছিল। তবে ধর্মকীর্তিকে বিমুগ্ধ যোগাচারী না বলে সৌত্রান্ত্রিক (স্বাতন্ত্রিক) যোগাচারী বলাই শ্রেয়। সৌত্রান্ত্রিকেরা বহির্জগতের সত্তাকেই মূল তত্ত্ব বলে স্বীকার করেন, আর যোগাচারীর শূন্যমাত্র বিজ্ঞানকে (চিন্তা, মন) মানতেন। সৌত্রান্ত্রিক যোগাচারের অর্থ হল বাহ্যজগতের প্রবাহরূপী ক্ষণিক বাস্তবিকতাকে স্বীকার করে নিয়ে বিজ্ঞানের মূল তত্ত্বকে মেনে নেওয়া—ঠিক হেগেলের মতানুযায়ী—আজকের ভাষায় যার অর্থ হবে : ‘জড়তত্ত্ব বিজ্ঞানেরই বাস্তবিক গুণগত পরিবর্তন।’ প্রাচীন যোগাচার দর্শনের মূল তত্ত্ব বিজ্ঞানকে (চিন্তা) বিশ্লেষণ করে তাকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়েছিল—(১) আলায়-বিজ্ঞান এবং (২) প্রবৃত্তি বিজ্ঞান। প্রবৃত্তি বিজ্ঞান ছয়টি—চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, স্পর্শ—এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের পাঁচটি বিজ্ঞান, যা বিষয় তথা ইন্দ্রিয়ের সম্পর্কে আসার সময় বর্ণ, আকার ইত্যাদির কল্পনার আগেই তার সম্পর্কে এক ধারণার জন্ম দেয়, এবং ষষ্ঠটির নাম

মনোবিজ্ঞান। আলায়-বিজ্ঞান উপরোক্ত ছয়টি বিজ্ঞানের সঙ্গেই জন্ম নেয়, ধ্বংস হয়, কিন্তু তার প্রবাহের (সন্তান) মধ্যে সমগ্র প্রবৃত্তি বিজ্ঞানকে ধরে রাখে। এই জন্যই এর নাম আলায়-বিজ্ঞান। তার মধ্যে পূর্বসংস্কারের বাসনা এবং পরবর্তীকালে উৎপন্ন হওয়া বিজ্ঞানের বাসনা বর্তমান থাকে। যদিও সর্বদা ক্ষণিকতা যুক্ত থাকার কারণে আলায়-বিজ্ঞানে ব্রহ্ম অথবা আত্মার ভ্রম হওয়ার অবকাশ নেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও এটিও এক রহস্যপূর্ণ তত্ত্বে পরিণত হয় এবং তার জন্যই বিমুক্তসেন, হরিভদ্র এবং ধর্মকীর্তির মতো অনেক বিচারক এর মধ্যে প্রচ্ছন্ন আত্মতত্ত্বের আশঙ্কা করেছেন এবং তাঁরা আলায়-বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তকে অন্ধকারে শর নিক্ষেপের মতো ভয়ংকর বলে বর্ণনা করেছেন। (তিব্বতি নৈয়ায়িক জম-য়ঙ-শদ্-পা) (মঞ্জুঘোষণাপাদ ১৬৪৮-১৭২২) তাঁর গ্রন্থে 'সপ্তনিবন্ধ-ন্যায়ালংকার সিদ্ধি' (অলংকার সিদ্ধি) লিখেছেন—'যারা বলে যে, ধর্মকীর্তির সাতটি গ্রন্থের মন্তব্যের মধ্যে 'আলায়-বিজ্ঞান'ও আছে, তারা অন্ধ, আপন অজ্ঞানতার অন্ধকারেই তাদের বাস।' (ডঃ শ্বেচক্সির *Buddhist Logic* Vol. II, P. 329-এর পাদটীকা থেকে উদ্ধৃত।) ধর্মকীর্তি তাঁর প্রমাণবার্তিকে আলায়-বিজ্ঞান শব্দের প্রয়োগ করেছেন কিন্তু তা নিতান্তই সাধারণ অর্থে, তার পশ্চাতে কোনো রহস্যময় অদ্ভুত শক্তির চিন্তা নেই। ('আলায়' শব্দ প্রাচীন সূত্রের মধ্যেও পাওয়া যায়। কিন্তু সেখানে তা এসেছে রুচি, অনুনয়, কিংবা অধ্যবসায়ের অর্থে। দ্রষ্টব্য 'মহাহত্থ থি পদোপম সুত্ত', মঞ্জিমনিকায়, ১।৩।৮; 'বুদ্ধচর্যা', পৃ. ১৭৯)। তাঁরা সন্তান রূপে (ক্ষণিক অথবা বিচ্ছিন্ন প্রবাহরূপে) বস্তু জগতের বাস্তবিকতা পরিষ্কার ভাবে অস্বীকার করতে চাননি, কিন্তু তাঁদেরও কিছু ধর্মসংকট ছিল। যদি তাঁরা তাঁদের তর্কের মধ্যে স্থানে স্থানে প্রযুক্ত বস্তুবাদী তত্ত্বের বাস্তবিকতাকে পূর্ণ রূপে স্বীকার করেন, তাহলে ধর্মের ভিত্তি ধসে যায় এবং তাঁরা সোজাসুজি বস্তুবাদী বলে প্রমাণিত হন, এজন্য স্বাতন্ত্র্যিক রূপে হলেও তাঁদের বিজ্ঞানবাদী থাকাটা প্রয়োজনীয় ছিল। ইওরোপে বস্তুবাদের সার্বিক প্রচার তখনই সম্ভব হয়েছে যখন সামন্ততন্ত্রের গর্ভ থেকে দুটি শক্তিশালী শ্রেণি, বণিক ও পুঁজিপতি আবির্ভূত হয়েছিল এবং নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সাহায্যে নিজেদের প্রভাবকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিল। তার ফলে জীবনের প্রতিক্ষেপে প্রাচীন বিচারধারার অসারত্ব প্রমাণিত হতে থাকে এবং বস্তুজগতের বাস্তবতার ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব উৎসাহ লাভ করে। ষষ্ঠ শতাব্দীর ভারতবর্ষে এই অবস্থা আনার জন্য আরও চোদ্দোটি শতাব্দীর অপেক্ষার প্রয়োজন ছিল, কিন্তু এখানে এটাও মনে রাখা উচিত যে ভারতীয় হেগেলের (ধর্মকীর্তি) জন্ম হয়েছিল জার্মানির হেগেলের (১৭৭০-১৮৩১ খ্রিঃ) জন্মের চেয়ে বারোশো বছর আগে, এবং এটা খুব সামান্য বিষয় নয়।

(২) তৎকালীন সামাজিক পরিস্থিতি—এখানে একবার এই দর্শনের পিছনের সামাজিক ভিত্তির দিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার, কারণ দর্শনশাস্ত্র যতই অস্থিমাংসকে ঘৃণা করে নিজেকে তার উপরে স্থাপন করুক না কেন, কিন্তু সেও অস্থিমাংসেরই সৃষ্টি। বসুবন্ধু থেকে ধর্মকীর্তির সময় পর্যন্ত (৪০০-৬০০ খ্রিঃ) ভারতীয় দর্শন, কাব্য, জ্যোতিষ, চিত্রকলা, ভাস্কর্য, বাস্তুকলার চরম বিকাশের কাল। (কাব্য—কালিদাস, দণ্ডী,

বাণ; জ্যোতিষ—আর্যভট্ট, বরাহমিহির, বাস্তুকলা ব্রহ্মগুপ্ত; চিত্রকলা—অজন্তা ও বাণ; ভাস্কর্য—গুপ্তকালীন পাষণ ও ধাতব মূর্তিসমূহ;—অজন্তা, ইলোরার গুহা, দেব, কোনারকের মন্দির!) তৎকালীন দর্শনের পিছনে গুপ্ত-মৌখারি-হর্ষবর্ধন ইত্যাদির মতো মহান এবং সুদৃঢ় শাসনাধীন সাম্রাজ্যের বড় ভূমিকা ছিল এ কথা অনস্বীকার্য। কিন্তু মহান সাম্রাজ্য বলে আমরা মূল ভিত্তিকে প্রকাশ্যে আনি না বরং আরও অন্ধকারে লুকিয়ে রাখি। বস্তুত সেই সময়কার সেই সমস্ত মহান সাম্রাজ্য কী ধরনের ছিল? সমুদ্রগুপ্ত, হরিবর্মা অথবা হর্ষবর্ধন—এরকম কোনো একজন বড়ো সামন্তকে নিজেদের উপরে স্থান দিয়ে অনেক সামন্ত পরিবার নতুন নতুন জনপদ, নতুন নতুন জনগোষ্ঠীকে নিজেদের অধীনস্থ করে অথবা তারা যাতে অন্যের শাসনে বা দখলে চলে না যায়, সেজন্য সামরিক শাসন, যুদ্ধ কিংবা যুদ্ধ-প্রস্তুতিতে লিপ্ত থাকত এবং যারা আগে থেকেই তাদের কর্তৃত্বের আওতায় ছিল তাদের মধ্যে এবং নতুন বিজিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে ‘শান্তি ও শৃঙ্খলা’ কায়েম রাখার জন্য অসামরিক শাসন প্রতিষ্ঠা করত। কিন্তু সামরিক ও বেসামরিক, উভয় প্রকার শাসনই জনগণের কাছে কল্যাণকর ছিল না। সাধারণ জনতার মধ্য থেকে আসা সৈনিকদের মধ্যে লড়নেওয়ালা এবং মরনেওয়ালার সংখ্যা স্বাভাবিক নিয়মেই তাদের উপরওয়ালাদের তুলনায় বেশি ছিল এবং তাদের অবস্থাও ‘পেটে পাথর বেঁধে’ থাকার মতো ছিল। অন্যদিকে সেনানায়ক, সেনাপতি, সামন্ত বংশীয়রা আগে থেকেই প্রচুর সম্পত্তির মালিকানা ভোগ করত, উপরন্তু তারা সামরিক বাহিনীতে উচ্চপদের সুযোগে উচ্চ বেতন, লুণ্ঠিত অপার ধনরাশি, জায়গির এবং অন্যান্য পুরস্কারের দাবিদার হত, যাকে আমরা বলতে পারি ‘মহাসাগরে বৃষ্টিপাত’। উপরন্তু নাগরিক শাসনের বড়ো বড়ো অধিকারী—উপরিক (ভুক্তির শাসক বা গভর্নর), কুমারামাত্য (বিষয় শাসক বা কমিশনার)-অবৈতনিক কর্মচারী ছিল না। তারা প্রজাদের কাছ থেকে ভেট, উৎকোচ, সম্রাটের কাছ থেকে বেতন, পারিতোষিক এবং জায়গির লাভ করত। এ কথা ঠিক যে মানুষ যতটা তার আহারবিহার, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং অন্যান্য অস্থায়ী বিষয়ের জন্য যে খরচ করে তা থেকে অনেক কম খরচ করে সেইসব বস্তুর জন্য যা অনেকদিন পর্যন্ত টিকে থাকবে। এইসব বস্তুর মধ্যেও আবার অনেকগুলি শুধুমাত্র সময়ের ধ্বংসাত্মক রীতির কারণেই নয়, বর্বর মানুষের নিষ্ঠুর হাতেও বিনষ্ট হয়। তা সত্ত্বেও বৌদ্ধগয়া, বৈদ্যনাথের মন্দির, অজন্তা-ইলোরার গুহা প্রাসাদ যা এখনও বেঁচে আছে অথবা কালিদাসের কৃতিতে এবং বাণভট্টের কাব্যে যে নগর, অট্টালিকা, রাজপ্রাসাদের বর্ণনা পাওয়া যায়, তা থেকে বোঝা যায় যে, সেই সময় সম্পত্তিশালী শ্রেণি আড়ম্বরপূর্ণ জীবনযাপনের জন্য কী বিপুল অর্থ ব্যয়ই না করত। আজও শৌখিন বিলাসদ্রব্য দুশ্চাপ্য এবং বহু মূল্যবান বস্তু উচ্চমূল্যে পাওয়া যায়, কিন্তু বর্তমানের যান্ত্রিক যুগে ওই সমস্ত মহার্ঘ বস্তু যন্ত্রের সাহায্যে নির্মাণের জন্য অনেক সস্তা হয়ে যায়। অর্থাৎ আজ এই সমস্ত বস্তু নির্মাণের জন্য যত হাতের প্রয়োজন হয় গুণ্যুগে সে কাজের জন্যই আরও অনেক বেশি হাতের প্রয়োজন হত। মূল ঘটনা এই যে, এই শাসক-সামন্তবর্গের শারীরিক প্রয়োজনীয়তার জন্যই শুধুমাত্র নয়, বরং তাদের বিলাস-সামগ্রী উৎপাদন

করার জন্যই জনগণের এক বৃহদাংশকে তাদের সমস্ত শ্রম ব্যয় করতে হত। সংখ্যাটী কী পরিমাণ হতে পারে তার একটা আন্দাজ পাওয়ার জন্য আমরা এই তথ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করতে পারি যে আজ থেকে শতাধিক বছর আগে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনে ভারতবর্ষ যত সম্পদ তাদের ইংরেজ শাসকদের ঘরে প্রতিবছর পাঠাত, সেই সম্পদ উপার্জনের জন্য ছয় কোটি মানুষের, তৎকালীন জনসংখ্যার প্রায় এক-চতুর্থাংশ—শ্রমের প্রয়োজন হত। এ ছাড়া এ দেশে বসবাসকারী ইংরেজ শাসক আমলাদের খরচ-খরচা আলাদা ছিল। এ ভাবে জনগণের এক-তৃতীয়াংশের শ্রম শাসকদের জন্যই নিয়োজিত থাকত। লক্ষ লক্ষ স্ত্রীলোককে বৈধ অথবা অবৈধ রূপে শরীর বিক্রি করতে হত উচ্চবর্ণের কাম-লালসার তৃপ্তির জন্য। তাদের মধ্যে এক বিশাল সংখ্যা দাসীরূপে বাজারে বিক্রীত হত। মানুষকে আর পাঁচটা বস্তুর মতো খোলা বাজারে বেচাকেনা করা সেকালের এক উল্লেখনীয় দস্তুর ছিল। অর্থাৎ এই দর্শন-কলা-সাহিত্যের মহান যুগের সমস্ত ভব্যতা, মানুষের পশুবৎ ও হৃদয়হীন দাসত্বের সমর্থক ছিল এ কথাও আমাদের মনে রাখা উচিত। অতঃপর দার্শনিক দৃষ্টিতে ক্রান্তিকারী থেকে ক্রান্তিকারী বিচারককেও তাদের বিচার সম্বন্ধীয় চিন্তাকে সেই সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখা প্রয়োজনীয় মনে করেছিল, যার বাইরে গেলেই শাসকবর্ণের কোপদৃষ্টিতে পড়ার আশঙ্কা ছিল—তা সে সরাসরি রাজদণ্ড রূপেই হোক, কিংবা তাদের কৃপা থেকে বঞ্চিত হওয়ার মাধ্যমেই হোক, অথবা তাদের দ্বারা স্থাপিত মঠ-মন্দিরে স্থান না দেওয়ার রূপেই হোক। সে সময় ‘শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা ব্যবস্থা’ আজকের তুলনায় বিশাল দীর্ঘকায় ছিল, যার ফলে জীবন রক্ষার ধার্মিক সহানুভূতি অল্পবিস্তর সহায়ক হত, এবং যে ব্যক্তি তা হারাত তার জীবনের মূল্য এক রাষ্ট্রদ্রোহী দস্যুর জীবনের মূল্যের চেয়ে বেশি ছিল না।

ধর্মকীর্তি সেই নালন্দার রত্ন ছিলেন, যেখানে গ্রাম কিংবা নগর দান রূপে দেওয়া হত এবং তা থেকে বিহারের ব্যয় নির্বাহ হত। এ বিষয়ে আজও বহু তাম্র পত্রে লেখা দানপত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। হিউ-এন সাঙের সময় (৬৪০ খ্রিঃ) নালন্দায় দশহাজার বিদ্যার্থী এবং অধ্যাপক-পণ্ডিতদের জন্য যে অকৃপণ হস্তে ধনসম্পদ খরচ হত তাতে এটা কখনওই সম্ভব ছিল না যে, প্রমাণবার্তিকের পঙ্ক্তিগুলি সেই মূল্যবান হাতগুলিকে ভুল করে কাটতে উদ্যত হবে। অতএব সৌত্রান্তিক (বস্তুবাদী) ধর্মকীর্তিও আধ্যাত্মিকতার দ্বারা দুঃখের ব্যাখ্যা করেই অব্যাহতি নিয়েছেন। বিশ্বের কারণকে, ঈশ্বর আদিকে বাদ রেখে, বিশ্বের মধ্যেই তার ক্ষুদ্রতম এবং মহত্তম অবয়বের ক্ষণিক পরিবর্তনশীলতা অথবা গুণাত্মক পরিবর্তনের রূপে খুঁজতে চেয়েছিলেন যে ধর্মকীর্তি, তিনিই কিন্তু দুঃখের কারণকে অলৌকিকতার মধ্যে—পুনর্জন্মের মধ্যে নিহিত বলে ব্যাখ্যা করে সাকার এবং বাস্তবিক দুঃখের জন্য সাকার ও বাস্তবিক কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টা থেকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছিলেন। এক-তৃতীয়াংশ সেই ক্রীতদাস এবং প্রায় তাদের সমসংখ্যক জনতা—যারা বাণিজ্যের লাভ এবং সুদ নিজেদের শ্রমকে বিনা পারিশ্রমিকে উজাড় করে দিতে বাধ্য ছিল—তাদের দাসত্ব মুক্ত করে, জনগণের শ্রমের ফলকে জনগণের কাছেই ফিরিয়ে দেওয়া যেত, যদি সমস্ত সামন্ত বা বণিক-শ্রেণী পরিবারকে বাধ্য করা যেত যে বৌদ্ধ দর্শন-চ

তাদের অলসতা, অকর্মণ্যতাকে পরিত্যাগ করে সামাজিক উৎপাদনে নিয়োজিত হতে হবে। তাহলে নিশ্চয়ই সেই সময়কার সাকার দুঃখের মাত্রা বহুাংশে কম হত। তবে এ কথাও ঠিক যে অলস অকর্মণ্য লোকগুলিকে তাদের স্বস্থান চ্যুত করা খুব সহজ কাজ ছিল না এবং সময়ও প্রতিকূল ছিল। অতএব কোনো আকাশকুসুম পরিকল্পনা সফল হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। কিন্তু এই কাজ বাস্তবে সম্ভব না হলেও দার্শনিক স্তরে হতে পারত। সফল না হলেও দার্শনিকেরা একটি ভালো সমাজ-ব্যবস্থার ইঙ্গিত তাঁদের বিচারধারার মাধ্যমে রাখতে পারতেন। তাঁদের নিষ্ঠীকতা এবং সহৃদয়তার জয়গান জনগণ যুগযুগান্তর ধরে করত। যদিও সময়ের উপেক্ষা এবং শত্রুর হানাদারিতে তাঁদের কৃতিসমূহ বিনষ্ট হয়েও যেত, তবুও প্রাচীন পশ্চাদ্গামী চিন্তাধারাকে খণ্ডন করে, তাঁদের উদ্ধৃতি, তাঁদের প্রতিভার তীক্ষ্ণ শর কয়েক শতাব্দীর ব্যবধানকে ভেদ করে নিশ্চয়ই মানবতার দরবারে পৌছত এবং সেখানে এক নতুন বার্তা এসে পৌছত।

(৩) বিজ্ঞানবাদ—সহৃদয় মস্তিষ্ক থেকে বাস্তব জগৎকে (বস্তুবাদ) ভুলিয়ে দেবার জন্য দার্শনিক তত্ত্ব বিজ্ঞানবাদ সেই কাজই করে যা কর্মক্ৰান্ত শ্রমজীবীর কষ্টকে ভুলিয়ে দেবার জন্য একটি মদের বোতল করে থাকে। সেই সময় মানুষের মস্তিষ্ক এবং হৃদয় এতদূর বিকশিত হয়েছিল যে সমপর্যায়ের প্রাণীদের জন্য তার মনে স্বাভাবিক ভাবেই সমবেদনার জন্ম হত। নিজের চারপাশে জনগণের অসহনীয় দুঃখকষ্টে ব্যথিত না হওয়া, বিচলিত না হওয়া অচিন্তনীয় ব্যাপার ছিল। জুর দাসপ্রথার উপরে যে সমাজ গড়ে উঠেছিল তাকে বজায় রাখার জন্যই, জগৎ মিথ্যা এই ব্যাখ্যা দিয়ে মানুষের স্বাভাবিক হৃদয়বৃত্তিকে কিছু পরিমাণে চাপা দেওয়ার কাজ দার্শনিক বিজ্ঞানবাদ বিশ্বস্ততার সঙ্গে পালন করেছিল। সেই সময় ‘দার্শনিকদের কাজ ছিল জগৎকে ব্যাখ্যা করা, তাকে পরিবর্তিত করা নয়।’

ধর্মকীর্তি বাহ্যজগৎ, বস্তুবাদীতত্ত্ব ইত্যাদিকে অবাস্তব বলে বিজ্ঞানকে (চিন্তা) মূল তত্ত্ব হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেছেন।

(ক) বিজ্ঞানই একমাত্র তত্ত্ব—আমরা যদি কোনো কাপড়কে দেখি, তাহলে সেখানে আমাদের নীল, হলুদ রং, কিংবা তার দৈর্ঘ্য প্রস্থ, মোটা-পাতলা, হালকা-ভারী ইত্যাদি বিষয়কে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র তার রূপ (বস্তুতত্ত্ব) গোচর হয় না। (প্রমাণবার্তিক, ৩।২০২) নীল ইত্যাদি বিষয়ের ভিত্তিতে দর্শন হয়, তা থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো বস্তুর প্রত্যক্ষ বা অনুমানের দ্বারা গ্রহণ হয় না। নীল ইত্যাদি গ্রহণের সঙ্গেই তারও গ্রহণ হয়ে থাকে। এজন্যই যা কিছু দর্শন হয়, তা নীল ইত্যাদি অবস্থার সম্বন্ধে হয়, কেবল বাহ্যিক বস্তুতত্ত্বের ভিত্তিতে নয়। (প্রমাণবার্তিক, ৩। ৩৩৫) যাকে আমরা বস্তুতত্ত্ব বা বাহ্যার্থ বলে থাকি, বস্তুত সেই বস্তুটি কী? যদি এর বিশ্লেষণ করা যায়, তাহলে সেখানে চোখে দেখা যায় রং, আকার, হাত দিয়ে স্পর্শ করা যায় শক্ত, নরম, মৃদু ইত্যাদিকে; কিন্তু এই সমস্তের স্থূল রূপ আপনার নিজস্ব জ্ঞান (চক্ষু-বিজ্ঞান, স্পর্শ-বিজ্ঞান) দ্বারা মনকে কল্পনা করার ভার গ্রহণ করে না। ইন্দ্রিয়চর্চিত জ্ঞানের পুনঃচর্চণের উপরে মনের নির্ণয় নির্ভর করে। এই ভাবে যেখান থেকে অন্তিম নির্ণয় হয়ে থাকে সেই মনে কিংবা যার

দেওয়া বস্তুর ভিত্তিতে মন নির্ণয় করে, সেই ইন্দ্রিয়ের বিজ্ঞানের মধ্যেও বাহ্যার্থের (বস্তুতত্ত্ব) কোনো নিদর্শন নেই। নির্ণায়কস্থলে আমাদের কেবলমাত্র-বিজ্ঞানই (চেতনা) মেলে, অতএব সেজন্যই ‘বস্তুরাশির দ্বারাই বিজ্ঞান সিদ্ধ, যাকে বিচারক বলা হয়—যেমন যেমন পদার্থের বিষয়ে চিন্তন করা যায়, তেমন তেমনই সেই পদার্থ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে লুপ্ত হয়ে যায়—তার বস্তুর রূপ সিদ্ধ হয় না।’ (প্রমাণবর্তিক, ৩।২০৯)

(খ) চেতনা ও বস্তুতত্ত্ব বিজ্ঞানেরই দুটি রূপ। বিজ্ঞানের অভ্যন্তরীণ আকার চিন্তা-সুখ ইত্যাদির গ্রাহক, কিন্তু যা বাহ্য পদার্থ (উদাহরণস্বরূপ ঘড়া কিংবা বস্ত্র) তাও বিজ্ঞান থেকে পৃথক নয়; বরং বিজ্ঞানেরই আরেকটি ভাগ থাকে যাকে বহিরঙ্গ বলে মনে হয়। এর অর্থ হল, একই বিজ্ঞান অভ্যন্তরে চিন্তরূপে গ্রাহক, আর বাইরে বিষয়ের রূপে গ্রাহ্য। ‘বিজ্ঞান যখন অভিন্ন তখন তার বাইরের এবং ভিতরের বিজ্ঞান কিংবা বস্তুতত্ত্বের রূপে ভিন্ন প্রতিভাসিত হওয়া সত্য নয়, ভ্রম।’ গ্রাহ্য (বাহ্য পদার্থ রূপে মনে হওয়ার বিজ্ঞান) এবং গ্রাহক (অভ্যন্তরীণ চিন্তরূপে বিজ্ঞান) এই দুইয়ের মধ্যে একটিরও অভাব ঘটলে, দুটির কোনোটিই থাকে না (গ্রাহ্যক না থাকলেও বিষয়টি গ্রাহ্য, এ কথা কী ভাবে প্রমাণিত হবে? আবার গ্রাহ্য না থাকলে আপন গ্রাহকত্বকে দেখিয়ে গ্রাহকচিন্ত তার আপনসত্তাকে কী ভাবে প্রমাণিত করবে? এ ভাবেই কোনো একটির অভাবে দুটিই আর থাকে না)। এজন্যই জ্ঞানেরও তত্ত্ব এই যে গ্রাহ্য গ্রাহক উভয়ের উপস্থিতির অভাব। (অভিন্নতা, যা আকার প্রকার গ্রাহ্য এবং গ্রাহকের আকার ব্যতিরেকে অন্য কোনো আকারে উপলব্ধ নয়, এবং গ্রাহ্য গ্রাহক একই নিরাকার বিজ্ঞানের দ্বৈতরূপ)। সেজন্যই আকার প্রকার দ্বারা শূন্য হওয়ার কারণে সমস্ত পদার্থকেই নিরাকার বলা হয়েছে। (প্রমাণবর্তিক, ৩।২১৫) প্রশ্ন হতে পারে যে যদি বাহ্য পদার্থের বস্তুসত্তাকে অস্বীকার করি, তাহলে তার বিভিন্নতাকেও অস্বীকার করতে হয়; অতঃপর বাহ্যার্থ ব্যতিরেকে ‘এটি ঘড়া, ওটি বস্ত্র’ এই ধরনের জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য কী ভাবে টানা যেতে পারে? এর উত্তরে—‘কোনো আকার সম্বন্ধীয় জ্ঞান আছে যা চিন্তের অভ্যন্তরীণ বাসনাকে (পূর্বসংস্কার) জাগ্রত করে এবং সেই বাসনা জাগ্রত হওয়ার কারণে জ্ঞানের ভিন্নতার নিয়ম দেখা যায়, বাহ্য পদার্থের অপেক্ষায় নয়।’ (প্রমাণবর্তিক, ৩।৩৩৬) ‘যেহেতু বাহ্য পদার্থের অনুভব আমাদের হয় না, সেজন্য একই বিজ্ঞান দ্বৈতরূপে (অভ্যন্তরীণ জ্ঞান এবং বাহ্য বিষয়) দেখা যায় এবং ওই দুই রূপে স্মরণও করা হয়। এই একই বিজ্ঞানের দ্বৈতরূপের পরিণাম হল স্ব-সংবেদন (অভ্যন্তরীণ জ্ঞানের সাক্ষাৎকার)।’ (প্রমাণবর্তিক, ৩।৩৩৭)

আবার প্রশ্ন হতে পারে—‘এই যে বাহ্য পদার্থের রূপে অবভাসিত হওয়ার যোগ্য (জ্ঞান) তা যে কোনো প্রকারেই হোক বাহ্যিক পদার্থরূপে ভাসিত হচ্ছে। তাকে ছেড়ে দিলে পদার্থের গ্রহণ (ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ) কী ভাবে হতে পারে? (কারণ নিজ স্বরূপের জ্ঞানের সাক্ষাৎকারের দ্বারাই কি পদার্থের নিজস্ব গ্রহণ নয়?)... প্রশ্ন ঠিক, কী ভাবে এটা হয় তা আমারও অজানা। যেমন মন্ত্র (সম্মোহন) ইত্যাদি যাদের দ্বারা (চক্ষু ইত্যাদি) ইন্দ্রিয়কে বেঁধে দেওয়া হয়েছে, সে অবস্থায় মাটির টুকরোকেও মুদ্রা কিংবা অন্যরূপে

দেখার সম্ভাবনা থাকে, যদিও তা মুদার রূপের সঙ্গে সম্পর্ক রহিত।' (প্রমাণবার্তিক, ৩। ৩৫৩-৫৫) 'এ ভাবে যদিও অন্তরে বাইরে একই বিজ্ঞানতত্ত্ব হয়ে থাকে, তবুও তত্ত্ব অর্থের (বাস্তবিকতার) দিকে ধ্যান না দিয়ে হাতির মতো চোখ বুঝে শুধুমাত্র লোক ব্যবহারের অনুসরণকারী তত্ত্বজ্ঞানীদের কতবার বাহ্যিক পদার্থের চিন্তন (বর্ণন) করতে হয়।' (প্রমাণবার্তিক, ৩। ২১৯)

(৪) ক্ষণিকবাদ—বুদ্ধের দর্শনে 'সমস্ত কিছুই অনিত্য' এই সিদ্ধান্তের উপরে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, এ কথা আগেই বলা হয়েছে। বুদ্ধের অনিত্যবাদকে পরবর্তীকালের বৌদ্ধ দার্শনিকেরা ক্ষণিকবাদ নাম দিয়ে তাকে অভাবাত্মক রূপ থেকে ভাবাত্মক রূপে নিয়ে গেছেন। ধর্মকীর্তি এই বিষয়ে আরও গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন— 'সত্তা মাত্রই বিনাশধর্মী'। (প্রমাণবার্তিক, ১। ২৭২—'সত্তামাত্রানুবদ্ধিত্বাত নাশস্য') এই ভাবে পরবর্তীকালে জ্ঞানশ্রী এ ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন— 'যা সং ভাবরূপ তাই ক্ষণিক।' ('যত্ সততত্ ক্ষণিকং ক্ষণভঙ্গ' ১। ১—জ্ঞানশ্রী)। 'সমস্ত সংস্কারই অনিত্য' এই বুদ্ধবচনের দিকে ইঙ্গিত করে ধর্মকীর্তি বলেছেন— 'যা কিছু উৎপন্ন স্বভাবাপন্ন তা সমস্ত কিছুই নাশ (ধ্বংস) স্বভাবাপন্ন।' (প্রমাণবার্তিক, ২। ২৮৪-৮৫) অনিত্য, কী, এই ব্যাখ্যা করে বলেছেন— 'প্রথমে উৎপন্ন হয়ে যে ভাব (পদার্থ) পরবর্তীকালে থাকে না (বিনষ্ট হয়) তাই অনিত্য।' (প্রমাণবার্তিক, ৩। ১১০) এই ভাবে কোনো অপবাদ ব্যতীত ক্ষণিকতার নিয়ম সমস্ত ভাবসত্তা সংবলিত পদার্থের মধ্যে বর্তমান।

(৫) পরমার্থ সং-এর ব্যাখ্যা— প্লেটো এবং উপনিষদের দার্শনিকগণ ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তনশীল জগৎ এবং তার সমস্ত পদার্থের পিছনে এক অপরিবর্তনীয় তত্ত্বকে পরমার্থ সং বলে স্বীকার করেছেন। কিন্তু বৌদ্ধ দর্শনে এ জাতীয় ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধির বাইরের কোনো তত্ত্বকে স্বীকার করার কোনো প্রয়োজনীয়তা ছিল না। সেজন্যই ধর্মকীর্তি পরমার্থ সং-এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন— 'অর্থযুক্ত ক্রিয়াতে যে সমর্থ, সে-ই পরমার্থ সং। এর বিপরীতে যে অর্থক্রিয়ায় অসমর্থ, সে সংবৃতি (ব্যবহারিক) সং।' (প্রমাণবার্তিক, ৩। ৩) ঘড়া, বস্ত্র পরমার্থ সং কারণ তা অর্থক্রিয়ায় সমর্থ। তাদের দ্বারা জল আনা বা শীত-আতপের নিবারণ হতে পারে, কিন্তু ঘড়া ত্ব বা বস্ত্রাত্ম যা সাধারণ জাতিবাচক মনে হয়, সেটাই সংবৃতি (ব্যবহারিক) সং। কারণ তার অর্থক্রিয়া হয় না। এ ভাবে ব্যক্তি এবং তার বিভিন্ন বস্তুত্বই পরমার্থ সং। বস্তুত সমগ্র ভাব পদার্থ স্বয়ং ভিন্ন ভেদ ভিন্নতা রাখে, কিন্তু সেই সংবৃতির কারণে যখন তার মধ্যকার বহুত্ব ঢাকা পড়ে যায়, তখন সে কোনো রূপেই (ঘড়াত্ব) অভিন্ন মনে হতে থাকে।' (প্রমাণবার্তিক, ১। ৭১)

(৬) নাশ অহেতুক—ক্ষণিকতা সমস্ত ভাবের মধ্যে বিদ্যমান আছেই, অতএব ধ্বংস (নাশ) স্বাভাবিক; আবার ধ্বংসের জন্য কোনো হেতু বা হেতুসমূহের প্রয়োজন নেই— অর্থাৎ নাশ অহেতুক। বস্তুর উৎপত্তির জন্য হেতু বা হেতুসমূহের প্রয়োজন হয়, যা থেকে পূর্বের অসংখ্য পদার্থ ভাবে আসে। যেহেতু এক বিদ্যমান বস্তুর ধ্বংস এবং অপর অবিদ্যমান বস্তুর উৎপত্তি সঙ্গে সঙ্গেই হয়ে থাকে, সেজন্য সেই অবস্থাকে ভাষায়

প্রকাশের কালে একটা ভুল গড়ে উঠেছে যে, আমরা হেতুকে উৎপন্ন বস্তুর সঙ্গে না জুড়ে, নষ্ট বস্তুর সঙ্গে জুড়ে দিই। এই তথ্যকে প্রমাণিত করে ধর্মকীর্তি বলেছেন—

(ক) অভাবরূপী নাশের কোনো হেতুর প্রয়োজন নেই।—‘যদি কোনো কার্য (করণীয় পদার্থ) থাকে, তাহলে তার জন্য কোনো কারণের প্রয়োজন হতে পারে, নাশ যা অভাব রূপ হওয়ার কারণে কোনো বস্তুই নয়, তার জন্য কারণের কী প্রয়োজন?’ যা কার্য (কারণ থেকে উৎপন্ন) তা অনিত্য, যা অকার্য (কারণ থেকে উৎপন্ন হয়) তা অবিনাশী (নিত্য)। ‘বস্তুর বিনাশ নিত্য কারণ তা চিরকালের জন্য হয়; এই জন্য অ-কার্য=অহেতুক, এবং অহেতুক হওয়ার ফলে সে স্বভাবতই নাশ বস্তুমাত্রকে অনুসরণ করে।’ (প্রমাণবার্তিক, ১।১৯৫), এই ভাবে দেখা যায় যে বিনাশের জন্য কোনো হেতুর প্রয়োজন নেই।

(খ) নশ্বর বা অ-নশ্বর উভয় অবস্থাতেই ভাবের নাশের জন্য কোনো হেতুর প্রয়োজন নেই—‘যদি আমরা তাকে অ-নশ্বর মনে করি, তাহলে দ্বিতীয় কোনো হেতুর দ্বারা ভাবের বিনাশকে স্বীকার করব না, তাহলে এ ধরনের অনশ্বর ভাবের স্থিতির জন্য হেতুর কী প্রয়োজন? (অর্থাৎ ভাবের অবস্থানেই অহেতুক প্রতিপন্ন হবে।) আবার যদি আমরা ভাবকে নশ্বর মনে করি, তাহলে তা অন্য কোনো হেতু বিনাই বিনষ্ট হবে। অতঃপর তার স্থিতির পক্ষে হেতু অসমর্থ হবে।’ ‘যে নিজে অনশ্বর স্বভাবের, তার জন্য অন্য স্থাপকের প্রয়োজন নেই; যে নিজে নশ্বর স্বভাবের; তার জন্য তো অন্য কোনো স্থাপকের প্রয়োজন হতেই পারে না।’ (প্রমাণবার্তিক, ২।৭২) এই ভাবে বিনাশকে নশ্বর কিংবা অনশ্বর স্বভাবের ধরলে উভয় অবস্থাতেই তাকে স্থিত রাখার জন্য হেতুর প্রয়োজন নেই।

(অ) ভাবের স্বরূপে নাশ ভিন্ন হোক বা অভিন্ন, উভয়বস্থাতেই নাশ অহেতুক—আগুন এবং কাঠ একত্রিত হলে আমরা কাঠের বিনাশ এবং অঙ্গার ও ভস্মের উৎপত্তি দেখতে পাই। একেই আমরা—‘আগুন কাঠকে পুড়িয়ে দিয়েছে, বিনষ্ট করে দিয়েছে’ বলে থাকি; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বলা উচিত ‘আগুন, অঙ্গার ও ভস্ম উৎপন্ন করেছে।’ যেহেতু কাঠ আমাদের দৃষ্টিতে অঙ্গার ও ভস্মের চেয়ে অধিকতর উপযোগী এবং মূল্যবান, সেজন্যই ভাষায় ব্যক্ত করার সময় একটি উপযোগী বস্তুর খোঁয়া যাওয়ার উপরে বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকি। যদি অঙ্গার, ভস্ম কাঠের চেয়ে অধিকতর উপযোগী হত তাহলে আমরা ‘আগুন কাঠকে নাশ করে দিয়েছে’ না বলে বলতাম ‘আগুন অঙ্গার ও ভস্ম উৎপন্ন করেছে।’ বস্তুত বনে জঙ্গলে যেখানে সাধারণ মানুষ কাঠের বদলে কাঠকয়লা তৈরি করে বিক্রি করার মধ্যে বেশি লাভ দেখতে পায়, সেখানে যদি কাউকে প্রশ্ন করা হয় ‘তোমরা কী কাজ করছ?’ উত্তর হবে ‘আমরা কাঠকয়লা তৈরি করছি’, তারা ‘কাঠ নষ্ট করছি’ বলবে না। টাটা কোম্পানির লোহার কারখানায় লৌহপাথরের নাশ এবং লোহা কিংবা ইস্পাতের উৎপত্তি; কিন্তু সেখানে নাশকে স্বাভাবিক (অহেতুক) মনে করে সে কথা না বলে, বলা হয় টাটা কোম্পানি প্রতি বছর এত কোটি টন লোহা এবং ইস্পাত উৎপাদন করে। আমাদের দার্শনিকেরা এই ভাবটিকেই বোঝাবার চেষ্টা করেছেন।

প্রশ্ন হল—আগুন (কারণ, হেতু) কী করে? কাঠের বিনাশ না কয়লার সৃষ্টি? আপনি বলেন কাঠের বিনাশ করে। তাহলে প্রশ্ন এই যে বিনাশ কাঠ থেকে ভিন্ন বস্তু না অভিন্ন বস্তু? অভিন্ন মনে করলে, আগুন সেই বিনাশকে সৃষ্টি করে, সে তো সেই কাঠ, তাহলে ‘বিনাশ’-এর অর্থ কাঠ, অর্থাৎ কাঠের বিনাশ হয়নি, তাহলে কাঠের অবিনাশী সত্তার মধ্যে কাঠের দর্শন পাওয়া উচিত। ‘যদি বলা হয় আগুন থেকে উৎপন্ন বস্তুই কাঠের বিনাশ, সেই জন্যই কাঠের দর্শন হয় না, তাহলে পুনরায় প্রশ্ন ওঠে—কী ভাবে বিনাশরূপী এক পদার্থ (কাঠরূপী) আর একটি পদার্থের বিনাশ হবে? (যদি নাশ এক ভাবাত্মক পদার্থ হয়) তাহলে কাঠকে কেন আর দেখা যায় না।’

(আ) বিনাশ এক ভিন্ন ভাবরূপী বস্তু, এ কথা মেনে নিলেও সমস্ত প্রশ্নের সমাধান হয় না—‘যদি বলা হয়, বিনাশ (শুধুমাত্র কাঠের অভাব নয়) এক অন্য ভাবরূপী পদার্থ; এবং সেই ভাবরূপী বিনাশ নামধারী অন্য পদার্থ দ্বারা আবরিত হওয়ার কারণে আমরা কাঠের দর্শন পাই না; (তাহলে এটাও সঠিক নয়)। কারণ তা থেকে (এক দ্বিতীয় ভাব—নাশ) কাঠের আবরণে হতে পারে না, কারণ এ কথা মানলে নাশকে বস্তুর আবরণ স্বীকার করতে হয়; তাহলে সে আর বিনাশ থাকবে না, বিনষ্ট হয়ে যাবে।’ (প্রমাণবর্তিক, ১। ২৭৪) এ ভাবে আগুন কাঠের বিনাশকে উৎপন্ন করে, কর্মের অভাবে এরকম বলাও ভ্রান্ত। আবার যদি আগুন দ্বারা নাশের উৎপত্তি মেনে নিই তাহলে ‘উৎপন্ন হওয়ার কারণে’ তাকে নাশ স্বভাবযুক্ত বলে মানতে হবে, কারণ সমস্ত উৎপন্ন ভাব (পদার্থ) বিনাশশীল হয়ে থাকে। আবার বিনাশশীল হওয়ার কারণে যখন নষ্ট হয়ে যায়, তখন আবরণ মুক্ত হওয়ার কারণে কাঠের দর্শন হওয়া উচিত। যদি বলা হয় নাশরূপী ভাবই কাঠের হস্তারক, রাম শ্যামকে হত্যা করেছে (নষ্ট করে দিয়েছে) তখন বিচারক রামকে দণ্ডদেশ শোনায়, কিন্তু রামের ফাঁসি হয়ে গেলে—‘হস্তারকের নাশ হয়ে গেলে’—যেমন মৃত শ্যাম (নষ্ট শ্যাম) পুনরায় অস্তিত্বে ফিরে আসে না, সেরকমই যেখানেই হোক নশ্বর স্বভাবের নাশ নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর কাঠও আবার অস্তিত্বে ফিরে আসে না। (প্রমাণবর্তিক, ১। ২৭৪-৭৫) কিন্তু এই দৃষ্টান্ত কি ভ্রান্ত? রামের দ্বারা শ্যামের নাশে ‘হস্তা (রাম) = (শ্যামের) মরণের কারণ হয় না’, শ্যামের মরণ হল তার আপন প্রাণ ইন্দ্রিয়াদির নাশ হওয়ার কারণে। যদিও শ্যামের প্রাণ-ইন্দ্রিয়াদির নাশ হওয়াকে সরিয়ে নেওয়া হয়, তাহলে শ্যাম অবশ্যই অস্তিত্বে এসে যাবে। কিন্তু এখানে আমরা ‘নাশ পদার্থ = কাঠের মরণ’ স্বীকার করেছি, এই জন্য নাশ পদার্থের নষ্ট হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কাঠের পুনরায় অস্তিত্বে আসা উচিত।

(ই) ‘নাশ এক অভিন্ন ভাবরূপী বস্তু’ মানলেও কাজ হচ্ছে না—‘যদি বলা হয় বিনাশ (ভাবরূপী বস্তু কাঠ থেকে) অভিন্ন, সেই অবস্থায় ‘নাশ=কাঠ’ হয়; তবু কাঠ=নাশ=অসৎ, অতএব নাশক আগুন তার কারণ হতে পারে না।’ ‘নাশকে (কাঠ থেকে) ভিন্ন অথবা অভিন্ন এই দুই অবস্থা ছাড়া আর কিছু মানা চলে না। আর আমরা একটু আগেই দেখেছি যে উভয় অবস্থাতেই নাশের জন্য হেতুর (কারণ) প্রয়োজন নেই, অতএব নাশ অহেতুক হয়ে থাকে।’

যদি বলা হয়—‘নাশকে অহেতুক মানলে তা নিত্য হবে, অতঃপর কাঠের নাশ এবং ভাব উভয়কে একসঙ্গে বিদ্যমান মানতে হবে। এই আশঙ্কাও ভুল ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত, কারণ নাশ তো অসৎ (অভাব) এবং অ-সৎ-এর নিত্যতা কী ভাবে সম্ভব?’ নিত্য অনিত্য প্রশ্ন ভাব পদার্থ সম্বন্ধে প্রযোজ্য—গর্দভের শিং জাতীয় কোনো (কাল্পনিক) অসৎ পদার্থের জন্য নয়। (প্রমাণবার্তিক, ১। ২৭৫-৭৭)

(৭) কারণ সমূহ বাদ—কার্য কোনো একটি নয় বরং অনেক কারণসমষ্টি একত্রিত হয়ে—যে কারণসামগ্রী সৃষ্টি করে—তার দ্বারা উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ অনেক কারণ মিলিত হয়ে একটি কার্যকে উৎপন্ন করে। এই সিদ্ধান্তের দ্বারা বৌদ্ধ দার্শনিকগণ জগতে প্রয়োগত সিদ্ধ বস্তু স্থিতির ব্যাখ্যা করেছেন এবং কোনো এক ঈশ্বরের কর্তার ভূমিকাকে খণ্ডন করেছেন। সেই সঙ্গে আরও বলেছেন যে, স্থিরবাদ—তা সে পরমাণু তত্ত্ব সম্বন্ধেই হোক বা ঈশ্বর সম্বন্ধে হোক—কারণের সামগ্রীকে একত্রিত করে অস্তিত্বে আনতে অক্ষম, অতএব যা কারণসামগ্রীকে একত্রিত করে অস্তিত্বে আনতে সক্ষম—তা হল ক্ষণিকবাদ, যে ভাবের ক্ষণিকতা—স্থান ও কালের গতি—ইত্যাদি কারণসামগ্রী প্রস্তুত করতে পারে।

‘কোনো এক বস্তু এক কারণ থেকে উৎপন্ন হয় না, বরং কারণসামগ্রী (অনেক কারণের একত্রিত হওয়া) থেকে একটি বা একাধিক কার্যই উৎপন্ন হয়।’ (প্রমাণবার্তিক, ৩। ৫৩৬) ‘কার্যের স্বরূপের (স্বভাব) মধ্যে যে ভিন্নতা আছে তা আকস্মিক নয়, বরং তা কারণসামগ্রীর কারণেই উৎপন্ন হয়। যদি কারণ ব্যতিরেকে অন্য কোনো কিছু থেকে উৎপন্ন স্বীকার করলে (কয়লা) সেই আগুন থেকে উৎপন্ন কী ভাবে বলা যেতে পারে?’ (প্রমাণবার্তিক; ৪। ২৪৮)

‘মাটি, চক্র, কুস্তকার পৃথক পৃথক ভাবে কোনো ঘড়ার মতো ভিন্ন রূপের কার্য করতে অসমর্থ; কিন্তু তাদের একত্রিত করলে কার্য সম্পন্ন হয়। এ থেকে আমাদের এই ধারণার সৃষ্টি হয় যে সংহত (একত্রিত) হওয়া ক্ষণিক বস্তুর মধ্যে হেতুত্ব (কারণত্ব) বর্তমান, ঈশ্বর ইত্যাদির মধ্যে নয়, কারণ ঈশ্বর ইত্যাদির মধ্যে ক্ষণিকতা না থাকার কারণে তারা অভেদ্য।’ (প্রমাণবার্তিক, ২। ২৮)

(৮) প্রমাণ সম্বন্ধীয় বিচার—মানুষের জ্ঞান যত বৃদ্ধি পেয়েছে, তত মানুষ জ্ঞানের মহত্বকে উপলব্ধি করেছে। এবং তার ফলে জীবনের প্রতিক্ষেত্রে মস্তিষ্ক ও বুদ্ধিবৃত্তির অধিকতর উপযোগ করেছে। জ্ঞানের এই মহিমাই পরবর্তীকালে প্রয়োগ সিদ্ধ না হয়ে কল্পনা সিদ্ধ রূপে ধর্ম এবং ধর্ম-সহায়ক দর্শনে পরিণত হয়। উপনিষদই এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। উপনিষদের দার্শনিকগণ যত গুরুত্ব জ্ঞানের উপরে দিয়েছিলেন, বুদ্ধ সেখানে তাঁদের থেকেও জ্ঞানের উপরে অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। বুদ্ধ মনে করতেন, অবিদ্যাই সমস্ত অসৎ-এর মূল। সেজন্যই তিনি অসৎকে বিলুপ্ত করার জন্য সত্য বা নির্দোষ জ্ঞানকে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় মনে করতেন। পরবর্তী শতাব্দীতে যখন ভারতীয় দার্শনিকদের অ্যারিস্টটলের তর্কশাস্ত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত হবার সুযোগ হল, তখন জ্ঞান এবং তা লাভ করার উপায়ের দিকে তাঁদের দৃষ্টি অধিকতর প্রসারিত হয়। নাগার্জুন, কণাদ, অক্ষপাদ প্রভৃতির দর্শনে আমরা এর প্রমাণ পেয়েছি। বসুবন্ধু, দিগ্‌নাগ,

ধর্মকীর্তিরা তা থেকে আগ্রবাক্য মেনে, তাঁদের প্রমাণশাস্ত্র রচনা করেছেন। দিগ্‌নাগ তাঁর প্রধান গ্রন্থের নাম ‘প্রমাণসমুচ্চয়’ এবং ধর্মকীর্তি তাঁর প্রধান গ্রন্থের নাম কেন ‘প্রমাণবার্তিক’ রেখেছিলেন, তা আমরা উপরোক্ত পরিপ্রেক্ষিতের কথা মনে রাখলে ভালো ভাবে অনুধাবন করতে পারব।

প্রমাণ—প্রমাণ কী? ধর্মকীর্তি উত্তর দিয়েছেন—‘অন্য কোনো উপায়ে অজ্ঞাত অর্থের প্রকাশক, অ-বিসংবাদী (বস্তুস্থিতির বিরুদ্ধে যায় না, এমন) জ্ঞানকে বলা হয়।’ (প্রমাণবার্তিক, ২। ১)। অবিসংবাদ কী?—‘জ্ঞানের কল্পনার উপরে স্থিত না হয়ে অর্থক্রিয়ার উপরে স্থিত হওয়াই অবিসংবাদ।’ এই জন্যই কোনো জ্ঞানের প্রমাণতা, ব্যবহার, প্রয়োগ, অর্থক্রিয়ার দ্বারাই হয়। (প্রমাণবার্তিক, ২। ৪)

(প্রমাণ সংখ্যা)—আমরা দেখেছি যে অন্য ভারতীয় দার্শনিকগণ শব্দ উপমান, অর্থাপত্তি ইত্যাদি আরও বহু প্রমাণকেই স্বীকার করেছেন। ধর্মকীর্তি অর্থক্রিয়া অথবা প্রয়োগকে পরমার্থ সৎ-এর কষ্টিপাথর বলে মনে করেন। সেজন্যই তিনি সেই ধরনের প্রমাণকেই স্বীকার করেন যার ভিত্তি অর্থক্রিয়া। ‘পদার্থ, পৃথক পৃথক ভাবে নিলে স্বলক্ষণ শব্দ আদির প্রয়োগ বিনা কেবল স্বকীয় রূপে পাওয়া যায়, কিংবা কয়েকটির মধ্যে সাদৃশ্যের কারণে সাধারণ লক্ষণ—অনেকের মধ্যে তার কয়েকটি আকারসাম্য অবস্থায় পাওয়া যায়—এ ভাবে বিষয়টি কেবলমাত্র দুই প্রকার হওয়ার ফলে প্রমাণও দুই রকমের হয়ে থাকে। এর মধ্যে প্রথমটি প্রত্যক্ষ এবং অপরটি অনুমান। প্রত্যক্ষের আধার হল বস্তুর স্বলক্ষণ এবং তার নিজের স্বরূপ, আর সেই স্বলক্ষণ অর্থক্রিয়ায় সমর্থ হয়। অনুমানের আধার সামান্য লক্ষণ—অনেক বস্তুর মধ্যে সমানরূপতা, আর সে সামান্য লক্ষণ, তাই সে অর্থক্রিয়ায় অসমর্থ।’ (প্রমাণবার্তিক, ৩। ১)

(ক) প্রত্যক্ষ প্রমাণ—জ্ঞানের সাধন দুটি, প্রত্যক্ষ এবং অনুমান। প্রত্যক্ষ কী? ‘ইন্দ্রিয়, মন এবং বিষয়ের সংযোগে সম্পূর্ণ কল্পনা বর্জিত যে জ্ঞান প্রাপ্তি হয়, এবং অন্য কোনো সাধন দ্বারা অজ্ঞাত অর্থের প্রকাশক হয়, সেটাই প্রত্যক্ষ, কল্পনা নয়, এবং তা কেবলমাত্র প্রতিঅক্ষ দ্বারাই প্রমাণিত হয়। এই ভাবে প্রত্যক্ষ অবিসংবাদী (অর্থক্রিয়ার অনুসরণকারী) অজ্ঞাত অর্থের প্রকাশক জ্ঞান, যা বিষয় সম্পর্কের সেই পূর্বক্ষণে হয়ে থাকে যখন কল্পনা সেখানে আপন স্থান দখল করতে পারেনি। ধর্মকীর্তিও দিগ্‌নাগের মতো প্রত্যক্ষের চারটি ভেদ স্বীকার করেছেন—ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ, মানব-প্রত্যক্ষ, স্বসংবেদন-প্রত্যক্ষ এবং যোগী-প্রত্যক্ষ, অসঙ্গের লোক-প্রত্যক্ষকে তিনি এড়িয়ে গিয়েছেন।

(অ) ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ—‘চারদিক থেকে ধ্যান (চিন্তন)-কে সরিয়ে (কল্পনা মুক্ত হওয়ার কারণে) নিশ্চল (স্তিমিত) চিত্তের সঙ্গে স্থিত (পুরুষ) রূপকে দেখা যায়, সেটাই ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ জ্ঞান।’ (প্রমাণবার্তিক, ৩। ১২৪) ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ হয়ে যাওয়ার ‘পিছনে যখন সে কিছু কল্পনা করে এবং সে জানে—আমার মনের এরকম কল্পনা (বিশেষ আকার প্রকারের কারণে তাকে ঘট বলা যেতে পারে) হয়েছিল; কিন্তু সেই ধারণা পূর্বোক্ত ইন্দ্রিয় থেকে (উৎপন্ন) জ্ঞানের সময় হয় না।’ (প্রঃ বাঃ, ৩। ১২৪) ‘এজন্য

সমস্ত (চক্ষু ইত্যাদি সহ) ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ ব্যক্তিবিশেষ মাত্রের বিষয়ে হয়ে থাকে; বিশেষ (বস্তুসমূহের স্বরূপ সাধারণ ভাবে কেবল স্বলক্ষণ মাত্র, সেজন্য তার মধ্যে) শব্দের প্রয়োগ হতে পারে না।' (প্রমাণবার্তিক, ৩। ১২৫-২৭) 'এই (ঘট বস্তু) বিষয়ের সে বাচক এবং এ ভাবে বাচ্য-বাচকতা সম্বন্ধের কারণে যে পদার্থ প্রতিভাসিত হয়ে চলেছে, সেই বাচ্য-বাচক পদার্থের সঙ্গে সে সম্বন্ধযুক্ত; (এবং যে মুহূর্তে সেই বাচ্য-বাচক সম্বন্ধের দিক মন কল্পনায় বিচরণ করে) সে সময় বস্তু ইন্দ্রিয়ের সম্মুখ থেকে অপসারিত হয়ে থাকে এবং মন তার সংস্কারকে তার অভ্যন্তরীণ নতুন এবং পুরোনো দুই কল্পনা চিত্তকে মিলিয়ে নামকরণের চেষ্টায় থাকে।' (প্রঃ বাঃ, ৩। ১২৯)

'(শংকরস্বামী যেরকম কিছু বৌদ্ধ প্রমাণশাস্ত্রী, প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে) ইন্দ্রিয়জ হওয়ার কারণে (শব্দের জ্ঞান থেকে বঞ্চিত) ছোট বালকের জ্ঞানের মতো কল্পনা রহিত জ্ঞান বলেছেন, এবং বালকের জ্ঞানকে এ ভাবে কল্পনা রহিত হওয়ার কারণে (বাচ্য-বাচকরূপে শব্দ-অর্থ সম্বন্ধের) সংকেতকে কারণ বলে অভিহিত করেন। এঁদের মতে কল্পনার অভাবের কারণে বালকের সমস্ত জ্ঞান শুধুই প্রত্যক্ষ হবে; আর বালকের সংকেতের জন্য কোনো উপায় না থাকার ফলে পরবর্তীকালেও (বালক বয়ঃপ্রাপ্ত হলে) সেই সংকেত জ্ঞান হতে পারবে না।' (প্রমাণবার্তিক, ৩। ১৪১-৪২)

(আ) মানস-প্রত্যক্ষ—দিগ্‌নাগ 'প্রমাণসমুচ্চয়ে' মানস-প্রত্যক্ষকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন—'পদার্থের প্রতি অনুরাগ প্রভৃতি যে জ্ঞান হয় সেটাই কল্পনা রহিত মানস-প্রত্যক্ষ জ্ঞান।' মানস-প্রত্যক্ষ স্বতন্ত্র প্রত্যক্ষ থাকবে না, যদি পূর্বের ইন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞাত অর্থকেই গ্রহণ করি, কারণ এ অবস্থায় (পূর্বজ্ঞাত অর্থের প্রকাশক হওয়ায় সে আর অজ্ঞাত অর্থ প্রকাশক নয়; অতএব) তা প্রমাণ হবে না। যদি ইন্দ্রিয়জ্ঞান দ্বারা অ-দৃষ্টকে (মানস-প্রত্যক্ষ) স্বীকার করা যায়, তাহলে অন্ধেরও রূপ আদি অর্থের দর্শন হয়, এ কথা স্বীকার করতে হয়। ('মানসং চার্খরাগাদি'—প্রমাণবার্তিক, ৩। ১২৩৯), এইসব দিকে খেয়াল করে ধর্মকীর্তি মানস-প্রত্যক্ষের ব্যাখ্যা করেছেন—

'চক্ষু আদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে বিষয়ের বিজ্ঞান উদ্ভূত হয়েছে, তারই অনন্তর প্রত্যয় (তীব্র গতিতে চলে যাওয়া কারণ) সৃষ্টি হয়ে যে মন (চেতনা) উৎপন্ন হয়েছে, সেটাই মানস-প্রত্যক্ষ। যেহেতু (চক্ষু ইত্যাদি ইন্দ্রিয় থেকে, জ্ঞাত রূপ আদি জ্ঞান থেকে) ভিন্নতাকে (মন প্রত্যক্ষের মধ্যে) গ্রহণ করে থাকে (সেজন্যই এই বাক্য অর্থের প্রকাশ নয়, সেই সঙ্গে মন দ্বারা প্রত্যক্ষ হবে, এমন রূপ আদিকে বিজ্ঞান ইন্দ্রিয়জ্ঞাত সেই রূপ আদির সঙ্গে সম্বন্ধ আছে, যাকে চক্ষুহীনরা দেখতে পায় না) সেজন্যই চক্ষুহীনদের (রূপ...) দেখার প্রশ্নই ওঠে না।' (প্রঃ বাঃ, ৩। ২৪৩)

(ই) স্বসংবেদন-প্রত্যক্ষ—দিগ্‌নাগ এর লক্ষণ সম্বন্ধে বলেছেন, '(চক্ষু ইন্দ্রিয় দ্বারা গৃহীত রূপের জ্ঞান, মনের মধ্যে গৃহীত রূপ-বিজ্ঞানের জ্ঞান হওয়ার পর রূপ আদি) অর্থের প্রতি নিজের অভ্যন্তরে যে রাগ (দ্বেষ) আদির সংবেদন (অনুভব) হয়ে থাকে সেই কল্পনা রহিত জ্ঞান স্বসংবেদন (প্রত্যক্ষ) হয়।' ('অর্থরাগাদি স্বসংবিত্তিরকল্পিকা'—প্রমাণসমুচ্চয়)। এর অর্থকে নিজের বার্তিক দিয়ে স্পষ্ট করতে গিয়ে ধর্মকীর্তি বলেছেন—

‘রাগ (সুখ) ইত্যাদির সেই স্বরূপ (আমরা যা অনুভব করি সেই) অন্য কোনো ইন্দ্রিয় আদির সঙ্গে সম্বন্ধ রাখে না, অতঃপর তার স্বরূপের প্রতি বাচ্য-বাচক সংকেতের প্রয়োগ হতে পারে না, এবং সেজন্যই তার নিজের অভ্যন্তরে যে সংবেদন হয়, তা বাচক শব্দের দ্বারা প্রকট হওয়ার উপযুক্ত নয়।’ (প্রমাণবার্তিক, ৩। ২৪৯) এ ভাবে অজ্ঞাত অর্থের প্রকাশক, কল্পনা রহিত এবং অবিসংবাদী হওয়ার ফলে রাগ-সুখ আদির যে অনুভব আমরা করে থাকি, সেই স্বসংবেদন প্রত্যক্ষও ইন্দ্রিয় এবং মানস-প্রত্যক্ষের থেকে ভিন্ন এক প্রত্যক্ষ হবে। ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষকে আমরা কোনো ইন্দ্রিয়ের একটি বিষয়ের (রূপ, গন্ধ) জ্ঞানপ্রাপ্তি হয়ে থাকি; মানস-প্রত্যক্ষ আমাদের তা থেকে অগ্রবর্তী স্তরে নিয়ে গিয়ে, ইন্দ্রিয় থেকে যে জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছে, তার অনুভব করায় এবং এ ভাবে এখন পর্যন্ত তার সম্বন্ধ বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে। কিন্তু স্বসংবেদন প্রত্যক্ষতে আমরা ইন্দ্রিয়ের (রূপ) জ্ঞান এবং সেই ইন্দ্রিয়জ্ঞানের জ্ঞান থেকে এগিয়ে গিয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন রাগ-দ্বेष কিংবা সুখ-দুঃখকে প্রত্যক্ষ করি।

(ঈ) যোগী-প্রত্যক্ষ (Intuition)—উপরোক্ত তিন প্রকার প্রত্যক্ষের অতিরিক্ত একটি চতুর্থ প্রত্যক্ষকে বৌদ্ধরা স্বীকার করেছেন। অজ্ঞাত-প্রকাশক অবিসংবাদী প্রত্যক্ষের এই বিশেষণ এখানেও ব্যবহৃত হয়েছে। সেই সঙ্গে বলা হয়েছে যে—‘সেই যোগীদের জ্ঞান ভাবনা থেকে উৎপন্ন, কল্পনার জাল মুক্ত যা সুস্পষ্ট ভাবে ভাসিত হয়। ‘সুস্পষ্ট’ শব্দটি এই কারণে ব্যবহৃত হয়েছে যে—কাম, শোক, ভয়, উন্মাদ, চোর, স্বপ্ন ইত্যাদির কারণ ভ্রমে পতিত ব্যক্তি অ-ভূত (অ-সৎ) পদার্থকেও সম্মুখে অবস্থিতির মতোই দেখতে পায়; কিন্তু তা স্পষ্ট হয় না। যে জ্ঞানের মধ্যে বিকল্প (কল্পনা) মিশে থাকে, তা স্পষ্ট পদার্থের রূপে ভাসিত হয় না। স্বপ্নে (দৃষ্ট পদার্থ)-ও স্মৃতিতে আসে, কিন্তু তা জাহতবস্থায় বিকল্প রহিত পদার্থের সঙ্গে মিশে আসে না।’ (প্রমাণবার্তিক, ৩। ২৮১-৮৩)

সমাধি (চিন্তার একাগ্রতা) ইত্যাদি ভাবনা থেকে প্রাপ্ত যত জ্ঞান আছে, তার সমস্তই যোগী-প্রত্যক্ষ প্রমাণের মধ্যে আসে না, বরং ‘তার মধ্যে সেই ভাবনা থেকে উৎপন্ন জ্ঞান, প্রত্যক্ষ-প্রমাণ দ্বারা অভিপ্রেত হয়, যা পূর্বে অজ্ঞাত প্রকাশক ইত্যাদির মতো সংবাদী (অর্থক্রিয়ার অনুসরণকারী) হয়, বাকি অন্য ভাবনা থেকে উৎপন্ন জ্ঞান—ভ্রম।’ (প্রমাণবার্তিক, ২। ২৮৬)

‘প্রত্যক্ষ জ্ঞান হতে হলে তাকে কল্পনা রহিত হতে হবে’, এই বিষয়টির উপরে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ পর্যন্ত কল্পনা রহিত হওয়া সহজে বোধগম্য হয়; কারণ এখানে আমরা দেখি যে সামনে একটি ঘড়া দেখলে চোখ ঘড়ার প্রতিবিম্বের যে প্রাথমিক ছাপ জ্ঞানতত্ত্বের দ্বারা আমাদের মস্তিষ্কে গিয়ে পড়ে, সেটা কল্পনা রহিত হয়ে থাকে। প্রথম ছাপের পর একটি প্রতিবিম্ব মস্তিষ্কের মধ্যে গৃহীত হয়; অতঃপর মস্তিষ্কের মধ্যে সংস্কার রূপে প্রথমে দেখা ঘড়ার যে প্রতিবিম্ব (বা প্রতিবিম্ব=সন্তান) সঞ্চিত থাকে তার সঙ্গে এই নতুন প্রতিবিম্ব (অথবা নিরবচ্ছিন্ন ভাবে প্রতিবিম্বিত হওয়া—প্রতিবিম্ব-সন্তান) মিলিত হয়—এবার এখানে কল্পনার যাত্রা শুরু হয়। এরপর যে প্রতিবিম্বের মধ্যে

এই নতুন প্রতিবিম্ব মিলিত হয়, তখনতার বাচক নামের স্বরণ হয়, তখনই এই নতুন প্রতিবিম্বিত পদার্থের নামকরণ করা হয়। এখানে কতদূর পর্যন্ত কল্পনা রহিত জ্ঞান ছিল, আর কোথা থেকে কল্পনার আরম্ভ হল, এটা সেই প্রথম ছাপের দ্বারা বোঝা সহজ, কিন্তু যেখানে বাহ্যিক বস্তুর ছাপের প্রশ্ন নেই, সেখানে কল্পনার আরম্ভের সীমারেখা নির্ধারিত করা—বিশেষত যোগী-প্রত্যক্ষের মতো জ্ঞানের সাহায্যে—অত্যন্ত কঠিন। সেজন্যই কল্পনার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ধর্মকীর্তি লিখেছেন—

‘যে বিষয়ে (বস্তু) যে জ্ঞান (উভয়কে পৃথক করে যে) শব্দার্থকে গ্রহণ করতে সক্ষম, সেই জ্ঞান সেই বিষয়ে কল্পনা। বস্তুর আপন রূপ পদার্থ (শব্দের বিষয়) হয় না, সেজন্য সেখানকার সমস্ত জ্ঞানই ‘প্রত্যক্ষ’। (প্রমাণবার্তিক, ২। ২৮৭)

এ ভাবে জ্ঞানের বিষয় বাহ্য বস্তু হোক কিংবা অভ্যন্তরীণ বিজ্ঞান; যতক্ষণ সমানতা অসমানতার প্রশ্নে প্রযুক্ত শব্দার্থের অবকাশ মেলে না, ততক্ষণ সে প্রত্যক্ষের সীমার ভিতরেই থাকে।

(প্রত্যক্ষাভাস)—চার প্রকারের প্রত্যক্ষ জ্ঞান নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি। কিন্তু এমন জ্ঞানও আছে, যা প্রত্যক্ষ-প্রমাণিত নয়, অথচ সাধারণ ভাবে দেখলে প্রত্যক্ষের মতো মনে হয়। এরকম প্রত্যক্ষাভাসের সঙ্গে পরিচিত হওয়াটাও বিশেষ প্রয়োজনীয়, না হলে আমরা ভ্রান্ত পথে চলে যেতে পারি। দিগুনাগ এ ধরনের প্রত্যক্ষাভাসকে চারটি ভাগে ভাগ করেছেন (ভ্রান্তিসংবৃতি-সজ্জ্ঞানং অনুমানানুমানিকম্। স্বার্থাভিলাপিকং চেতি প্রত্যক্ষভং সতৈমিরম্। —প্রমাণসমুচ্চয়) —‘ভ্রান্তি জ্ঞান, সংবৃতিমত-জ্ঞান, অনুমানানুমানিক স্বার্থাভিলাপিকজ্ঞান এবং তৈমিরি জ্ঞান।’ (১) ভ্রান্তিজ্ঞান মরুভূমির বালুকারাশিতে জলের জ্ঞান। (২) সংবৃতি জ্ঞান কাল্পনিক দ্রব্যের গুণসম্বন্ধীয় জ্ঞান—‘এটি অমুক দ্রব্য, এর অমুক গুণ।’ (৩) অনুমান (লিঙ্গ, ধূম) আনুমানিকের সংকেতবাদী স্মৃতির অভিলাপের (বচনের বিষয়) জ্ঞান—‘এটি ঘড়া’। (৪) তৈমিরি জ্ঞান হল, যা ইন্দ্রিয়ের মধ্যে কোনো ধরনের বিকারের কারণ। যেমন পাণ্ডু রোগগ্রস্ত ব্যক্তি সমস্ত কিছুকেই পাণ্ডুবর্ণের দেখে। এর মধ্যে প্রথম ‘তিন প্রকারের প্রত্যক্ষাভাস কল্পনা-যুক্ত জ্ঞান, (যে কল্পনায়ুক্ত হওয়ার কারণেই প্রত্যক্ষের ভিতরে গুণতিতে আসে না); আর একটি (তৈমিরি) কল্পনা রহিত, কিন্তু আশ্রায়িত (ইন্দ্রিয় বিকারের কারণে উৎপন্ন, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের আশ্রয়ে স্থিতি) এজন্যই সে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের মধ্যে আসে না—প্রত্যক্ষাভাস এই চার প্রকারের হয়ে তাকে।’ (প্রমাণবার্তিক, ৩। ২৮৮)

(খ) অনুমান-প্রমাণ—‘অগ্নি সম্বন্ধীয় জ্ঞান দু ভাবে হতে পারে (১) তার স্বরূপ থেকে, যেমন প্রত্যক্ষ দেখলে হয়; (২) অন্য রূপে যেমন ধোঁয়া দেখে অন্য একটি আগুনের রূপ মনে হয়; এ ভাবে অন্যরূপে এ ধোঁয়ার লিঙ্গ (চিহ্ন) দেখে আগুন সম্বন্ধে জ্ঞান হয়—যা অনুমান। যেহেতু পদার্থে স্বরূপ এবং পর-রূপ দুই ভাবেই জ্ঞান হয়ে থাকে, অতঃপর প্রমাণের বিষয়ও (ভেদ) দুই প্রকারেরই হয়।’—এক প্রত্যক্ষ প্রমাণের বিষয় এবং দুই অনুমানের বিষয়। (প্রমাণবার্তিক, ৩। ৫৪)

কিন্তু 'যা স্বরূপ থেকে অনুমান জ্ঞান হয় এবং সে যে বস্তুস্থিতিতে বর্তমান আছে, সেই অনুসারে নেওয়া হয় না। সেজন্য এই দ্বিতীয় ধরনের জ্ঞানও ভ্রান্তি। এরপর প্রশ্ন ওঠে বস্তুর আপন রূপ থেকে নয়, পর-রূপ থেকে জ্ঞান হয় তাহলে সেটাও ভ্রান্তি, এবং ভ্রান্তিকে প্রমাণ বলা যায় না, কারণ তা কখনওই অবিসংবাদী নয়। এর উত্তরে—ভ্রান্তিকেও প্রমাণ স্বীকার করা যেতে পারে, যদি তার জ্ঞানের অভিপ্রায় যে অর্থে আছে সেই অর্থের সঙ্গে অ-বিসংবাদ না ঘটে, তার বিরুদ্ধে না যায়, কারণ দ্বিতীয় রূপে লব্ধ জ্ঞানকেও অভিপ্রেত অর্থের সংবাদী দেখা যায়।' (প্রমাণবার্তিক, ৩। ৫৫-৫৬)। পাহাড়ে ধোঁয়ার মতো দেখতে পাওয়া আগুনের জ্ঞানকে আমরা আগুনের নিজস্ব রূপে পাই না, কিন্তু রন্ধনশালা থেকে ধোঁয়া বের হওয়া থেকে আমাদের আগুন সম্বন্ধে যে জ্ঞান হয়, সেই মতো পাই; আমাদের এই অনুমান জ্ঞান থেকে যে অভিপ্রেত অর্থ (পাহাড়ের আগুন) প্রকাশ পায়, তার সঙ্গে এর কোনো বিরোধ নেই।

(অ) অনুমানের আবশ্যিকতা—'বস্তুর যে আপন স্বরূপ (সলক্ষণ) আছে, তার মধ্যে কল্পনারহিত প্রত্যক্ষ প্রমাণের প্রয়োজন হয়, কিন্তু অনেক বস্তুর অভ্যন্তরে যা সাধারণ, তাকে কল্পনা ব্যতিরেকে গ্রহণ করা যায় না, এজন্য এই সামান্যের (সাধারণ) জ্ঞানে অনুমানের প্রয়োজন হয়।' (প্রমাণবার্তিক, ৩। ৭৫)

(আ) অনুমানের লক্ষণ—'কোনো 'সম্বন্ধী'র (পদার্থ, ধোঁয়ার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত আগুন) ধর্ম (লিঙ্গ—ধোঁয়া) থেকে ধর্মী (আগুন) বিষয়ে যে পরোক্ষ জ্ঞান হয়, তাকেই অনুমান বলা যায়।' (প্রমাণবার্তিক, ৩। ৬২—'অটুট সম্বন্ধযুক্ত দুটি পদার্থের মধ্যে একটির দর্শন তার সম্বন্ধকে জানার জন্য অনুমান হয়ে থাকে। 'অনন্তরোয়কার্ধদর্শনং তদ্বিদোহনুমানম্'—বসুবন্ধু বাদবিধি)

পাহাড়ে দূর থেকে ধোঁয়া দেখে, আমাদের রন্ধনশালা কিংবা অনুরূপ কোনো জায়গার আগুনের কথা মনে হয়, তখনই 'যেখানে যেখানে ধোঁয়া, সেখানে সেখানে আগুন' এই আগুণবাক্য স্মরণ হয়। অতঃপর ধোঁয়াকে হেতুরূপে স্থিত করে আমরা জেনে যাই যে পাহাড়ে আগুন জ্বলছে। এখানে আগুন পরোক্ষ, সেজন্য তার সম্বন্ধে জ্ঞান তার আপন স্বরূপে হয় না, যেমনটি প্রত্যক্ষ আগুনের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। দ্বিতীয় কথা হল, এই জ্ঞানটি আমাদের সদ্য সদ্য হয় না, আমাদের স্মৃতি, শব্দ-অর্থ-সম্বন্ধ—অর্থাৎ কল্পনার আশ্রয় নিতে হয়।

(প্রমাণ দুই ধরনের)—প্রমাণ দ্বারা জেয় (প্রমেয়) পদার্থস্বরূপ এবং পররূপ (কল্পনারহিত, কল্পনা-যুক্ত) এই দুই প্রকারে জানা হয়। এর মধ্যে প্রথমটিকে প্রত্যক্ষ এবং দ্বিতীয়টিকে পরোক্ষ ভাবে জানা যায়, 'প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ব্যতিরেকে তৃতীয় কোনো প্রমেয় সম্ভব নয়, এজন্য যেহেতু প্রমেয় মাত্র দুটি, অতএব প্রমাণও দুই রকমের হয়ে থাকে। দুই ধরনের প্রমেয়কে দেখার পর প্রমাণের সংখ্যাকে বাড়িয়ে তিনটি করা কিংবা কমিয়ে একটি করাও ভুল।' (প্রমাণবার্তিক, ৩। ৬৩-৬৪)।

(ই) অনুমানের ভেদ—কণাদ, অক্ষপাদ অনুমানকে একটি বলে স্বীকার করেছিলেন। সেজন্যই পূর্ববর্তী ঋষিদের পথে চলতে গিয়ে প্রশস্তপাদের মতো

দার্শনিকদের সামান্য অপবাদকে স্বীকার করে নিয়েও আজ পর্যন্ত ব্রাহ্মণ নৈয়ায়িকেরা অনুমানকে এক বলে মেনে নিয়েছেন। অনুমানের স্বার্থ-অনুমান; এবং পরার্থ-অনুমান এই দুই ভেদ সর্বপ্রথম আচার্য দিগ্‌নাগ করেছিলেন। (ধর্মোত্তর, 'ন্যায়বিন্দু', পৃ. ৪২) এই দুই প্রকারের অনুমানের মধ্যে স্বার্থ-অনুমান হল এমন অনুমান যার মধ্যে তিন ধরনের হেতুর (= লিঙ্গ, চিহ্ন, ধোঁয়া আদি) সাহায্যে কোনো প্রমেয়ের জ্ঞান নিজের জন্য (= স্বার্থ) করা হয়। পরার্থ-অনুমানে সেই তিন প্রকারের হেতু দ্বারা অপরের জন্য (পরার্থ) প্রমেয়ের জ্ঞান উপলব্ধি করানো হয়। (ন্যায়বিন্দু, ২। ৩)

(ঈ) হেতু (লিঙ্গ) ধর্ম—পদার্থের (প্রমেয়) যে ধর্মকে দেখে আমরা কল্পনার সাহায্যে তার অস্তিত্বের অনুমান করি, সেটাই হেতু। অথবা 'পক্ষের (আগুন) ধর্ম হেতু, যা পক্ষের (আগুন) অংশ (ধর্ম, ধোঁয়া) দ্বারা ব্যাপ্ত।' (প্রমাণবর্তিক, ১। ৩)।

'হেতু তিন ধরনের হয়ে থাকে' (প্রমাণবর্তিক, ১। ৩)—কার্য-হেতু, স্বভাব-হেতু এবং অনুপলব্ধি-হেতু। আমরা কোনো পদার্থের অনুমান করি তার কার্য দ্বারা—'পাহাড়ে আগুন আছে, ধোঁয়ার কারণে।' এখানে ধোঁয়া আগুনের কার্য, এ ভাবে কার্য থেকে তার কারণ (আগুন)-এর অনুমান আমরা করতে পারি। এজন্য 'ধোঁয়ার কারণে' এই হেতুকে কার্যহেতু বলা যায়।

এখানে সামনের বস্তু 'সুন্দর ও সারবান গুঁড়িযুক্ত হওয়ায়', বৃক্ষ, এখানে 'সুন্দর ও সারবান গুঁড়িযুক্ত হওয়ার' কারণটিকে 'হেতু' বলা হয়েছে। বৃক্ষ সমস্ত শীশমের স্বভাবে (স্বরূপ) বর্তমান। সম্মুখের বস্তুকে যদি শীশম মনে করি তাহলে ওই স্বভাব-হেতুর কারণে তাকে বৃক্ষও মানতে হবে।

'টেবিলে গেলাস নেই' উপলব্ধিযোগ্য স্বরূপে হওয়া সত্ত্বেও 'উপলব্ধি না হওয়ার কারণে' এই অনুপলব্ধি হেতুর উদাহরণ। গেলাস এমন একটি বস্তু, যা থাকলে দেখা যাবে, আর তাকে দেখা না যাওয়ার (উপলব্ধি না হলে) অর্থ, সে টেবিলের উপরে নেই। গেলাসের অনুপলব্ধি এখানে হেতু রূপে তার নাম হওয়াকে সিদ্ধ করছে।

অনুমানের দ্বারা কোনো কিছুকে সিদ্ধ করার জন্য কার্য, স্বভাব, অনুপলব্ধির রূপে তিন ধরনের হেতু এজন্যই হয়, কারণ হেতুবান এই ধর্মসমূহ বিনাধর্মী (সাধ্য, আগুন) কখনওই হয় না, এই ধর্মীর সঙ্গে ধর্মের অ-বিনাভাব সম্বন্ধ বর্তমান। আমরা জানি 'যেখানে ধোঁয়া থাকে, সেখানে আগুন অবশ্যই থাকে', 'যা শীশম, তা নিশ্চয়ই বৃক্ষ', 'চোখে দেখতে পাওয়া গেলাস থাকলে নিশ্চয়ই দেখা যাবে, না দেখার অর্থ গেলাসের না থাকা।'।

(৯) মন এবং শরীর (ক) একে অপরের আশ্রিত—মন এবং শরীর পৃথক না এক, এই বিষয়েও ধর্মকীর্তি তাঁর বিচার প্রকট করেছেন। বৌদ্ধ দর্শন সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে প্রথমেই আমরা বলেছি এবং পরেও বলব যে বৌদ্ধরা আমাদের স্বীকার করেন না, সে জায়গায় তাঁরা চিত্ত, মন এবং বিজ্ঞানকে স্বীকার করেন, যা তিন পর্যায়ে। মন শরীর নয়; কিন্তু সেই সঙ্গে বলতে হয় যে 'মন কায়াশ্রিত' ইন্দ্রিয় কায়ামে (শরীর) হয়ে থাকে এটা আমাদের জানা আছে এবং 'যেহেতু ইন্দ্রিয় ব্যতিরেকে বুদ্ধি (মন, জ্ঞান) হয় না,

সেই সঙ্গে ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি ব্যতিরেকে হয় না, এ ভাবে উভয়ে (ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধি) অন্যান্য-হেতুক, একে অপরের উপরে নির্ভরশীল এবং এর দ্বারা মন ও শরীরের অন্যান্য-হেতুক হওয়া প্রমাণিত।' (প্রমাণবার্তিক, ২। ৪৩)

(খ) মন শরীর নয়—মন এবং শরীরের, একের অপরের উপরে আশ্রিত হওয়া-উভয়ে অ-বিনাভাব সম্বন্ধের হওয়া—দ্বারা আমরা এই পরিণামে উপস্থিত হই, যে মন শরীর থেকে সর্বদা ভিন্ন তত্ত্ব নয়, তা শরীরেরই একটি অংশ; অথবা মন এবং শরীর থেকে সর্বদা ভিন্ন তত্ত্ব নয়, তা শরীরেরই একটি অংশ; অথবা মন এবং শরীর উভয়ে সেই বাস্তব তত্ত্বের বিকাশ, যার ফলে তত্ত্বগত ভাবে তাদের মধ্যে কোনো ভেদ নেই—ভূত থেকেই চৈতন্যের উদ্ভব, এবং যা চৈতন্য তাই ভূত। ধর্মকীর্তি অন্যান্য বৌদ্ধ দার্শনিকদের মতো ভূতচৈতন্যবাদকে (বস্তুবাদ) খণ্ডন করতে গিয়ে বলেছেন—‘প্রাণ-অপ্রাণ (শ্বাস-প্রশ্বাস ইন্দ্রিয়, এবং বুদ্ধির (মন) উৎপন্ন তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষাকারী পূর্বজ কারণ ব্যতিরেকে শুধুমাত্র শরীর থেকে হয় না। যদি এই ধরনের উৎপত্তি (জন্মগ্রহণ) হত, তাহলে প্রাণ-অপ্রাণ-ইন্দ্রিয়বুদ্ধি বহু শরীর থেকে উৎপন্ন হওয়ার নিয়ম থাকত না (এবং যে কোনো ভূত থেকে জীবন প্রাণ-অপ্রাণ, ইন্দ্রিয় বুদ্ধিসহ শরীরের উৎপত্তি হত)।’ (প্রমাণবার্তিক, ২। ৩৫)

জীবনবাহী বীজ থেকেই দ্বিতীয় জীবনের উৎপত্তি হয়; এই ঘটনাও এই বক্তব্য সমর্থন করে যে, মন (চেতনা) কেবলমাত্র ভূতসমূহের উপজন্ম নয়। কোথাও কোথাও জীবনবীজ ব্যতিরেকেই জীবন উৎপন্ন হতে দেখা যায়, যেমন বর্ষা ঋতুতে ক্ষুদ্র কীট, এর উত্তরে ধর্মকীর্তি বলেছেন—

‘পৃথিবী ইত্যাদির এমন কোনো অংশ নেই যেখানে স্বেদজ প্রাণীর জন্ম হয় না; এর দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে সমস্ত ভূতোৎপন্ন সদৃশ বস্তু বীজাত্মক।’ (প্রমাণবার্তিক, ২। ৩৫)।

‘যদি আপন জীবনমুক্ত কারণ বিনা, ইন্দ্রিয় ইত্যাদির উৎপত্তি স্বীকৃত হয়, তাহলে যেমন এক জায়গার ভূত জীবনরূপে পরিণত হয়ে যায়; এবং সে ভাবে সমস্ত ভূতই পরিণত হয়ে যাওয়া উচিত; কারণ (পূর্বে জীবন শূন্য হওয়ার কারণে) সমস্ত একেরই মতো (কিন্তু সমস্ত কাঁকড়া এবং মাটির ঢেলাকে সজীব প্রাণরূপে পরিণত হতে দেখা যায় না।)’ (প্রমাণবার্তিক, ২। ৩৮)

‘বাতি (তেল) ইত্যাদির মতো (কফ, পিত্ত ইত্যাদি) দোষের কারণে দেহ বিগুণ (মৃত) হয়ে যায়—এ কথা বলা সঠিক নয়, এমন হলে তো মৃত্যুর পরে কফ, পিত্ত আদি দোষের উপশম হয়ে থাকে, এবং দোষে উপশম হওয়ার কারণে বিগুণতা সরে যাবে এবং বিগুণতা সরে যাবার কারণে মৃতদের পুনরায় জীবিত হয়ে ওঠা উচিত।

‘যদি বলা হয় জ্বলনের পর আগুনের নিবৃতি (শান্ত) হয়ে যাবার পরও কাঠের বিকার (কয়লা অথবা ছাই)—এর নিবৃত্ত (পূর্বের কাঠ রূপের পরিণতি) হয় না, সেই ভাবে (মৃত শরীরের কফ ইত্যাদির শান্ত হয়ে যাওয়ার পরও সজীব শরীর রূপে) পরিণতি হয়

না, এ কথা বলাও সঠিক নয়, কারণ চিকিৎসার প্রয়োগে দোষকে দূর করা গেলেও শরীর প্রকৃতিস্থ হয়ে ওঠে, তবে তা শরীরের সজীব অবস্থার মধ্যেই ঘটে।

‘(দোষ থেকে উৎপন্ন বিকারের নিবৃত্তি কিংবা অ-নিবৃত্তি সব জায়গায় এক ধরনের হয় না) কোনো বস্তু কোথাও কোথাও ফিরতে না দেবার (অনিবর্ত) বিকারের জনক (উৎপাদক) হয়ে থাকে; যেমন আগুন-কাঠের সম্বন্ধ (অনিবর্ত বিকারের জনক) হয়; কোথাও আবার এর বিপরীত (নিবর্ত বিকার-জনক) হয়, যেমন (সেই আগুন) সুবর্ণ সম্বন্ধে। প্রথমে কাঠের আগুনের কিছু বিচার (কালো ইত্যাদি হয়ে যাওয়া) অনিবর্ত (ফিরিয়ে দেওয়া)। কিন্তু অন্য ভাবে (সোনা আগুনে থাকলে) ফিরিয়ে দিতে পারার অবস্থা (প্রত্যানেধ) বিকার; এর ফলে সোনা আবার পূর্ববৎ সোনা ফিরে আসতে পারে।

‘যা কিছুকে অসাধ্য বলা হয় (যা রোগ আর মৃত্যুর কারণ কফ আদি দোষের) নিবারক (ঔষধ) দুর্লভ হওয়ার ফলে কিংবা আয়ু ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ার কারণে। যদি বস্তুবাদীদের মতানুসারে কেবল বস্তুদোষই মৃত্যুর কারণ হয় তাহলে এ ধরনের দোষকে হটানো অসাধ্য নাও হতে পারে।

‘(এ কথা স্বীকার করা হয় যে সর্প দংশনের পর যতক্ষণ জীবন থাকে ততক্ষণ বিষ সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়তে থাকে, কিন্তু শরীর নির্জীব হয়ে গেলে, বিষ আবার দংশিত স্থানে এসে জমা হয়; এ ভাবে যদি ভূতই চেতনা হয় তো শরীর মৃত হলে বিষ ইত্যাদি শরীরের অন্য স্থান থেকে সরে এক জায়গায় জড়ো হওয়ার ফলে শরীরের বাকি অংশে অথবা দংশিত স্থানকে কেটে বিচ্ছিন্ন করে ফেললে (অবশিষ্ট শরীরে নির্জীবতা রূপী) বিকারের হেতু (বিষ) সরে যাওয়ার ফলে সেই শরীর কেন আবার শ্বাস গ্রহণ শুরু করে না? এর দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয়ে যে চেতনা ভূত নয়, তা থেকে ভিন্ন এক বস্তু; যদিও তারা একে অপরের আশ্রিত হওয়ার ফলে পৃথক পৃথক অবস্থান রাখতে পারে না)

‘(ভূত থেকে চেতনার উৎপত্তি স্বীকার করলে ভূত উপাদান এবং চেতনা উপাদেয় হয়, অতঃপর) উপাদানের (শরীর) বিকার ব্যতিরেকে উপাদেয় (চেতনা) মধ্যে বিকার সৃষ্টি করা যায় না। কোনো বস্তুর বিকার যুক্ত না হয়ে যে পদার্থ বিকারবান হয়, সেই বস্তু সেই পদার্থের উপাদান হতে পারে না; যেমন (একের বিকার বিনা অন্যের বিকার যুক্ত হওয়া) গাই এবং নীলগাইয়ের মধ্যে (একে অপরের উপাদান হতে পারে না); এ ভাবেই মন এবং শরীরে (একের বিকার বিনাই অন্যের বিকার দেখা যায়।)’ (প্রমাণবার্তিক, ২। ৫৪-৬২)

(গ) মনের স্বরূপ—‘স্বভাবগত ভাবে মন প্রভাস্বর (নির্বিকার), তার মধ্যে আগত মল এক আগন্তুক (আকাশে অন্ধকার, কুয়াশা ইত্যাদির মতো নিজ থেকে ভিন্ন)।’ (প্রঃ বাঃ, ২। ২০৮)

অন্য দার্শনিকদের মতামত খণ্ডন

ধর্মকীর্তি তাঁর গ্রন্থ প্রমাণবার্তিকে নিজের দার্শনিক সিদ্ধান্তের সমর্থন এবং প্রতিপাদনই শুধু করেননি, উপরন্তু তিনি তাঁর সময়কাল পর্যন্ত হিন্দু দার্শনিক প্রগতির আলোচনাও করেছেন। যে সমস্ত দার্শনিক গ্রন্থকে সম্মুখে রেখে তিনি এই আলোচনা করেছেন, তার মধ্যে উদ্যোতকর এবং কুমারিলের মতো ব্রাহ্মণ দার্শনিকেরাও ছিলেন। আমরা পুনরুজ্জী এবং গ্রন্থ-কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় সে সম্বন্ধে পৃথক ভাবে কিছু লিখিনি কিন্তু এখানে ধর্মকীর্তির কৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করে তাঁর বিচার সম্বন্ধে আমরা একটা ধারণা পেতে পারি।

(১) নিত্যবাদীদের সামান্য ভাবে খণ্ডন—প্রথমে আমরা সেই সিদ্ধান্তগুলি নিয়ে আলোচনা করব, যেগুলিকে একাধিক দার্শনিক সম্প্রদায় স্বীকার করেছেন।

(ক) নিত্যবাদ খণ্ডন—অনিত্যবাদের (ক্ষণিকবাদ) ঘোর পক্ষপাতী হওয়ার কারণে বৌদ্ধ দর্শন নিত্যবাদের প্রচণ্ড বিরোধিতা করে থাকে। ভারতের অন্য সমস্ত দার্শনিক মতই কোনো না কোনো ভাবে নিত্যবাদকে স্বীকার করে। জৈন এবং মীমাংসকদের মতো আত্মবাদীরাই শুধু নয়, চার্বাকের মতো ঘোরতর বস্তুবাদীও ভূতের সূক্ষ্মতম অবয়বকে ক্ষণিক (অনিত্য) স্বীকার করতে অস্বীকার করেছেন, যেমন বিগত শতাব্দী পর্যন্ত ইওরোপের যান্ত্রিক বস্তুবাদীরা মূল-ভিত্তি—পরমাণুকে ক্ষণিক বলে স্বীকার করতেন না।

দিগ্‌নাগ বলেছেন ('কারণং বিকৃতিং গচ্ছজ্জায়তেইন্যস্য কারণম্')—'কারণ (স্বয়ং) বিকারকে প্রাপ্ত হয়েই অন্য কোনো বস্তুর কারণ হতে পারে।' ধর্মকীর্তি বলেছেন—'যার হওয়ার পর যে বস্তুর সৃষ্টি হয়, অথবা যার বিকারযুক্ত হওয়ার পরই দ্বিতীয় বস্তু বিকারপ্রাপ্ত হয়; তাকে তার পশ্চাতের বস্তুর কারণ বলা হয়।' (প্রমাণবার্তিক, ২। ১৮১-৮২)

এই ভাবে কারণ সেই হতে পারে, যার মধ্যে বিকার হওয়া সম্ভব। 'নিত্য বস্তুতে এই ঘটনা সম্ভব নয়, অতঃপর ঈশ্বর ইত্যাদি (যে নিত্য পদার্থ) যা আছে, তা থেকে কোনো বস্তু উৎপন্ন হতে পারে না।' (প্রমাণবার্তিক, ২। ১৮৩)।

'যাকে অনিত্য বলা যায় না, সে কোনো বস্তুর হেতু হতে পারে না। নিত্যবাদী পণ্ডিতগণ সেই স্বরূপকে নিত্য বলে থাকেন যার স্বরূপ (স্বভাব) বিনষ্ট হয় না।' (প্রমাণবার্তিক, ২। ২০৪)

আমরা আগেই আলোচনা করেছি যে ধর্মকীর্তি সেই বস্তুকেই পরমার্থ-সং বলেছেন যা অর্থবাদী (সার্থক) ক্রিয়ায় সমর্থ হয়। নিত্যের মধ্যে সর্বদাই বিকারের অভাব থাকার

ক্রিয়া হতেই পারে না। আত্মা, ঈশ্বর-ইন্দ্রিয়াতীত এবং সঙ্গে সঙ্গে তা নিত্য বলে নিষ্ক্রিয়; এতৎসত্ত্বেও সোচ্চারে তার অস্তিত্বের ঘোষণা করা সাহসের কাজই বটে।

(খ) আত্মবাদ খণ্ডন—চার্বাক এবং বৌদ্ধ দর্শন ব্যতিরেকে বাকি সমগ্র ভারতীয় দর্শনে আত্মাকে এক নিত্য চেতন পদার্থ রূপে স্বীকার করা হয়েছে। বৌদ্ধরা অনাত্মবাদী, অর্থাৎ আত্মাকে তাঁরা মানেন না। আত্মাকে না মানলেও ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তনশীল, চেতনা-প্রবাহ (বিজ্ঞান-সত্ত্বা) এক শরীর থেকে অন্য শরীরে যুক্ত হয় (প্রতিসন্ধি গ্রহণ করে) এই দর্শনে তাঁরা আত্মা রাখেন। চেতনা (মন অথবা বিজ্ঞান) সর্বদাই কায়শ্রিত থাকে। যখন এক শরীরের অন্য শরীরের সঙ্গে একেবারে সন্নিবিষ্ট সম্বন্ধ থাকে না, মৃত ব্যক্তির ‘ক’ শরীর এই ভূ-লোকে আছে আর তার পরবর্তীকালে সজীব হবে এমন ‘খ’ শরীর মঙ্গললোকে; এরকম অবস্থায় ‘ক’ শরীর ত্যাগ করে ‘খ’ শরীরে পৌঁছবার মধ্যবর্তীকালে কোনো বিশেষ এক ব্যবস্থা অবশ্যই থাকা উচিত, যেখানে বিজ্ঞানকে সম্পূর্ণ ভাবে কায়ামুক্ত স্বাধীন, স্বতন্ত্র বলে মানতে হবে, অতঃপর ‘মন কায়শ্রিত’—এ কথা বলা ভুল হবে। এর উত্তরে বৌদ্ধরা বলতে পারেন যে, আমরা মনকে এক স্বীকার না করে প্রবাহ মনে করি। প্রবাহের অর্থ নিরন্তর—অবিচ্ছিন্ন ভাবে চলতে থাকে কোনো বস্তু নয়; বরং প্রতিক্ষণে আপন রূপ থেকে বিচ্ছিন্ন—সর্বদা নষ্ট হয়ে যাওয়া—এবং পরক্ষণেই পূর্বের প্রতিরূপে, কিন্তু সম্পূর্ণ এক বস্তুর উৎপন্ন হওয়া, এবং আবার নষ্ট আবার নব-প্রতিরূপ উৎপত্তি—নষ্ট-উৎপত্তি-নষ্ট-উৎপত্তি—এ ভাবে এক বিচ্ছিন্ন প্রবাহ জারি থাকা। চেতন প্রবাহ এ ধরনের এক বিচ্ছিন্ন প্রবাহ, যা মনে হয় জীবন রেখা, কিন্তু এই রেখা অসংখ্য ‘জীবনবিন্দুর’ এক পঙ্ক্তি। অতঃপর প্রবাহকে বিচ্ছিন্ন মনে করে ‘মন কায়শ্রিত’ তত্ত্বকে ধরলে প্রতিটি বিন্দুরই কায়শ্রিত হওয়া উচিত। ‘ক’ শরীরের—যা স্বয়ং ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তনশীল শরীর-নির্বাপক মূল বিন্দুর (কণা) বিচ্ছিন্ন প্রবাহ—অন্তিম চিন্ত-বিন্দু নষ্ট হয়ে যায় এবং তার উত্তরাধিকারী ‘খ’ শরীর হয়ে থাকে। ‘ক’-শরীর প্রবাহের অন্তিম এবং ‘খ’ শরীর প্রবাহের আদিতে চিন্ত-বিন্দু সমূহের (ক-চিন্ত, খ-চিন্ত) মধ্যে কোনো ‘গ’ চিন্ত-বিন্দুর উপস্থিতি ঘটে তখন এ কথা বলে আক্ষেপ করার কোনো অবকাশ নেই যে ‘গ’ চিন্ত-বিন্দু কায়শ্রিত না হয়েও প্রবাহের মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছে। এই ভাবে স্থির (নিত্য অথবা চিরস্থায়ী) নয়, বরং বিদ্যুৎ চমকের অপেক্ষাও দ্রুতগতিতে, ‘লুকোচুরিতে’ মত্ত চিন্তপ্রবাহের অনাত্মা তত্ত্বকে স্বীকার করেও এক থেকে একাধিক শরীরের মধ্যে (শরীর প্রবাহ) তার গমনকে বৌদ্ধরা সিদ্ধ করে থাকেন।

(অ) নিত্য আত্মা নেই—আত্মাকে যারা নিত্য বলে স্বীকার করেন, তাঁরা এর জন্য সর্বপ্রথম যে যুক্তি উপস্থিত করেন, তা হল, আত্মা ব্যতিরেকে বন্ধ—জন্ম-মৃত্যুর মাঝখানে পড়ে দুঃখ ভোগ করা, এবং মোক্ষ—দুঃখ থেকে অব্যাহতি পেয়ে পরম ‘সুখী’ হয়ে বিচরণ করা—দুটিই অসম্ভব। এ বিষয়ে ধর্মকীর্তি বলেছেন—

‘দুঃখের উৎপত্তির মধ্যে কারণ বন্ধ থাকে, কিন্তু যা নিত্য, তা সবই নিষ্ক্রিয়, সেই কারণে, এমন কারণ কী ভাবে হতে পারে; দুঃখের উৎপত্তি না হওয়ার মধ্যে কারণ, বৌদ্ধ দর্শন-৯

(কর্ম থেকে উৎপন্ন বন্ধন) মোক্ষ (মুক্ত হওয়া), যা নিত্য, তা এরকম (কারণ) কী ভাবে হতে পারে? বস্তুত যাকে অনিত্য (ক্ষণিক) বলা যায় না, সে কোনো বস্তুর কারণ হতে পারে না। নিত্য সেই স্বরূপকে বলা হয়, যা কখনও বিনষ্ট হয় না। এই লজ্জাজনক দৃষ্টিভঙ্গিকে (নিত্যতার সিদ্ধান্ত) ত্যাগ করে অতঃপর আত্মাকেও অনিত্য বলো।' (প্রঃ বাঃ, ২। ২০২-০৫)

(আ) নিত্য আত্মার বিচার (সৎকায় দৃষ্টি) সমস্ত অনিষ্টের মূল—‘আমি সুখী হই বা দুঃখী না হই—এই তৃষ্ণা নিয়ে ব্যক্তির মধ্যে যে ‘আমিত্বের’ ধারণা বৃদ্ধি পায়, তাই সহজ আত্মবাদ বা সত্ত্ব দর্শন। ‘আমি’ ধারণা ছাড়া কেউ আত্মাকে স্নেহ করতে পারে না, আর আত্মার মধ্যে এ ধরনের স্নেহ বিনা কেউ সুখের কামনায় কোনো গর্ভস্থানের দিকে ধাবমান হতে পারে না।’ (প্রমাণবার্তিক, ২। ২০-২২)।

যতক্ষণ আত্মা-সম্বন্ধীয় প্রেম পরিত্যক্ত না হয়, ততক্ষণ ব্যক্তি নিজেকে দুঃখী মনে করতে থাকবে এবং নিশ্চিত হতে পারবে না। যদিও নিজের মুক্তিদাতা কেউ নেই, তবুও ‘আমি’, ‘আমার’ ইত্যাদির মতো ভ্রান্ত ধারণার আরোপকে হঠানোর জন্যও যত্ন করতে হয়।’ (প্রমাণবার্তিক, ২। ১৯১-৯২)

‘সেই ক্ষণিক মন, শরীর প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন আত্মার ধারণা বিপরীত স্বভাবের (বস্তুত স্থিরতা ইত্যাদি) মধ্যে রাগ (স্নেহ) উৎপন্ন হয়।’ (প্রমাণবার্তিক, ২। ১৯৫)

‘আত্মার ধারণা কেবল মোহ, এবং এই মোহই সমস্ত দোষের মূল।’ (প্রমাণবার্তিক, ২। ১৯৬)

‘এই মোহ সৎকায়-দৃষ্টি (নিত্য আত্মার ধারণা) এবং এই মোহ-মূলকই চিত্ত-বিকার। (প্রমাণবার্তিক, ২। ২১৩)

ধর্ম বিশ্বাসী ব্যক্তির জন্যও আত্মবাদ (সৎকায় দৃষ্টি) এক অনিষ্টকর বস্তু, এ কথা বলে ধর্মকীর্তি পুনরায় বলেছেন—

‘যে নিত্য আত্মাকে স্বীকার করে, তার ‘আমিত্বের’ মধ্যে এমন ধরনের স্নেহ (রাগ) সর্বদা বজায় থাকে, যা থেকে সে সুখের তৃষ্ণা করে এবং তৃষ্ণা দোষকে ঢেকে দেয়। (দোষ ঢাকা পড়ে যাওয়ার ফলে সে শুধু গুণ দেখতে পায়, এবং) গুণদর্শী তৃষ্ণার্থ হয়ে ‘আমার সুখ’—এরকম কামনা করে, এবং তার প্রাপ্তির জন্য সাধনাকে (পুনর্জন্ম ইত্যাদি) গ্রহণ করে। এই সৎকায়-দৃষ্টিতে যতক্ষণ পর্যন্ত আত্মার ধারণা বর্তমান আছে, ততক্ষণ সে এই সংসারে (ভবসাগরে) আছে। আত্মা (আমার) যখন আছে তখন অপরের (মন) খেলায় হয়। আপন-পরের ভেদ যখন ব্যক্তির মধ্যে আসে, তখন গ্রহণ করা, ত্যাগ করা (রাগ-দ্বেষ) ইত্যাদি ভাবের আবির্ভাব হয়, এই ‘গ্রহণ করা’, ‘ত্যাগ করা’ ইত্যাদি বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ফলে ঈর্ষ্যা অদি দোষ সৃষ্টি হয়। যে নিয়মে আত্মা স্নেহ করে, সেই নিয়মে আত্মীয় (সুখসাধনসমূহ) থেকে রাগ-রহিত হতে পারে না।’ (প্রমাণবার্তিক, ২। ২১৭-২০)

‘আত্মার ধারণা সর্বদা আপন ব্যক্তিত্বের মধ্যে স্নেহকে দৃঢ় করে। আত্মীয়ের প্রতি যদি স্নেহের বীজ সঞ্চিত থাকে, তাহলে সে দোষগুলিকেও যথাযথ ভাবেই কায়েম রাখবে।’ (প্রমাণবার্তিক, ২। ২৩৫-৩৬)

‘(বস্তুত আত্মা নয় নৈরাশ্র্যই আছে), কিন্তু নৈরাশ্র্যের মধ্যে যখন ভ্রমবশত আত্মস্নেহ এসে গেল, তখন তা থেকে (আত্মস্নেহ যাকে আত্মীয় সুখ ইত্যাদির বিষয় মনে করে) যে পরিমাণ লাভ হয় সেই অনুসারে ক্রিয়াপরায়ণ হয়। (—বড় লাভ না হলে ছোট লাভ হাসিল করতেও ছাড়ে না,) যেমন মন্তকামিনীকে (মন্ত গজগামিনী সুন্দরী) না পেলে কামুক পুরুষ পশুর থেকেও কাম তৃপ্তি গ্রহণ করে।’ (প্রমাণবার্তিক, ২। ২৩৩)

এই ভাবে, নিত্য আত্মা যুক্তির দ্বারা সিদ্ধ হয় না এবং ধর্ম, পরলোক, মুক্তি ইত্যাদির মধ্যেও বাধা সৃষ্টি হয়, যদিও নিত্য আত্মাকে স্বীকার করা হয়।

(গ) ঈশ্বরবাদ খণ্ডন—ঈশ্বরবাদীরা ঈশ্বরকে নিত্য এবং জগতের কর্তা রূপে স্বীকার করেন। ধর্মকীর্তি ঈশ্বরের অস্তিত্বকে খণ্ডন করে বলেছেন—

‘যেমন স্বরূপ থেকে সে (ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টির প্রাক্কালে) কারণ বস্তু, তেমনই (স্বভাব দ্বারা সৃষ্টি করার পূর্বে) তা অকারণও ছিল। (স্বরূপত একরস হওয়ার ফলে উভয়াবস্থাতেই তার মধ্যে ভেদ হতে পারে না, কিন্তু) যখন সে কারণ (স্বীকৃত হয়েছে, সেই সময়) তখন কোনো কারণ এরকম মানা হয়েছে এবং অকারণ মানা হয়নি?

‘(কারণ এবং অকারণ দুই অবস্থাতেই একরসে থাকা ঈশ্বর যখন কারণ হয়; তখন প্রশ্ন ওঠে)—রামের শরীরে অস্ত্র লাগলে ক্ষত হয়, আর ওষুধ লাগলে ক্ষত নিরাময় হতে দেখা যায়; অস্ত্র এবং ওষুধ ক্ষণিক হওয়ার কারণে ক্রিয়ায় সক্ষম; সেজন্যই তাদের পক্ষে উপরোক্ত ঘটনা সম্ভব; কিন্তু যদি (নিত্য অতএব নিষ্ক্রিয় ঈশ্বরকে কারক মানা হয়, তাহলে ক্রিয়া ইত্যাদি) সম্বন্ধ-রহিত খুঁটিতেই কেন বিশ্বের কারণত্ব মেনে নিই না?

‘(যদি বলা হয় ঈশ্বরের সৃষ্টির কারক হওয়ার অবস্থা থেকে অকারক অবস্থার বিশেষত্ব রয়েছে, তাহলে প্রশ্ন হবে—এমন হলে তার স্বরূপের মধ্যে পরিবর্তন ব্যতিরেকে (সে কারক হতে পারে না এবং নিত্য হলে) সে কোনো ক্রিয়া করতে সক্ষম নয়। এবং সেই সঙ্গে যে নিত্য, সে তো আলাদা নয়, সর্বদাই সেখানে মজুদ আছে, অতঃপর তার (সৃষ্টি-রচনা-সম্বন্ধী) সামর্থ্য সম্বন্ধে এই ধারণা করা মুশকিল (সর্বদা তার সেই সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও সে তাকে একবারই প্রদর্শিত করতে পারে দ্বিতীয়বার নয়)।

‘(কারণ সেটাই হয়ে থাকে, যার স্বরূপের মধ্যে কার্যের উৎপাদনের সময় পরিবর্তন ঘটে) ভূমি ইত্যাদি অঙ্কুর সৃষ্টি করার মধ্যে কারণ আপন স্বরূপে পরিবর্তন করে থাকে; কারণ সেই ভূমি ইত্যাদি সংস্কারের ফলে অঙ্কুরের মধ্যে বিশেষত্ব দেখে থাকে। (ঈশ্বর আপন স্বরূপে পরিবর্তন না করে বিনা কারণে সৃষ্টি হতে পারে না, আর স্বরূপ পরিবর্তন করলে সে আর নিত্য থাকতে পারে না)।’ (প্রমাণবার্তিক, ২। ২১-২৫)

ঈশ্বরবাদীরা ঈশ্বরকে সিদ্ধ করার জন্য এক জবরদস্ত যুক্তি হাজির করেন— সন্নিবেশের (বিশেষ আকার প্রকার) বস্তুকে দেখলে কর্তার অনুমান হয়, যেমন সন্নিবেশিত ঘড়িকে দেখলে তার কর্তা কুঙ্ককারের অনুমান হয়। এর উত্তর দিয়ে ধর্মকীর্তি বলেছেন—‘কোনো বস্তু (ঘট) সম্বন্ধে (ব্যক্তির উপস্থিতিতে সন্নিবেশ হওয়া ইত্যাদি) যদি প্রসিদ্ধ হয়, তাহলে তার একই শব্দের (সন্নিবেশ ব্যক্তিবাচক হয়ে তাকে) সমানতা থেকে (কুঙ্ককারের মতো ঈশ্বরকে) অনুমান করা সঠিক নয়, যেমন এক জায়গায় হলুদ

বর্ণের ধোঁয়া দেখে কেউ আগুনের অনুমান করল, অতঃপর যেখানে যা কিছু হলুদ বর্ণের দেখবে সেখানেই আগুনের অনুমান করবে। যদি এ কথা স্বীকার না করা হয়, তাহলে যেহেতু কুস্তকার মাটির কোনো ঘড়া ইত্যাদি তৈরি করেছে অতএব, মাটির মধ্যকার উইপোকার বংশকেও কুস্তকারেরই সৃষ্টি প্রমাণ করতে হবে।' (প্রঃ বাঃ, ২।১২-১৩)

এর আগেই সামগ্রীকারণবাদ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে ধর্মকীর্তি বলেছেন, যেকোনো এক বস্তু কার্যকে উৎপাদন করে না, অনেক বস্তু মিলে অর্থাৎ কারণসামগ্রী কার্য করতে সমর্থ হয়।

(২) ন্যায় বৈশেষিক মত খণ্ডন—বৈশেষিক ও ন্যায় দর্শনে জগৎকে বাইরে থেকে পরিবর্তনশীল মনে হয়। গ্রিক দার্শনিকদের, বিশেষ করে অ্যারিস্টটলকে অনুসরণ করে, বাহ্যিক পরিবর্তনের মধ্যে নিত্য একরস তত্ত্ব—চেতন এবং জড় এই দুই মূল তত্ত্বকে সিদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছে। বৌদ্ধ দর্শন অপবাদ-রহিত ক্ষণিকতার অটল সর্বব্যাপী নিয়মকে স্বীকার করে, কোনো স্থিরতাসাধক সিদ্ধান্তকে স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিল না। সেজন্যই আমরা প্রমাণবার্তিকের মধ্যে ধর্মকীর্তিকে প্রধানত এ ধরনের সিদ্ধান্তের জোরদার বিরোধিতা করতে দেখি। বৈশেষিকগণ স্থিরবাদী সিদ্ধান্ত অনুসারে আপন দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ সমবায়—ছয়টি পদার্থকে স্বীকৃতি দিয়েছেন, এর মধ্যে কর্ম আর বিশেষকে স্বীকার করতে বৌদ্ধদের বিশেষ কোনো আপত্তি ছিল না, কারণ কর্ম অর্থাৎ ক্রিয়া ক্ষণিকবাদেরই সাকার—পরমার্থসৎ-স্বরূপ এবং হেতুসামগ্রী তথা অপোহর (এ বিষয়ে শব্দ প্রমাণ বিষয়ক তর্কের সময় বিস্তারিত আলোচনা হবে।) সিদ্ধান্তকে স্বীকার করার কারণে বিশেষকেও তাঁরা স্বীকার করে নিতেন। অবশিষ্ট দ্রব্য, গুণ, সামান্য এবং সমবায়কে তাঁর কল্পনা নির্ভর ব্যবহারসৎ হিসেবে আংশিক স্বীকার করতেন।

(ক) দ্রব্যগুণ ইত্যাদির খণ্ডন—বৌদ্ধদের পরমার্থসৎ এবং ব্যবহারসৎ-এর পরিভাষা সম্পর্কে আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। সেখানে পরমার্থসতের কষ্টিপাথর হিসাবে তাঁরা অর্থক্রিয়াকে রেখেছেন। বিশ্বে যা কিছু বস্তু সৎ আছে তা অর্থক্রিয়ার দ্বারা ব্যাপ্ত, যা অর্থক্রিয়াকারী নয়, তা বস্তু-সৎ (পরমার্থসৎ) হতে পারে না। বিশ্ব এবং তার 'বস্তুসামগ্রী' সম্বন্ধে এরকম বিচারধারা পোষণ করে তারা বস্তুত 'বস্তু'কেই অস্বীকার করত, কারণ 'বস্তু' থেকে সাধারণ মানুষের মনে স্থির পদার্থের ধারণা আসে; সেজন্য বৌদ্ধ দার্শনিকেরা বস্তুর স্থানে 'ধর্ম' কিংবা 'ভাব' শব্দের অধিক প্রয়োগ করতে চেয়েছেন। 'ধর্ম'কে কোনো বিশ্বাস বা সাম্প্রদায়িক স্থির অর্থে নেওয়া হয়নি, বিচ্ছিন্নপ্রবাহের সেই বিন্দু হিসাবে তাকে নেওয়া হয়েছে, যা ক্ষণে ক্ষণে নষ্ট হয়, আবার উৎপন্ন হয়ে বস্তুর আকারে আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে উপস্থিত হয়। 'ভাব' (হওয়া)-কে তাঁরা এই কারণে পছন্দ করেন যে বস্তু-স্থিতি আমাদের 'আছে' এর সন্ধান না দিয়ে 'ছিল' এর সন্ধান দেয়—বিশ্ব স্থির তত্ত্বের সমূহ নয় যে আমরা 'আছে' শব্দের প্রয়োগ করব। বরং তা সেই ঘটনাবলির সমূহ, যা প্রতিক্ষণ ঘটত হয়ে চলেছে। বৈশেষিকদের দ্রব্য, গুণের কল্পনা ভাবের পশ্চাতে লুক্কায়িত বিচ্ছিন্নপ্রবাহের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে।

বৈশেষিকদের বক্তব্য—দ্রব্য এবং গুণ এই দুই বস্তু (পদার্থ) এমন যার মধ্যে, গুণ সেটি, যে সর্বদা কারও আধারের মধ্যে থাকে, গন্ধকে আমরা সর্বদা পৃথিবীর (তত্ত্ব) আধারের মধ্যে দেখতে পাই, রসকে জলতত্ত্বের আধারের মধ্যে। সেই ভাবে যেখানে যেখানে আমরা দ্রব্য দেখতে পাই, সেখানে সেখানে তার আধেয় গুণও পাওয়া যায়। যেখানে যেখানে পৃথিবীতত্ত্ব পাওয়া যায় সেখানে সেখানে তার আধেয় গুণ গন্ধও পাওয়া যায়। এ ভাবেই গুণের জন্য কোনো আধারের প্রয়োজন হয়, এই ধারণা আমাদের দ্রব্যের সত্তাকে স্বীকার করার জন্য বাধ্য করে। বৌদ্ধদের বক্তব্য—প্রকৃতি এই দ্রব্যগুণের ভেদকে জানে না। আমরা আমাদের বোঝার সুবিধার জন্য আলাদা করে উল্লেখ করি। যেরকম প্রকৃতি দশটি আমের মধ্যে একটিকে প্রথম আর-একটিকে দ্বিতীয়... এ ভাবে ক্রমিক সংখ্যা দিয়ে আমাদের সামনে উপস্থিত করে না, প্রত্যেকটি আম একে অপরের চেয়ে ভিন্ন।—তারা এর বেশি অগ্রসর হয় না। 'ভাব প্রতিক্ষণে বিনষ্ট হয়ে চলেছে, ভাবের প্রবাহকে সেই মতো (প্রতিক্ষণ বিনাশে যুক্ত) উৎপত্তির দ্বারা সিদ্ধ হয়, কারণ সেই উৎপত্তি সর্বদা সহৈতুক (কারণ অথবা পূর্ববর্তী ভাবের উপস্থিতিতে কারণে) হয়। এর মধ্যে আশ্রয় (আধার) আছে এবং শ্রেফ এই অর্থেই একে গ্রহণ করা উচিত যে প্রত্যেক ভাবের উৎপত্তির পূর্বে ভাব-প্রবাহ সঞ্চিত থাকে। একে ভিন্ন অর্থে যেমন, আশ্রয়, আধার, দ্রব্য ইত্যাদির স্বীকার করা যুক্তিযুক্ত নয়।' (প্রমাণবার্তিক, ২। ৬৭)

যেমন জলের আধার রূপে ঘড়াকে স্বীকার করা হয়, তেমনই গন্ধের আধার পৃথিবী তত্ত্ব, এ কথা বলা ভুল। জল ইত্যাদির জন্য আধারের প্রয়োজন হতে পারে, কারণ গতিশীল জলের সামনে ঘড়া এক প্রতিবন্ধ হয়ে দাঁড়ায়। গুণ, সামান্য (জাতি) এবং কর্ম (তো তোমাদের মতে গতিরহিত হয়ে দ্রব্যের অভ্যন্তরে অবস্থান করে, তবে এমন) গতিহীনকে আধার রূপে নিয়ে কোন কাজ হবে? (প্রমাণবার্তিক, ২। ৬৮)

এই ভাবে আধারের কল্পনা ভ্রান্ত প্রমাণিত হওয়ার পর আধেয় গুণ ইত্যাদির পৃথক পদার্থ হওয়ার ধারণাটিও ভ্রান্ত। গুণ সর্বদা দ্রব্যের মধ্যে থাকে অর্থাৎ উভয়ের মধ্যে সমবায় (নিত্য) সম্বন্ধ বর্তমান, আবার দ্রব্যগুণের সমবায়ী (নিত্য সম্বন্ধ রক্ষাকারী) কারণ। এই সমবায় ও সমবায়ী কারণের ধারণাও পূর্ব খণ্ডিত দ্রব্যগুণের কল্পনার উপরে আধারিত হওয়ার কারণে ভ্রান্ত।

(খ) সামান্যের খণ্ডন—কোটি কোটি 'গো' অর্থাৎ গোরু আছে, যখন আমরা তার ভূত, বর্তমান, ভবিষ্যৎকে ব্যক্তিদের উপরে বিচার করি, তখন তা অগুণতি মনে হয়। এই অগুণতি গো-ব্যক্তির মধ্যে একটি বিষয় আমরা সর্বদাই পেয়ে থাকি, তা হলে গোরুত্ব (গোত্ব), যা গো-বিশেষের মৃত্যুর সময়ে নতুন উৎপন্ন 'গো'-এর মধ্যে পাওয়া যায়। অনেক ব্যক্তির মধ্যে প্রাপ্ত ওই একই ধরনের পদার্থ সামান্য বা জাতি যাই হোক না কেন, সে নিত্য—এবং সর্বকালীন। এটাই হল সামান্যকে সিদ্ধ করার জন্য বৈশেষিকদের যুক্তি।

অনুমান প্রকরণে ধর্মকীর্তি বলেছেন যে সামান্য অনুমানের বিষয়, সেই সঙ্গে সামান্য বস্তু বস্তু-সং নয়, বরং কল্পনা নির্ভর। এই ভাবে যে পর্যন্ত ব্যবহারের সম্বন্ধ

আছে, সেই পর্যন্ত মানতে বৌদ্ধরাও অস্বীকার করেন না। সেজন্যই ধর্মকীর্তি বলেছেন—

‘বাহ্য অর্থের (পদার্থ) অপেক্ষা বিনা যেমন অর্থ, পদার্থের মধ্যে বাচকমান বক্তা যে শব্দকে নিয়ত করে, সে শব্দের মতোই বাচক হয়ে থাকে।’

‘(এক স্ত্রীর জন্যও সংস্কৃততে বহুবচন) দারা, (হয় নগরের বহুবচন অর্থের জন্য সংস্কৃতে এক বচন) ষণ্মগরী (হয় নগরী) বলা হয়। এমন শব্দরূপে একবচন এবং বহুবচন ব্যবহারের কী কারণ? অথবা (সামান্য অনেক ব্যক্তির মধ্যে একজন হয়, আকাশ তো একটিই, অতঃপর আকাশের স্বভাব আকাশত্ব, একে সামান্য কেন মানা হয়?) (প্রমাণবার্তিক, ১। ৬৮-৬৯)

এর অর্থ এই যে, শব্দের প্রয়োগে বস্তুর তোয়াক্কা না করে বক্তা বহু জায়গায় স্বতন্ত্রতা দেখায়, গোত্ব ইত্যাদি তার এ ধরনের স্বতন্ত্র কল্পনা, যার উপরে বস্তু-স্থিতির বিচার করা ভুল হবে।

‘সর্বদা একে অন্যের থেকে ভিন্নতা বজায় রক্ষাকারী ভাবসমূহকে (বস্তুসমূহ) নিয়ে যে এক অর্থ গোত্ব প্রকাশকারী (বুদ্ধি, জ্ঞান সৃষ্টি হয়) এমন বস্তু দ্বারা সেই ভাবের বাস্তবিক রূপ ঢাকা পড়ে গিয়ে সংবৃতি হয়ে যায়, সেই জন্যই এ ধরনের জ্ঞানকে সংবৃতি (বাস্তবিকতাকে অবরোধকারী) বলা হয়।

‘এ ধরনের সংবৃতি দ্বারা নানা রকমারিত্ব ঢাকা পড়ে যায়, সেই জন্য ভাব স্বয়ং ভিন্নতা বজায় রেখেও কোনো কল্পিত রূপের সঙ্গেও অভিন্নতা রাখে বলে প্রতীয়মান হয়।

‘সেই সংবৃতি বা কল্পনাকারী বুদ্ধির অভিপ্রায়কে নিয়ে সামান্যকে সং বলা যায়, কারণ পরমার্থের মধ্যে সে অ-সং এবং সেই সংবৃতি বুদ্ধির দ্বারা সে কল্পিত।’ (প্রমাণবার্তিক, ১। ৭০-৭২)

গোত্ব এক বস্তু সং, যা সমস্ত গো-ব্যক্তির মধ্যেই আছে, এই ধারণা ভুল, কারণ—

‘ব্যক্তিগণ (ভিন্ন ভিন্ন গো একে অপরের মধ্যে) অনুগত থাকে না এবং সেই ভিন্ন গো-ব্যক্তির মধ্যে কেউ অনুগত হওয়ার যোগ্য (পদার্থ) দেখা যায় না। (যা দেখা যাচ্ছে, তারা ভিন্ন ভিন্ন গো-ব্যক্তি)। জ্ঞান থেকে অভিন্ন (সেই সামান্য) কী ভাবে এক থেকে অন্য পদার্থকে প্রাপ্ত করতে পারে?’

‘এই জন্যই অনেক পদার্থের মধ্যে একরূপতার (সামান্য) গ্রহণ ভ্রান্ত কল্পনা, এই মিথ্যা কল্পনার মূল ব্যক্তিদের মধ্যে পারস্পরিক ভেদ বর্তমান, যার ফলে গোত্ব ইত্যাদি সংজ্ঞা বা শব্দের প্রয়োগ হয়ে থাকে।’ (প্রমাণবার্তিক, ১। ৭৩-৭৪)

‘যদি সংজ্ঞার শব্দ দ্বারা পদার্থের ভেদ জানা যায় তাহলে সেটুকুই তো শব্দের প্রয়োজন, অতঃপর সামান্য কিংবা কোনো দ্বিতীয় বস্তুর কল্পনা থেকে তোমার কি নেবার আছে?’ (প্রমাণবার্তিক, ১। ৯৯)

বস্তুত গোত্ব ইত্যাদি সামান্য বাচক পণ্ডিতগণ ব্যবহারিক সুবিধার জন্য উদ্ভাবন করেছেন।

‘এক ধরনের কার্যকরী ভাবের (বস্তু) মধ্যে তার কায়ার প্রকাশের জন্য ভেদকারী সংজ্ঞার প্রয়োজন হয়, যেমন দুধ দেওয়া অথবা শ্রম দেওয়ার মতো ক্রিয়াকারী ‘গো’-এর মধ্যে তার কায়ার প্রকাশের জন্য ভেদকারী সংজ্ঞায়; গো-ব্যক্তি অগণিত হওয়ার ফলে প্রত্যেক ব্যক্তির আলাদা আলাদা সংজ্ঞা রাখলে নাম অনেক বড়ো হয়ে যায়; এটা হওয়াও সম্ভব ছিল না, এবং সে প্রচেষ্টাও বৃথা হত, সেজন্যই ব্যবহারিক কুশল বুদ্ধ সেই গো-রূপ কার্য থেকে পৃথক করার বিচারে একটি শব্দ (গো নাম) প্রযুক্ত করেছেন।’ (প্রমাণবার্তিক, ১৩৯-৪০)।

‘(একটি গোতে স্থিত সামান্য সেই ব্যক্তির মৃত্যুর পর অন্য দ্বিতীয় গো-এর উৎপন্ন হওয়ার পর, একে অপরের মধ্যে যায় না, না তার মধ্যে পূর্বে ছিল, কারণ তা শুধুমাত্র ব্যক্তির মধ্যেই থাকে) এবং ব্যক্তির উৎপত্তির পিছনে তো অবশ্যই আছে, কারণ সামান্য বিনা ব্যক্তি হতেই পারে না; যদি সামান্যকে অংশী বলে মানা হয়, যার মধ্যে তার এক অংশ—প্রথম ব্যক্তির পূর্বে এবং দ্বিতীয় পরবর্তীকালে উৎপন্ন হওয়া ব্যক্তির সঙ্গে সম্বন্ধিত হয়। আর যদি অংশ রহিত মনে করি, তাহলে এ কথা বলা যায় না যে প্রথমের উৎপন্ন হয়ে নয়, হওয়া আধারকে ত্যাগ করে, কারণ এরকম মানলে দেশকালের অন্তরকে নিত্য সামান্য যখন অতিক্রম করবে, সেই সময় তাকে ব্যক্তির থেকে পৃথকই স্বীকার করতে হবে, এ ভাবে বেচারী সামান্যবাদীদের জন্য অসুবিধার শেষ নেই।

‘এরকম সামান্যর মধ্যে বাস্তবিকতার (রূপ) অবভাস অথবা সামান্যের রূপে অর্থের (পদার্থ, গো, ব্যক্তি) গ্রহণ ভ্রান্তি মাত্র, আর এই ভ্রান্তি চিরকাল ধরে দেখতে থাকার অভ্যাস থেকে সৃষ্টি হয়েছে।’

‘এবং পদার্থের (বিশেষ বা ব্যক্তি) এই যে আপন থেকে ভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে যে সমানতা (সামান্য) বর্তমান, আর যে সামান্যর বিষয় (শব্দার্থ-সম্বন্ধ সংকেতবাহী) শব্দ আছে, তার কোনো স্ব-রূপ (বাস্তবিক রূপ) নেই, কারণ এগুলি শব্দ ব্যবহারের সুবিধার জন্য কল্পনা করে নেওয়া হয়েছে।’ (প্রমাণবার্তিক, ২। ৩১-৩২)

(গ) অবয়ব খণ্ডন—আমরা আগেই আলোচনা করেছি যে অক্ষপাদ কী ভাবে অবয়বের (অঙ্গ) মধ্যে কিন্তু তা থেকে পৃথক এক স্বতন্ত্র পদার্থ—অবয়বীকে (অঙ্গী) স্বীকার করেছেন। ধর্মকীর্তি সামান্যের মতো অবয়বের ব্যবহার (সংবৃত্তি) সং মানবার জন্য প্রস্তুত আছেন, কিন্তু অবয়বের পরে অবয়বী এক পরমার্থ সং এ কথা তিনি স্বীকার করেননি। ‘বুদ্ধি (জ্ঞান) যে আকারের হয়ে থাকে, তাকেই সেই বুদ্ধির গ্রাহ্য বলে স্বীকার করা হয়।’ (প্রমাণবার্তিক, ৩। ২২৪), আমরা বুদ্ধি (জ্ঞান) দ্বারা অবয়বের স্বরূপকেই দেখি, এবং তা থেকে আমরা অবয়বীয় সন্ধান পাই না, ভিন্ন ভিন্ন অবয়বের প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে একত্রিত করে কল্পনার সাহায্যে আমরা অবয়বীর এক মানসিক সৃজন করি, প্রকৃতপক্ষে যা কল্পনা, বাস্তবিক বস্তু নয়। যদি বলা হয় যে অবয়বীরও গ্রহণ হয় তাহলে প্রশ্ন ওঠে, যে—

‘মাত্র একবারই আপন অবয়বের সঙ্গে অবয়বীর গ্রহণ কী ভাবে হতে পারে? গলা, পিঠ, শিং ইত্যাদি অবয়বকে না দেখলে গো (অবয়বী)-কে দেখা যায় না।’ (প্রমাণবার্তিক, ৩। ২২৫)

যেমন কোনো বাক্য পড়ার সময় প্রথম থেকে এক একটি অক্ষর পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাক্যের অর্থ আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে না, বরং একটি একটি করে অক্ষর আমাদের সম্মুখ দিয়ে চলে যেতে থাকে এবং সংকেতানুসারে বিশেষ ছাপ আমাদের মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে ছেড়ে যায়, সেই সমস্ত ছাপকে মিলিয়েই মন কল্পনার দ্বারা সমগ্র বাক্যের অর্থ প্রস্তুত করে। আমরাও ঠিক সেই ভাবে গুরু শিং, গলকম্বল, লেজ ইত্যাদিকে বারবার দেখার ফলে আমাদের মধ্যে যে ছাপ পড়ে, সেই অনুসারে গো-অবয়বের কল্পনা করে থাকি, কিন্তু যে ভাবে সামান্য ব্যক্তি থেকে ভিন্ন কোনো বস্তু-সং নেই, সেই মতো অবয়বও বস্তু থেকে ভিন্ন কোনো বস্তু-সং নয়। যদি অবয়বী বস্তুতপক্ষে এক স্বতন্ত্র বাস্তবিক পদার্থ হত, তাহলে—

‘হাত ইত্যাদির মধ্যে কোনো একটির কম্পনে সারা শরীর কম্পন হত, কারণ এক অখণ্ড অবয়বীর মধ্যে কম্পন-ক্রিয়া এবং তার বিরোধী অকম্পন উভয়ে একসঙ্গে অবস্থান করতে পারে না; এরকম না হওয়ার কারণে কম্পন সহ এবং কম্পন-রহিত অবয়বী পৃথক বলে প্রমাণিত হবে।’ (প্রমাণবার্তিক, ৩। ২৪৮)

‘অবয়বের সংযোগ অবয়বী পৃথক বস্তুরূপে সৃষ্ট হয়, এরকম স্বীকার করলে অবয়বের সংযোগে সঙ্গে অবয়বী মিলিত হলে অবয়ব + অবয়ব + অবয়ব=ভার, যতটা হয়, অবয়ব + অবয়ব + অবয়ব + অবয়বীর=ভার, তার তুলনায় অনেক বেশি হওয়া উচিত। কারণ যদি অবয়বের ভার আর সেই অনুসারে ওজন করলে ওজনের তুল্যদণ্ড নিচে নামবে, তাহলে অবয়বের সঙ্গে অবয়বী মিলে গেলে তুল্যদণ্ডের আরও নিচে যাওয়া উচিত।’ (প্রমাণবার্তিক, ৪। ১৫৪)

‘সূক্ষ্ম অবয়বকে ত্রমশ বৃদ্ধি করে এক বৃহৎ অবয়বে যুক্ত ধূলিরাশির মধ্যে এক সময়ে পৃথক পৃথক অবয়ব এবং তার সঙ্গে যুক্ত রাশির ভারের মধ্যে ভেদ হওয়া উচিত, আর এই (গৌরবের) ভেদের কারণ স্বর্ণ কিংবা রৌপ্যের ছোট ছোট খণ্ডকে আলাদা আলাদা ওজন করে কিংবা তাদের গলিয়ে একটি পিণ্ডে পরিণত করে ওজন করলে, সোনার মাষক, (মাসা, রতি) ইত্যাদিতে ওজনের সংখ্যার মধ্যে সমান না হওয়া উচিত।’ (প্রমাণবার্তিক, ৪। ১৫৭-৫৮)

এক মাসা পরিমাণ সোনা পৃথক ওজন করলে এক মাসাই পাওয়া যাবে, কিন্তু যখন ৯৬ মাসা সোনা গলিয়ে এক ডেলা তৈরি করা হয়, তখন তার মধ্যে ৯৬ মাসার ৯৬টি খণ্ডের অতিরিক্ত তা থেকে সৃষ্ট অবয়বীও সেখানে এসে জমা হয়েছে, অতএব এখন ওজন ৯৬ মাসা থেকে বেশি হওয়া উচিত।

(সংখ্যা ইত্যাদির খণ্ডন)—বৈশেষিকেরা সংখ্যা, সংযোগ, কর্ম, বিভাগ ইত্যাদি গুণকে বস্তু-সত্তার হিসাবে মেনেছেন, যাকে ধর্মকীর্তি ব্যবহার-সং (সংবৃতি) পর্যন্তই শুধু মানতে প্রস্তুত, এবং সেজন্য বলেছেন—

‘সংখ্যা, সংযোগ, কর্ম আদির স্বরূপ তাকে আশ্রয়দানকারী দ্রব্যের স্বরূপ থেকে কিংবা ভেদের সঙ্গে অবস্থিত বললে বুদ্ধিতে (জ্ঞান) প্রকাশিত হয় না। এবং প্রকাশিত না হওয়া সত্ত্বেও তাকে বস্তু-সং বলা ভুল।

‘শব্দের জ্ঞানের মধ্যে কল্পিত অর্থে বস্তুর পারস্পরিক ভেদকে অনুসরণকারী বিকল্প দ্বারা সংখ্যা আদির প্রয়োগ সেভাবেই করা হয়। যেমন গুণ ইত্যাদির মধ্যে (পঞ্জিক্তে ‘এক বড়ো জাতি’ এখানে একও একটি গুণ আবার তার চেয়েও বড়োও একটি গুণ, কিন্তু গুণের মধ্যে গুণ না হতে পারার কারণে এক সংখ্যার সঙ্গে বড়ো পরিমাণের প্রয়োগ হওয়া উচিত নয়) অথবা নষ্ট যা এখনও সৃষ্টি হয়নি (এক, দুই, অনেকের মৃত্যু ঘটেছে) কিংবা ‘সৃষ্টি হবে’ বলা। নিশ্চয়ই, যা এক, দুই সংখ্যা যা মৃত অথবা সৃষ্ট না হওয়ার মতো অস্তিত্বশূন্য আধারের আধেয়—গুণ—এটা অবশ্যই কল্পিত, বাস্তবিক হতেই পারে না।’ (প্রমাণবার্তিক, ২। ৯২)

(৩) সাংখ্য দর্শনের খণ্ডন— সাংখ্য দর্শন চেতন এবং জড় এই দুই প্রকার তত্ত্বকে স্বীকার করে, যেখানে চেতন—পুরুষ—নিষ্ক্রিয় সাক্ষী মাত্র, তবে তার সম্পর্কের দ্বারা জড়তত্ত্ব—প্রধান—সমস্ত জগৎকে আপন স্বরূপ পরিবর্তনের দ্বারা সৃষ্টি করে। সাংখ্য প্রধানের মধ্যে ভিন্নতা স্বীকার করে না, সেই সঙ্গে সংকার্যবাদ—অর্থাৎ কার্যের মধ্যে পূর্ণ রূপে কারণের সঞ্চিত থাকাকে স্বীকার করে। এ বিষয়ে ধর্মকীর্তি বলেছেন—

‘যদি অনেক (বীজ, জল, মাটি ইত্যাদি) এক প্রধান (প্রকৃতি) স্বরূপ হয়েও এক কার্যকে (অঙ্কুর) করে থাকে, তাহলে সেই স্বরূপ (প্রধান) এক বীজের মধ্যে সে ভাবেই থাকে, যেমন সে অন্য জায়গাতে থাকে; এজন্যই তার অন্যান্য সহকারী (কারণ জল, মৃত্তিকা ইত্যাদি) বাহ্য্য মাত্র।

‘(জল, মাটি ইত্যাদি সহায়ক কারণ না থাকা অবস্থায় বীজ অবস্থান করলে) সেটা তো (প্রধান মৌলিক বস্তুতত্ত্ব) অভিন্ন হয়ে থাকে এবং (সে জল, মৃত্তিকা ইত্যাদিতে পরিণত হওয়ার পরও তার পূর্বের আপন) স্বরূপকে ত্যাগ করে না, (কারণ সে নিত্য; এবং) বিশেষ (জল, মৃত্তিকা আদি) বিনাশশীল, (কিন্তু আমরা দেখি যে) এক (সহায়ক জল অথবা মাটি) না হওয়ার কারণেও কার্য (অঙ্কুর) হয় না, এর দ্বারা এটাই জানা যায় যে সেই (অঙ্কুর প্রধান থেকে নয়) বিশেষ থেকে (জল, মৃত্তিকা আদি) উৎপন্ন হয়।

‘পরমার্থের ভাব (পদার্থ) আমরা তাকেই বলতে পারি যে অর্থক্রিয়া করতে পারে। (এরকম অর্থক্রিয়া করতে সমর্থ—মৃত্তিকা, জল ইত্যাদি বিশেষ) আর তারা (পরস্পর ভিন্ন হওয়ার ফলে কার্য = অঙ্কুরের মধ্যে) একরূপ হয় না, আর যাকে তুমি একরূপ বলে থাকো, সেই প্রধান থেকে (অঙ্কুর) কার্য সম্ভব নয়; (কারণ সত্যকার্যবাদের মতানুসারে সে যেমন আপন স্বরূপে বর্তমান, তেমনই মৃত্তিকা ইত্যাদিতে পরিণত হওয়ার পরও থাকে।)

‘(আর প্রধানকে যেকোনো অবস্থায় একরূপ মানলে, বীজ, মৃত্তিকা, জল ইত্যাদি সবই প্রধান-ময় এবং একরূপ হয়। অতঃপর একটি বীজ থাকার ফলে এবং জল ইত্যাদি অনুপস্থিত থাকলেও অঙ্কুরের উৎপত্তিতে কোনো বাধা থাকা উচিত নয়; কিন্তু আমরা এই স্বভাবই দেখতে পাই যে, সেই কারণস্বরূপ থেকে (বীজ, জল, মৃত্তিকা ইত্যাদি, পরস্পর) ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও কোনো (বীজ, মৃত্তিকা ইত্যাদি অঙ্কুরের) কারণ থাকে, অন্য কিছু (অগ্নি, সুবর্ণ ইত্যাদি) নয়; যদি (জল, বীজ, অগ্নি, মৃত্তিকা ইত্যাদি বিশেষের)

অভেদ থাকত, তাহলে অগ্নি থেকে অঙ্কুরের নাশ এবং বীজ ইত্যাদির কারণে উৎপত্তি উভয় প্রক্রিয়া প্রায় একই সঙ্গে হত।’ (প্রমাণবার্তিক, ১। ১৬৬-৭০)।

(যে অর্থক্রিয়া করতে সমর্থ)—তাকেই কার্য এবং কারণ বলা হয়। সে স্বলক্ষণ (বস্তু-সং) এবং তার ত্যাগ ও প্রাপ্তির জন্যই ব্যক্তির (নানা কাজের মধ্যে) প্রবৃত্তি জন্মে। (অর্থক্রিয়াকারী = অর্থক্রিয়া-সমর্থ-কার্যের উৎপাদনে সমর্থ, ক্রিয়া উৎপাদনে সমর্থ, সাধক ক্রিয়াতে সমর্থ, সফল ক্রিয়া করতে সমর্থ, ক্রিয়া যোগ্য, ক্রিয়া সম্পাদনকারী ইত্যাদি এর অর্থ)।

‘যেমন (সাংখ্যসম্মত মূল ভৌতিক তত্ত্ব, প্রধানের সমস্ত বস্তুবাদী তত্ত্ব—মৃত্তিকা, বীজ, জল, অগ্নির মধ্যে) অভিন্নতা এক সমান হওয়া সত্ত্বেও সমগ্র (বীজ, অগ্নি জল...প্রধানময় তত্ত্ব) সমস্ত (কার্য—অঙ্কুর, ঘড়া ইত্যাদি) করার পক্ষে উপযুক্ত সাধন নয়, এমনিতেই পূর্ব পূর্ব কারণ (ক্ষণিক পরমাণু ও ভৌতিক তত্ত্বের) সমস্ত উত্তর-উত্তর কার্যের (মৃত্তিকা, বীজ, জল ইত্যাদি) মধ্যে ভিন্নত এক সমান হওয়া সত্ত্বেও সমস্ত কারণ সমস্ত কার্যকে সম্পন্ন করার সাধন হয় না।

‘(শুধু এই নয়, সৎকার্যবাদের বিরুদ্ধ কারণ থেকে কার্যকে) ভিন্ন স্বীকার করলে (সবই নয়) কোনো কোনো বস্তু আপন বৈশিষ্ট্যের (ধর্মের) কারণে কোনো একটি কার্যের কারণ হতে পারে। কিন্তু সৎকার্যবাদের নিয়মে কারণ থেকে কার্যকে অভিন্ন মানলে সমস্ত বস্তুই অভিন্ন, অতঃপর তা থেকে একটির কোনো ক্রিয়া (কার্য) করতে পারা আর কোথাও তা না পারা—পরস্পর বিরোধী তত্ত্ব।’ (প্রমাণবার্তিক, ১। ১৭৫-৭৭)।

এই ভাবে সাংখ্যের সৎকার্যবাদ মূলত বিশ্ব এবং বিশ্বের বস্তুর কারণ থেকে কার্য অবস্থার মধ্যে কোনো ভেদ স্বীকার করে না, (প্রধান = জল, প্রধান = আগুন, প্রধান = চিনি, প্রধান = মরিচ)—ধারণা ভ্রান্ত; বিপরীতে বৌদ্ধদের অসৎকার্যবাদই সঠিক, যা অনুসারে, কারণ এক নয়, অনেক এবং প্রতিটি কার্য তার কারণ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু, যদিও প্রতিটি নতুন সৃষ্টি হবে এমন কার্য তার কারণের সঙ্গে সাদৃশ্য রাখে, যা থেকে ‘ওটিই সেটি’ এরকম ভ্রম হয়ে থাকে।

(৪) মীমাংসা মত খণ্ডন—মীমাংসার সিদ্ধান্ত বিষয়ে আমরা আগেই কিছুটা আলোচনা করেছি। মীমাংসার বক্তব্য হচ্ছে, প্রত্যক্ষ, অনুমান ইত্যাদি প্রমাণ উপস্থিত থেকেও সামনের পদার্থটি বস্তুত কী, এ কথা পরিষ্কার করে বোঝাতে পারে না, এবং পরলোক, স্বর্গ, নরক, আত্মা ইত্যাদি যে সমস্ত পদার্থ, ইন্দ্রিয়-অগোচর, তার সম্বন্ধে ধারণা গড়ে দিতে তো একেবারেই অপারগ; সেজন্যই তাদের সর্বাধিক প্রয়াস শব্দপ্রমাণ—বেদের উপরে বর্তমান, যাকে তাঁরা অ-পৌরুষেয় অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি (মানুষ, দেবতা, ঈশ্বর) দ্বারা সৃষ্ট নয় অর্থাৎ তাকে অকৃত সনাতন বলে বিশ্বাস করেন। বৌদ্ধ প্রত্যক্ষ তথা অংশত প্রত্যক্ষ অর্থাৎ অনুমান ছাড়া তৃতীয় কোনো প্রমাণকে স্বীকার করে না, এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণের কষ্টিপাথরে ঘষলে বেদ তার হিংসাময় যজ্ঞ—কর্মকাণ্ডই শুধুমাত্র নয়, অনেক কল্পকথা আর পুরোহিতদের দক্ষিণার লোভে বানানোর কাহিনীকেই মিথ্যা প্রমাণ করবে; এই অবস্থায় সমস্ত ধর্মানুযায়ীর মতোই বৈদিক পুরোহিতদেরও মীমাংসার মতো শাস্ত্রের রচনা করে শব্দপ্রমাণকেই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ করার চেষ্টা করাটা

অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল। বুদ্ধ থেকে শুরু করে নাগার্জুন পর্যন্ত ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের শক্তিশালী হাতিয়ার বেদের কর্মকাণ্ড এবং জ্ঞানকাণ্ডের উপরে প্রচণ্ড আঘাত হেনেছিলেন। কিছু যুক্তির অবতারণা করে বেদের জ্ঞানকাণ্ডকে বাঁচাবার চেষ্টা খানিকটা করেছিলেন অক্ষপাদ এবং তাঁর ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন, কিন্তু দিঙনাগ তাঁর তীব্র কঠোর তর্কিক শব্দের প্রয়োগে সেই চেষ্টাকে অনেক পরিমাণে ম্রিয়মাণ করেছেন। অতঃপর বেদ রক্ষার চেষ্টায় এগিয়ে আসেন পাণ্ডপতাচার্য, উদ্যোতকর, ভরদ্বাজ (৫০০ খ্রিঃ) কিন্তু ধর্মকীর্তি উদ্যোতকরের বক্তব্যকে এমন শোচনীয় ভাবে খণ্ডন করেন যে পরবর্তী সময়ে বাচস্পতি মিশ্রকে 'উদ্যোতকরের বৃদ্ধা গাভিকে উদ্ধারের' জন্য কোমর বেঁধে নামতে হয়েছিল।

কিন্তু যুক্তিবাদীদের (তর্কিক) সহায়তায় বৈদিক জ্ঞান এবং কর্মকাণ্ডের ঠিকাদারদের কাজ চলার কথা নয়, সেজন্য বাদরায়ণকে 'জ্ঞানকাণ্ড' (ব্রহ্মবাদ) এবং জৈমিনিকে 'কর্মকাণ্ড' সম্বন্ধে লেখনী ধরতে হয়। তাঁর ভাষ্যকার শবর অসঙ্গের বিজ্ঞানবাদের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। দিঙনাগ অক্ষপাদ ও বাৎস্যায়নের মতোই শবর এবং জৈমিনির উপরে কঠোর আঘাত হেনেছিলেন, যার পর নৈয়ায়িক উদ্যোতকরের মতো মীমাংসক কুমারিল ভট্ট আসরে নামেন।

ধর্মকীর্তি যে ভাবে উদ্যোতকরকে ছিন্নভিন্ন করেছেন ঠিক সেই ভাবেই কুমারিল ভট্টকেও উত্তর দিয়েছেন। মীমাংসকেরা বেদ-প্রমাণ ছাড়াও প্রত্যভিজ্ঞাকেও এক জোরদার প্রমাণ বলে বিশ্বাস করেন, আমরা এই দুটি বিষয়কেই ধর্মকীর্তির বিচার নিয়ে আলোচনা করব।

(ক) প্রত্যভিজ্ঞা-খণ্ডন—পদার্থকে (রাম) সম্মুখে দেখে 'এই সেই রাম' এরকম প্রত্যভিজ্ঞা (প্রামাণিক স্মৃতি) স্পষ্ট মনে হওয়ার মতো (স্পষ্টাবভাস) প্রত্যক্ষ প্রমাণ—মীমাংসকদের এটাই প্রত্যভিজ্ঞা। বৌদ্ধরা এই প্রত্যভিজ্ঞাকে 'এই সেই'-এর কল্পনায় আশ্রিত বিধায় তাকে প্রত্যক্ষ বলে স্বীকার করেন না, আর 'স্পষ্ট মনে হওয়া' সম্বন্ধে ধর্মকীর্তি বলেছেন—

‘(কর্তন করার পর আবার উৎপন্ন) কেশসমূহ (বাজিকরের ক্রমাগত বের করা) গোলক এবং ক্ষণে ক্ষণে নিভে যাওয়া তিমিত) প্রদীপের মধ্যেও 'এই সেই' এরকম স্পষ্ট ভাসিত হয়; (কিন্তু এ থেকে কেউ যদি বলে কেশ—গোলক—প্রদীপ সেই প্রথমটিই, তা কি সঠিক হবে?)

‘যখন ভেদ প্রত্যক্ষত জ্ঞাত, তখনও গুরুত্ব (এক মনে হওয়ার ভ্রান্তি যুক্ত অভেদ) জ্ঞান কী ভাবে প্রত্যক্ষ হওয়ার দাবি করতে পারে? এই জন্যই প্রত্যভিজ্ঞার জ্ঞান থেকে (কেশ ইত্যাদি) একতার নিশ্চয় করা সঠিক নয়।’ (প্রমাণবার্তিক, ৩। ৫০৩-০৫)।

(খ) শব্দপ্রমাণ-খণ্ডন—যথার্থ জ্ঞানকে প্রমাণ বলা হয়, শব্দপ্রমাণকে যারা স্বীকার করেছেন যেমন, কপিল, কণাদ, অক্ষপাদ প্রত্যক্ষ অনুমানের অতিরিক্ত যথার্থ বক্তা (আপ্ত) পুরুষের বচনকে (শব্দ) প্রমাণ স্বীকার করেন। মীমাংসক 'কোন পুরুষ যথার্থ বক্তা' এটা জানা অসম্ভব মনে নিয়ে বলেছেন—

(অ) অপৌরুষেয়তা নিরর্থক—‘এই পুরুষ এমন যথার্থ বক্তা কিংবা নন, এই ধরনের নিশ্চয়াত্মক প্রমাণ দুর্লভ হলে কোনো অন্য পুরুষের দোষযুক্ত কিংবা দোষমুক্ত (সত্য, যথার্থ বক্তা) হওয়াকে জানা অত্যন্ত কঠিন।’ (প্রমাণবার্তিক, ১। ২২২)

পুনরায়—

‘(কোনো) বচনের মিথ্যা হওয়ার হেতু (অজ্ঞান, রাগ, দ্বেষ ইত্যাদি) দোষ পুরুষের মধ্যে থাকতে পারে (এজন্যই পৌরুষের বচন মিথ্যা হয় এবং) অ-পৌরুষেয় সত্যার্থ...!’ (প্রমাণবার্তিক, ১। ২২৭)

এর উত্তরে ধর্মকীর্তি বলেছেন—

‘(কোনো বচনের সত্য হওয়ার হেতু (জ্ঞান, অ-রাগ, অ-দ্বেষ আদি ইত্যাদি) গুণ পুরুষের মধ্যে থাকে। এই জন্যই যে বচন পুরুষের নয় তা কী ভাবে সত্য হতে পারে, আর যা) পৌরুষেয় তাই কেবল সত্যার্থ হতে পারে...।’ (প্রমাণবার্তিক, ১। ২২৭-২৮)

‘শব্দের সঙ্গেই তার অর্থবোধক সাধন বর্তমান থাকে, (গো শব্দের অর্থ, শিং-লেজ-গলকম্বল-কুঁজ ইত্যাদি) শব্দসংকেত পুরুষের আশ্রয়ে থাকে অতএব সে অবশ্যই পৌরুষেয়। এই সংকেত পৌরুষেয় হওয়ার ফলে বচন অ-পৌরুষেয় হওয়া সত্ত্বেও তার মিথ্যা দোষযুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

‘যদি (বলা হয় শব্দ এবং অর্থের) সম্বন্ধ অ-পৌরুষেয়, তাহলে (আগুন এবং তার উত্তাপের সম্বন্ধের মতো তার স্বাভাবিক সংকেত থেকে) অজ্ঞান পুরুষেরও সমগ্র বেদার্থের জ্ঞান হওয়া উচিত। যদি পৌরুষেয় সংকেতের সাহায্যে সেই সম্বন্ধ প্রকট হয়, তাহলে সংকেত ব্যতিরেকে অন্য কোনো কল্পনা সম্বন্ধকে ব্যবস্থাপিত করতে পারে না।

‘যদি (বস্তুত) বচনের এক অর্থের মধ্যে নিয়ত থাকা প্রকৃতি-সিদ্ধ হত, তাহলে একটি বচনের একটি ছেড়ে অন্য অর্থে প্রযুক্ত হত না।

‘যদি (বলা হয়—একটি বচনের) অনেক অর্থ (পদার্থ) দ্বারা বাচ্য-বাচক সম্বন্ধ স্বাভাবিক, তাহলে একই বচনের বিরুদ্ধে অর্থের সূচনা হবে, এবং অতঃপর ‘অগ্নিষ্টোম যাগ স্বর্গের সাধন’ এই বচনের অর্থ ‘অগ্নিষ্টোম যাগ নরকের সাধন’ও হতে পারে। (প্রমাণবার্তিক, ১। ২২৭-৩১)

‘যে ভাবেই হোক বেদকে পুরুষ রচিত নয় বলে মানলেও রক্ষা পাবার উপায় নেই কারণ ‘(শব্দার্থের সম্বন্ধকে) সংকেত দ্বারা ন-সংকার্য (না প্রকট হওয়া মানলে সমস্ত বচনই) সম্পূর্ণ নিরর্থক প্রমাণিত হবে; (কারণ শব্দার্থের সংকেতকে সকলে গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ হিসাবেই জানেন, এবং একে অস্বীকার করা যায় না। যদি পুরুষ দ্বারা সংস্কার হওয়াকে স্বীকার করা হয়, তাহলে তা ঠিক গজম্মানের মতো হবে (—বেদ বচন এবং তার শব্দার্থ সম্বন্ধকে পৌরুষেয় স্বীকার করা হল না, কিন্তু শব্দার্থ সম্বন্ধের সংকেতকে পুরুষ দ্বারাই সংকার্য স্বীকার করে তারপর বচনের সঙ্গে মিলসূচক জ্ঞানের সত্য-মিথ্যা হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহের সৃষ্টি করে দিয়েছে)।’ (প্রমাণবার্তিক, ১। ২৩৩)

এবং বস্তুত বেদকে জৈমিনি যে ভাবে অপৌরুষেয় সিদ্ধ করতে চেয়েছেন তা সম্পূর্ণ ভাবে ভ্রান্ত।

‘যেহেতু বেদ বচনের কর্তাকে (পুরুষ) স্বরণে আনা যায় না, অতএব তা অপৌরুষেয়—এরকম বলা ধৃষ্টোক্তি। জগতে ছেয়ে থাকা জড়তার এই অন্ধকারকে ধিক্কার।’ (প্রমাণবার্তিক, ১। ২৪২-৪৩)

অপৌরুষেয়তা সিদ্ধ করতে গিয়ে কেউ বলেন যে—‘যেমন সে (আগের শিক্ষার্থী অন্যের (পুরুষ—আপন গুরু থেকে) কাছ থেকে না শুনে এই বর্ণ (অক্ষর) এবং পদের ক্রমভেদকে ব্যাখ্যা করতে পারে না, তেমনই কোনো অন্য পুরুষ গুরু ও (আপন গুরু, সেও আবার তার গুরু থেকে না শুনে কিছু বলতে পারে না; আর এ ধরনের গুরু পরম্পরার অন্ত না হওয়ার ফলেই বেদ অনাদি, অপৌরুষেয় প্রমাণিত হয়।’) (প্রমাণবার্তিক, ১। ২৪২-৪৩)

কিন্তু এ কথা যারা বলে তারা ভুলে যায় যে—‘বেদ থেকে ভিন্ন পৌরুষেয় রচনা রঘুবংশ ইত্যাদি গ্রন্থও গুরু-শিষ্য পরম্পরা বিনা পঠিত হতে দেখা যায়নি, আর এই দৃষ্টিতে দেখলে রঘুবংশও বেদের মতোই অনাদি বলে অনুমিত হবে, (প্রমাণবার্তিক, ১। ২৪৩-৪৪)

গুরু-শিষ্য, পিতা-পুত্র সম্বন্ধ থেকে সমস্ত রকমের বিষয়ই মানুষ শেখে। মীমাংসকরা এই উদাহরণ থেকেই বেদের অনাদির সিদ্ধ করতে তৎপর হন, ‘অতঃপর ওরকম তো স্বেচ্ছ জাতির (অ-ভারতীয় জাতিসমূহ) ব্যবহার স্বীয় মাতা কিংবা ভগ্নীকে বিবাহ করার প্রথা, এবং নাস্তিকদের বচন (গ্রন্থ) ও অনাদি, মানতেই হয় এবং অনাদি হওয়ার ফলে তাকেও বেদের মতো স্বতঃপ্রমাণ মানতে হবে।’ (প্রমাণবার্তিক, ১। ২৪৮-৪৯)

তাহাড়া এই ধরনের অপৌরুষেয়তা সিদ্ধ হলেও জৈমিনি কিংবা কুমারিল ভট্টের কী লাভ হবে, কারণ এর ফলে তো ‘সব ধানই বাইশ পাসেরী—অর্থাৎ মুড়ি মুড়কি একই দরের হয়ে যাবে।’ (প্রমাণবার্তিক, ১। ২৪৯)

(আ) অপৌরুষেয়তার আড়ালে কিছু পুরুষের মহত্বকে বাড়ানো—বস্তুতপক্ষে একে অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে জৈমিনি-কুমারিল গোষ্ঠী অপৌরুষেয়তার চক্কানিনাদ করেছেন—‘এই বেদ বচনের ‘এটা অর্থ’ এটা ‘অর্থ নয়’ এটা বেদের শব্দ নির্ধারণ করে না। শব্দের এই অর্থ তো পুরুষ কল্পনা করে নেয় এবং তাদের মধ্যে রাগ-আদি দোষ থাকে। সেই রাগাদিমান পুরুষদের মধ্যে জৈমিনি বেদার্থের তত্ত্বচেতা। অতঃপর প্রশ্ন এই যে এক জৈমিনিই তত্ত্বচেতা আর কেউ নয়, এই ভেদই বা কেন? জৈমিনির মতোই পুরুষত্ব বর্তমান, এরকম অন্য কাউকে তুমি স্বীকার করো না কেন?’ (প্রমাণবার্তিক, ১। ৩১৬)

(ই) অপৌরুষেয়তার ফলে বেদের অর্থের অনর্থ—আপনারা বলেছেন ‘যেহেতু স্বার্থ রাগ-আদি সম্পন্ন সেজন্য সে বেদের অর্থকে জানে না, আর সেই কারণেই তা অন্য পুরুষের কাছ থেকেও জানা চলে না, অসহায় বেদ স্বয়ং তো আপন অর্থ ব্যাখ্যা করে

না, তাহলে বেদার্থের গতি কী হবে? এই গণ্ডগোলার ফলে 'স্বর্গ কামনাকারী অগ্নিহোত্র হোম করে' এই শ্রুতির অর্থ 'কুকুরের মাংস ভক্ষণ করে' এটাও তো হতে পারে, এর বিরুদ্ধে কী প্রমাণ আছে?

'যদি বলা হয় মানুষের মধ্যে এর বক্তব্য এত বহুল প্রচলিত রয়েছে যে অমন বিপরীত অর্থ করা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়, তাহলে আবার প্রশ্ন, সমস্ত মানুষই তো রাগ-আদি সম্পন্ন, তাদের মধ্যে কে স্বর্গের মতো অতীন্দ্রিয় পদার্থকে দেখতে পারে, এবং যে একই শব্দের অনেক অর্থের মধ্য থেকে 'এটিই সঠিক অর্থ' এ কথা নিশ্চয় করে বলতে পারে?

'স্বর্গ, উর্বশী ইত্যাদি বহু বৈদিক শব্দের (বেদজ্ঞ হবার দাবিকারক মীমাংসকদের দ্বারা সৃষ্ট লোক) শৃঙ্খলে ভিন্ন অর্থও দেখা যায়; যেমন স্বর্গের লোকসম্মত অর্থ হল— মানুষের চেয়ে অনেক উঁচু স্তরের বিশেষ পুরুষের বাসস্থান, যেখানে অ-পার্শ্বিক সুখ এবং তার নানা উপকরণ সর্বদা সঞ্চিত, তার বিরুদ্ধে মীমাংসকরা বলেন যে, স্বর্গ হল সর্বদা দুঃখরহিত এক সর্বোৎকৃষ্ট সুখের নাম। উর্বশী লোকসম্মত অর্থ হল, স্বর্গের অঙ্গরা, কিন্তু মীমাংসক বেদজ্ঞরা তাকে অস্বীকার করে বলছেন, উর্বশীর অর্থ হল অরণি কিংবা পাত্রী নামের এক যজ্ঞপাত্র, অতঃপর এ ভাবেই 'জুহুয়াত' শব্দের অর্থ 'সারমেয় মাংস ভক্ষণ করো' হতে পারে। প্রতিটি বিষয়েরই যদি আর-একটি করে অর্থ হতে পারে, তাহলে কোনো শব্দের অর্থ 'সারমেয় মাংস খাও' কল্পনা করে নেওয়া যেতে পারে।' (প্রমাণবার্তিক, ১। ৩২০-২৩)

'অপৌরুষেয়তার রঙিন ব্যাখ্যা পুরোহিতদের অন্যতম প্রবঞ্চনা, যেমন রাজগৃহের পথ জানতে চাইলে কেউ বলে 'ও মিথ্যা বলছে, এটাই সঠিক পথ', আবার অন্য একজন বলে 'এটাই পথ' আমি বলছি এখন প্রশ্নকারী এই (প্রবঞ্চনা এবং সত্যের) দুটির মধ্যে ইচ্ছা হলে পরীক্ষা করে নিতে পারেন।' (প্রমাণবার্তিক, ১। ৩২৮)

(ঈ) বেদের একটি বাক্য সত্য হলে সম্পূর্ণ বেদ সত্য হয় না—বেদের একটি বাক্য হল, 'অগ্নির্হিমস্য ভেষজং' (আগুন শৈত্যের প্রতিষেধক) এটিকে মীমাংসকেরা অর্থ করেছেন—'যেহেতু 'অগ্নির্হিমস্য ভেষজং' এই বাক্যটি প্রত্যক্ষ প্রমাণিত সত্য, ঠিক সেই ভাবে 'অগ্নিহোত্র জুহুয়াত স্বর্গ কামঃ'—(স্বর্গ কামনাকারী অগ্নিহোত্র হোম করে) এই বাক্যকেও সেইরকমই সত্য বলে মানা উচিত যেহেতু এই বাক্যটিও বেদেরই একটি অংশ।' (প্রঃ বাঃ, ১। ৩৩৩)

এর উত্তরে এটুকু বলাই যথেষ্ট—

'যদি এ ভাবে একটি বাক্যের সত্যতার ভিত্তিতে সমস্ত গল্পই প্রমাণসিদ্ধ হয়, তাহলে এখানে অ-প্রমাণ বলে কিছু নেই? মিথ্যাভাষী পুরুষের একটি কথাও কখনও সত্য হয় না, এমন তো নয়।' (প্রঃ বাঃ, ১। ৩৩৮)।

(উ) শব্দ কখনও প্রমাণ হতে পারে না—'যে অর্থ (প্রত্যক্ষ কিংবা অনুমান দ্বারা) প্রমাণিত তার সাধনের জন্য বেদশাস্ত্রকে ত্যাগ করলে কোনো ক্ষতি নেই; আর যা পরোক্ষ (ইন্দ্রিয় অগোচর পদার্থ) তা এখনও প্রমাণিত হয়নি, অতএব এর মধ্যে বেদের

(আগম) ব্যবহার সঠিক নয়। এ ভাবেই পরোক্ষ এবং অপরোক্ষ উভয় বিষয়েই বেদ অথবা শব্দপ্রমাণের কোনো সম্ভাবনা নেই।' (প্রঃ বাঃ, ৪। ১০৬)।

'এই ব্যবস্থা কে তৈরি করল 'যে সমস্ত কিছুকে বিচারের জন্যই বেদের সাহায্য নিতে হবে', এবং বেদের সিদ্ধান্তকে যারা জানে না তাদের 'ঘোঁরা দেখে আগুনের উপস্থিতি বোঝা যায়' এই তত্ত্বকে গ্রহণ করা উচিত নয়।'

'বেদের ফাঁদ থেকে মুক্ত বেদবাক্যের গুণাগুণ সম্বন্ধে অবহিত নয় এমন সাধারণ মানুষের উপরে 'বেদ স্বতঃপ্রমাণ' এ ধরনের পৈশাচিক সিদ্ধান্ত কে চাপিয়ে দিল?' (প্রঃ বাঃ, ১। ৫৩-৫৪)।

অবশেষে ধর্মকীর্তি মীমাংসকদের প্রত্যক্ষ, অনুমান, ইত্যাদি প্রমাণকে ছেড়ে 'অপৌরুষেয় বেদের' ওপরে চোখ বন্ধ করে আস্থা স্থাপনের বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়াকে এক উদাহরণ দিয়ে জোরদার খণ্ডন করেছেন—কোনো অন্যগামিনী স্ত্রীকে পরপুরুষের সঙ্গে সমাগমের সময় দেখা গেল, এর জন্য যখন তার স্বামী তাকে ভর্ৎসনা করতে থাকে, তখন সেই স্ত্রী তার প্রতিবেশিনীদের উদ্দেশ্য করে বলে—'দেখছ বোনেরা, আমার স্বামীর নির্বুদ্ধিতা? আমার মতো ধর্মপত্নীর বাক্য (শব্দপ্রমাণ) বিশ্বাস না করে সে কিনা তার দুই অক্ষিগোলককে (প্রত্যক্ষ এবং অনুমান) বিশ্বাস করছে।' প্রঃ বাঃ-স্ববৃত্তি, ১। ৩৩৭—'সা স্বামিনা 'পরণসংগতা তুমি' ত্যুপালব্ধহহ,—'পশ্যত পুংসো বৈপরীত্যং ধর্মপত্ন্যাং প্রত্যয়মকৃত্বা স্বনেত্রদ্রবদয়ে প্রত্যেতি'।

(৫) অ-হেতুবাদ খণ্ডন— অনেক ঈশ্বরবাদী এবং সন্দেহবাদী দার্শনিক বিশ্বে কার্য-কারণ নিয়ম বা হেতুবাদকে স্বীকার করেন না। ইসলামিক দার্শনিকদের মধ্যে অশ-অরী কার্য-কারণ নিয়মটিকে ঈশ্বরের সর্বশক্তিমান হওয়ার পথের প্রধান অন্তরায় বলে মনে করেছেন, এবং এ ধরনের তত্ত্বে পিছনে লুক্কায়িত বস্তুবাদকে দেখেছেন। সেজন্যই তিনি বলেছেন, যেকোনো বস্তুর সৃষ্টি হওয়ার মধ্যে কোনো কারণ পূর্ব থেকে উপস্থিত থাকে না, আল্লাহ সমস্ত বস্তুকে সর্বদাই নতুন—অসৎকে সং রূপে—সৃষ্টি করেন। অশ-অরী ছাড়া কিছু আধুনিক এবং প্রাচীন সন্দেহবাদী দার্শনিক আছেন, যারা বস্তুর সৃষ্টিতে কোনো কার্য-কারণ নিয়মকে স্বীকার করেন না। তাঁরা বলেন বস্তুর সৃষ্টি কোনো কারণে হয় না, না সেই মুহূর্তে নষ্ট হয়ে আপন পূর্বগামীদের স্বভাব ইত্যাদির সদৃশরূপে উৎপন্ন হওয়ার কোনো নিয়মকে অনুসরণ করে। তাঁরা বলেন—'যেমন কণ্টকের মধ্যে তীক্ষ্ণতার কোনো কারণ নেই, সেইরকমই জগতের সমস্ত কিছুই অহেতুক।' (প্রঃ বাঃ, ২। ১৮০-৮১)।

উত্তরে ধর্মকীর্তি বলেছেন—'যার পূর্ব উপস্থিতির কারণে যে পরে উৎপন্ন হয়, অথবা যার বিকারের ফলে বিকার হয়, তাকেই তার কারণ বলা হয়, এবং তা এই কণ্টকের মধ্যেও বর্তমান।' (প্রঃ বাঃ, ২। ১৮১-৮২)।

সমস্ত সৃষ্ট বস্তুকে নতুন বলে বৌদ্ধ দার্শনিকেরাও স্বীকার করেন, কিন্তু তাঁরা একে ক্ষণবিনাশী বিন্দুর প্রবাহের একটি বিন্দু মনে করেন, আর এ ভাবে এমন কোনো বস্তু বিন্দু নেই যার পূর্বে এবং পশ্চাতে কোনো বিন্দু নেই। যদি পূর্বগামী বিন্দু কারণ হয়ে থাকে তাহলে পশ্চাদগামী বিন্দু তার পূর্বগামীর সঙ্গে সদৃশ্য স্বভাবের; যদি এই নিয়ম না

হত, তাহলে আম ভক্ষণকারী আমের আঁটি পোঁতার জন্য ব্যগ্র হত না। একটি ভাবের (বস্তু) হওয়ার উপরে অন্য একটি ভাব হওয়া, তথা প্রত্যেকটি বস্তুর তার পূর্বগামীর সদৃশ উৎপত্তি, হেতুবাদকে প্রতিষ্ঠিত করে। যতক্ষণ বিশ্বে সর্বত্র প্রত্যক্ষ এই উৎপত্তি-প্রবাহ এবং সদৃশ-উৎপত্তির নিয়ম বিদ্যমান আছে, ততক্ষণ অহেতুবাদকে সর্বাঙ্গিক ভ্রান্ত বলে স্বীকার করতে হবে।

(৬) জৈন অনেকান্তবাদের খণ্ডন—জৈনধর্মের স্যাদবাদ বা অনেকান্তবাদের প্রসঙ্গের উল্লেখ আমরা ইতিপূর্বে করেছি। এই বাদ অনুসারে ঘড়া, ঘড়াও হয় আর কাপড়ও হয়, এবং বস্ত্রও আবার সেই ভাবেই বস্ত্র, বস্ত্র এবং ঘড়া উভয়ই হয়। এ বিষয়ে ধর্মকীর্তি আক্ষেপ করে বলেছেন—

‘যদি সমস্ত বস্তুই আপন এবং ভিন্ন দুটি রূপের হয়, তাহলে (দধি, দধি হয়, উট হয় না অথবা উট উটই হয়, দধি নয়—এ ভাবে দধির মধ্যকার) তার বিশেষত্বকে অস্বীকার করার ফলে কাউকে ‘দধি খাও’ বললে সে কেন উটের দিকে যায় না? কারণ উটের মধ্যে দধি সে ভাবেই সঞ্চিত আছে যে ভাবে আছে দধির মধ্যে।

‘যদি বোলা দধির মধ্যে কিছু বিশেষত্ব আছে, বিশেষত্বের সঙ্গেই দধি বর্তমান, উট নয়, তাহলে সেই বিশেষত্ব অন্যত্রও বর্তমান, অতএব সব বস্তুই দ্বিরূপী নয়, একে অপরের চেয়ে ভিন্ন।’ (প্রঃ বাঃ, ২। ১৮০-৮২)

ধর্মকীর্তির দর্শনের এই সংক্ষিপ্ত বিবরণকে তাঁরই এক ভাষ্য দিয়ে শেষ করা যাক—

‘বেদ গ্রন্থের প্রামাণ্যতা, কোনো ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্তা রূপ (কর্তৃত্ববাদ) মান করার মধ্যে ধর্ম-ইচ্ছা, (জাতিবাদের (উঁচু-নিচুর ভেদভাব) অহংকার আর পাপনাশের জন্য শরীরকে সন্তুষ্ট করা (উপবাস এবং শারীরিক তপস্যা) এই পাঁচটি বুদ্ধিভ্রষ্ট মানুষের মূর্থতার (জড়তার) প্রমাণ।’ (প্রঃ বাঃ-স্ববৃত্তি, ১। ৩৪২—‘বেদ প্রমাণ্যং কস্যচিৎ কর্তৃবাদঃ স্নানে ধর্মেচ্ছা জাতিবাদাবলেপঃ। সন্তাপারন্তঃ পাপহানায় চেতি ধ্বস্তপ্রজ্ঞানং পঞ্চ লিংগানি জাড্যে॥’)